আশুতোষ-স্মৃতিকথা

রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট্ (অন্), কবিশেখর

প্রণীত

"বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ।
মহোরস্কো মহেষ্বাসো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ॥
দুন্দুভিস্বননির্ঘোষঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
জ্ঞানবান্ শীলসম্পন্নো বেদবিদ্ভিঃ সুপূজিতঃ॥
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেণ হিমবা নিব।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবী সমঃ॥"

—রামায়ণম্

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

[মূল্য ৩৲ টাকা]

প্রকাশক
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্
৯৩এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীমোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

যিনি কৈশোরে বধূবেশে, যৌবনে গৃহ-লক্ষ্মীরূপে এবং পরিণত
বয়সে কঠোর ও একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য-পালনে—সর্ব্ব
অবস্থায় হিন্দু কুল-ললনার আদর্শ-স্থানীয়া

—আশুতোষের সেই—

পুণ্যশীলা সহধর্ম্মিণী পূজনীয়া—সীতা-সাবিত্রী-কল্পা
শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর
করকমলে
ভক্তির সহিত এই পুস্তকখানি
উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ভূমিকা

"গণইতে দোষ—গুণ-লেশ ন পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার।"

—বিদ্যাপতি

জীবন-চরিত লেখার কাজটা একটু শক্ত। আশুতোষ ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া কোন উচ্চ সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন না। তিনি হাই-কোর্টের বিচারপতি-রূপে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত নথি-পত্র লইয়া উকিল-ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা-শ্রবণ ও 'রায়'-লেখার কার্য্যে দিন কাটাইয়া কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি উচ্চ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সমস্ত দেশের সঙ্গে নানা সূত্রে জড়িত ছিলেন,—তাহা ছাড়া তাঁহার প্রাণ পর-দুঃখে সহানুভূতিপূর্ণ ছিল,—এই সহৃদয়তা এক রাজ্যের লোককে তাহাদের মনের ব্যথা ও বিপদের কথা লইয়া তাঁহার দরজায় যেন নীরবে আমন্ত্রণ করিয়া আনিত। সর্ব্ব বিভাগের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের তাঁহাকে দিয়া দরকার হইত। বোধ হয় বঙ্গদেশে তাঁহার মত আর দ্বিতীয় একটি ব্যক্তি ছিলেন না, যাঁহার সাহায্যের উপর দেশ-বাসীর এরূপ সার্ব্বজনীন দাবীর সুযোগ ও প্রয়োজন হইত ; এ হেন ব্যক্তির দ্বারা যে কত লোক কত ভাবে উপকৃত হইয়াছেন, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। অথচ, তাঁহার এমন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন না, যাঁহার নিকট তিনি মনের অলি-গলি খুলিয়া সমস্ত মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার গল্প-গুজব করিয়া নিজের কৃতিত্ব বা প্রতিষ্ঠা-প্রচারের অভ্যাস ও প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার প্রকৃতি এত গম্ভীর ও সংযত ছিল যে, যাঁহারা হৃদয় খুলিয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে অবহিত করিয়া যাইতেন, সে কথা ঘুণাক্ষরেও আশুতোষ অপরের কাছে ব্যক্ত করিতেন না। লতা যেরূপ সুরভি কুসুমরাশি নীরবে বিতরণ করিয়া যায়, বৃক্ষ যেরূপ উপাদেয় ফল নীরবে দান করে, দক্ষিণানিল যেরূপ নীরবে পুষ্প-রেণু বিলাইয়া যায়,—আশুতোষও পরোপকার-ব্রত সেইরূপ নীরবে পালন করিয়া যাইতেন—তাহার কোনই ঘোষণা ছিল না। আমরা ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত

হইয়াছি এবং আমাদের প্রার্থিত বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছি। সেই নিত্য-নৈমিত্তিক ভিড়ের মহোৎসবে কে কি প্রসাদের অভিপ্রায়ে গিয়াছেন, কি ফল পাইয়াছেন,—তাহার সংবাদ চিরদিনই অলিখিত থাকিবে।

ঈদৃশ ব্যক্তির এই বিপুল সদাশয়তার সঠিক তত্ত্ব জানিবার উপায় নাই। ব্যক্তিগত-ভাবে আমি তাঁহাকে যেমন দেখিয়াছি ও তাঁহার নিকট যতটা উপকার পাইয়াছি, তাহাই লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। পাছে অপরের বিরক্তি ঘটে, এই আশঙ্কায় আমার সমস্ত কথাও অকুণ্ঠিতভাবে লিখিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার দূর-প্রসারিত কার্য্য-ক্ষেত্রে আমার অপেক্ষা অনেকেই নিশ্চয়ই তাঁহার কর্ম্ম ও মহাগুণাবলীর দৃষ্টান্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেশী অবগত আছেন, তাঁহাদের কথা এই আখ্যায়িকায় বাদ পড়িয়াছে; এই হিসাবে আমার চিত্র অসম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য।

রামনিধি গুপ্তের (নিধুবাবুর) পুত্র তাঁহার পিতার গীতি-সংগ্রহের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—কবি দিন রাত্র গান রচনা করিতেন এবং তাহার কোন প্রতিলিপি না রাখিয়াই যে চাহিত, তাহাকেই দিয়া ফেলিতেন। তাহা সংগ্রহের কোন উপায় নাই। শিউলি গাছটাকে নাড়া দিলে যেরূপ অজস্র ফুল পাওয়া যায়, যে পারে, সে-ই তাহা কুড়াইয়া লইয়া যায়,—কবির গানগুলি তেমনই হরির লুটের মত নির্ব্বিচারে বিতরিত হইত। আশুতোষ-কৃত উপকার ও সদাশয়তার ফল অনেকেই পাইয়াছেন, কিন্তু এখন তাহার সমস্ত জানিবার উপায় নাই। জীবনের শেষ কয়েক বৎসরের কথাগুলি আশুতোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ, জামাতা প্রমথনাথ এবং শেষে দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ বিশেষভাবে অবগত ছিলেন; আমার বার্দ্ধক্য ও শারীরিক অসমর্থতা-নিবন্ধন এবং কতকটা তাঁহাদের কর্ম্ম-বাহুল্যের জন্যও সর্ব্বদা তাঁহাদের কাছে যাতায়াত করিয়া সেই সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। স্বীয় পরিবারের লোক ছাড়া বিরাজমোহন মজুমদার মহাশয়ও প্রতিনিয়ত আশুতোষের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের মধ্যে যদি কেহ তাঁহার জীবন-চরিত লিখিতেন, তবে তাহা উৎকৃষ্ট হইত। আশা করি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ এই কার্য্যে ভবিষ্যতে হস্তক্ষেপ করিবেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইংরেজীতে তাঁহার পিতার সম্বন্ধে একটি নাতিবৃহৎ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, উহা ক্ষুদ্র হইলেও ফটোগ্রাফের মত একটি

নিখুঁত চিত্র। এই পুস্তকের স্থানে স্থানে আমি তাঁহার প্রবন্ধ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

হাইকোর্ট, লাটসাহেবের মন্ত্রণা-সভা, স্যাড্‌লার-কমিশন, ভারত গভর্ণমেণ্টের বিশ্ব-বিদ্যালয়-সম্পর্কিত 'বিল' সম্বন্ধে আলোচনা-সভা, কলিকাতা করপোরেশন এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য-বিবরণীতে সেই সেই প্রতিষ্ঠানে আশুতোষের কার্য্যাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। যে কয়েক বৎসর তিনি ভাইস্-চ্যান্সেলর ছিলেন, তাঁহার বাৎসরিক কনভোকেশন-বক্তৃতাগুলিতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ম্ম-পদ্ধতি এবং অভাব-অভিযোগের কথা তাঁহার নিজের মুখের জ্বলন্ত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। স্যাড্‌লার কমিশনের অতিকায় রিপোর্টগুলিতে তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ, উদার মত প্রকাশিত হইয়াছে। হাইকোর্টে তৎকৃত 'রায়'গুলি এবং 'টাগোর ল-লেক্‌চারার'-স্বরূপ তাঁহার 'ল অব্ পারপিচুইটি'-সম্বন্ধে বক্তৃতা ব্যবহারজীবীদের অবলম্বনীয় ও পাঠ্য-স্বরূপ বিদ্যমান। এই বিবিধ প্রতিষ্ঠানের বিপুল সাহিত্যে তাঁহাকে যেরূপ পাওয়া যায়, তাহা যথাযথ এবং তাঁহার চরিত্র ও মনোভাবের সুস্পষ্ট দ্যোতক। আমি মাঝে মাঝে সেই বিরাট্ বিবরণীসমূহের পরিধি স্পর্শ করিয়াছি মাত্র, বয়সের অক্ষমতা ও অসুস্থতার জন্য এই জটিল গ্রন্থসমূহে প্রবেশ করিতে সাহসী হই নাই।

কিন্তু এই বিপুল কর্ম্মশীলতার পশ্চাতে যে মহামানব তাঁহার জীবনব্যাপী সংগ্রামের যোগ্য অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সর্ব্বদা ন্যায়-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন,—যে মহৎ-হৃদয় পরহিতার্থে জীবন সমর্পণ করিয়া প্রাণপণে ও নিঃস্বার্থভাবে শ্রম করিয়া ক্ষণেকের জন্যও ক্লান্তি বোধ করেন নাই,—যাঁহার পাষাণ-প্রতিম সুদৃঢ় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ভেদ করিয়া করুণার মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত, এবং নানা বিঘ্ন ও ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির শত্রুতার দরুণ তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য সময়ে সময়ে ব্যর্থ হইলেও যিনি এক মুহূর্ত্তও তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে একাগ্র নিষ্ঠা শিথিল করেন নাই,—যিনি ভয় কি জানিতেন না,—বিপৎপাত যাঁহার সাহস ও শক্তি বাড়াইত মাত্র, শিক্ষার কার্য্যে জয়-পরাজয়ে বিচলিত হইয়া যিনি ক্ষণেকের জন্যও কর্ত্তব্যচ্যুত হ'ন নাই, যাঁহার জীবনের অপর নাম ছিল লোক-হিতার্থ সংগ্রাম এবং যিনি শিক্ষা-সমরে ছিলেন অটল প্রতাপাদিত্য, দয়ার ক্ষেত্রে ছিলেন বিদ্যাসাগর এবং পাণ্ডিত্যে ছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতি—সেই দিব্য-দৃষ্টি, উদার-হৃদয়, জাতীয়

উন্নতি-কল্পে উৎসর্গীকৃত জীবন-নৈবেদ্য আশুতোষের যদি ঈষৎ প্রতিচ্ছায়া এই পুস্তকে পড়িয়া থাকে, তবেই আমি আমার সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই পুস্তক প্রণয়ন-কালে আমি স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বি[illegible]নিধির বহু প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-লিখিত [illegible]শুতোষ-প্রসঙ্গ (‘Representative Indians’ নামক পুস্তকের অন্তর্গত), আশুতোষের পিতৃব্য-কন্যা শ্রীমতী বিনোদবাসিনী দেবী-লিখিত অসমাপ্ত আখ্যায়িকা (‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকায় প্রকাশিত), শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক-প্রণীত ‘আশুতোষের ছাত্র জীবনী’, আশুতোষের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, তৎসম্বন্ধীয় বহু ইংরাজী ও বাঙ্গলা-পত্রিকার সন্দর্ভ এবং অপরাপর নানা স্থান হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি। আমি বিশ বৎসরকাল সিনেটের সদস্য ছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত বহু প্রতিষ্ঠানের সদস্য, এবং পরে কোন কোন বোর্ডের সভাপতি-স্বরূপ কাজ করিয়াছি, এই সূত্রে দীর্ঘকাল আশুতোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি। পর পর কয়েক বৎসর আমি তৎকৃত ম[illegible]নের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘রিডার’-স্বরূপ বক্তৃতা করিয়াছি। নানা বিষয়ে, [illegible] বিভাগে এবং তদীয় গৃহে আমি তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছি, সেইরূপ আ[illegible]-অঙ্কনের চেষ্টা পাইয়াছি। তবে স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া যাহা লিখিয়াছি[illegible] তাহাতে মাঝে মাঝে ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে, এজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আশুতোষের জ্যেঠতাত-পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আমি আশুতোষের পিতামহ বিশ্বনাথের হাতের লেখা রোজনাম্‌চার মূল পুস্তিকাখানি পাইয়াছি। পরিশিষ্টে সেই হস্তলিপির কিয়দংশের প্রতিলিপি এবং সমস্ত পুস্তিকাখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পরিশিষ্টে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্মতি-ক্রমে তাঁহার পিতৃদেব-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটির কতকাংশের বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছি। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও দয়া করিয়া তাঁহার প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিবার অনুমতি দিয়াছেন এবং সেই সম্মতি-পত্রে অতিশয় সৌজন্য ও অভ্যস্ত নিরভিমান বিনয়ের সঙ্গে লিখিয়াছেন—“Indeed to be quoted by the great historian of Bengali literature is really something to be proud of.”

সুলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র সেন এই পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া এবং স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন-সম্বন্ধে মতামতদ্বারা আমাকে বাধিত করিয়াছেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম্ম করার সময় পল্লীগীতিকা-সংগ্রহ-সম্বন্ধে তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তকের শব্দ-সূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

এই পুস্তকের ছাপা শেষ হওয়ার পরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আশুতোষ ও তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন তত্ত্ব অবগত হইলাম, তাহার কিছু কিছু এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

গ্রন্থভাগে লিখিত হইয়াছে, গঙ্গাপ্রসাদ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ শৈশবে দারিদ্র্য-জনিত অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ ইঁহাদিগকে, পক্ষী যেরূপ শাবকগুলিকে স্বীয় পক্ষপুটে রক্ষা করিয়া পালন করে, তেমনই যত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন। ভ্রাতাদের বৃত্তি ও স্বীয় ক্ষুদ্র আয় হইতে তিনি ইঁহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহ ও শিক্ষার ব্যয় অতি কষ্টে বহন করিতেন। গঙ্গাপ্রসাদ যখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতেন, তখন রাত্রে পাঠের জন্য একটু রেড়ীর তেল সংগ্রহ করিবার মত সংস্থানও সব সময়ে হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন,—ডুবাল নামক জনৈক ব্যক্তি শিশুকালে গাছের শুক্‌না পাতা জ্বালিয়া পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া শেষে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ রাস্তার লাইট-পোষ্টের নীচে দাঁড়াইয়া পড়া মুখস্থ করিতেন। তৎকালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার 'ফি' ১০৲ টাকা ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ বহু কষ্টে এই ১০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন; 'ফি' দাখিল করিবার সেই সর্ব্ব-শেষ দিন; তাড়াতাড়ি গঙ্গাপ্রসাদ উহা জমা দেওয়ার জন্য রাস্তায় যাইতেছিলেন, পথে পকেট-কাটা চোর সেই টাকা লইয়া অদৃশ্য হইল। গঙ্গাপ্রসাদ পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন, আত্মীয়-স্বজন অনেকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিলেন, একটি পয়সাও জুটিল না। আশুতোষ যখন পিতার এই অবস্থার কথা বলিতেন, তখন অশ্রুতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইত। এত বৎসরের পরিশ্রম—ও সমস্ত আশা-ভরসা ১০৲টি টাকার জন্য মাটি হইতে উদ্যত। আশুতোষ দুঃস্থ ছাত্রদের প্রতি যে এত দরদী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের অন্তঃকরণ দিয়া ছাত্রদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করার ফলে। বহু ছাত্রের 'ফি' তিনি নিজে দিয়াছেন। এই অনুভূতি ও সহৃদয়তা তাঁহার

পিতৃ-জীবনের সেই অধ্যায়ের স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল,—নিজের ব্যথা দিয়া তিনি পরের ব্যথা বুঝিয়াছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের অবস্থা ভাল হইলে তিনিও দুঃস্থ ছাত্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

শেষ মুহূর্ত্তে এক সাহেব-অধ্যাপকের কৃপায় গঙ্গাপ্রসাদ সেই দিনকার অবস্থা-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের সহধর্ম্মিণী জগত্তারিণী দেবী দেখিতে গৌরবর্ণা ছিলেন। অথচ গঙ্গাপ্রসাদ শ্যামবর্ণ রোগাটে ছেলে,—অবস্থা এত সঙ্কীর্ণ যে, কলেজের বৃত্তির কয়েকটি টাকার উপর ভরণ-পোষণ নির্ভর করিত। শ্বশুর-বাড়ীর মেয়েদের কেহ কেহ বিবাহের পর গঙ্গাপ্রসাদকে দেখিয়া, এমন সুশ্রী ও লক্ষণাক্রান্ত মেয়ের বর তাহার যোগ্য হয় নাই, এই আলোচনা করিতেছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের শ্বশুর হরলাল বলিলেন,—"এই বালককে আমি নিজে মনোনয়ন করিয়াছি, কয়েক বৎসর পরে দেখিবে—আমার কন্যা ইহার ঘরে যাইয়া লক্ষ্মীর ঘট স্থাপন করিবে—তখন ইহার অবস্থা দেখিয়া তোমরা শ্লাঘা বোধ করিবে।"

বস্তুতঃ গঙ্গাপ্রসাদ যেরূপ অসাধারণ মনস্বিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময় জন্মে। যে তারিখে তিনি ডাক্তার হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন, সেই তারিখ হইতে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—তিনি প্রতি দিন, প্রতি মাস ও প্রতি বৎসরের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার অসামান্য সহিষ্ণুতা ও অপরিসীম গৃহস্থালী ও নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রমাণ করে; প্রতি দিনে ডাক্তারির ভিজিট, ডিস্পেন্সরি ঔষধ-বিক্রয়, পুস্তকের আয় প্রভৃতি সমস্ত সেই হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে, প্রতিদিন কত ব্যয় হইয়াছে তাহার কড়াক্রান্তির সূক্ষ্ম হিসাব সেই সকল খাতায় আছে; প্রত্যেক দফার জের টানিয়া মাস-কাবারী হিসাব রচিত হইয়াছে এবং বার মাসের পরে প্রত্যেক দফার পুনরায় জের টানিয়া বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত হইয়াছে; এইভাবে বৎসরের পর বৎসরের হিসাবের জের টানা হইয়াছে। এক দিন দুই দিন নহে, বৎসরের পর বৎসর—তাঁহার দীর্ঘ কর্ম্ম-জীবনের প্রায় সকল বৎসরের হিসাব স্বীয় ছাপার মত পরিষ্কার অক্ষরে লিখিত হইয়া সংরক্ষিত আছে। কোন্ দিন, কোন্ বৎসরে তাঁহার কত আয় হইয়াছে—তাহা দৃষ্টিপাত

মাত্র বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার বাড়ী নির্ম্মাণে, সন্তানাদির বিবাহে কত ব্যয় হইয়াছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে কড়া-ক্রান্তির হিসাব-সহ সেই খাতা হইতে জানিতে পারা যায়। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে যখন তিনি বাতে পঙ্গু হইয়া পড়েন, সেই সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত হিসাব তাঁহার নিজ হাতের লেখা—আমি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট দেখিয়াছি। তাঁহার জীবনে তিনি কত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং কি কি ভাবে সেই অর্থ অর্জ্জিত হইয়াছে—তাহা এরূপ অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা ও বিশুদ্ধতার সঙ্গে লিখিত হইয়াছে, যাহাতে এই হিসাবের খাতাগুলিকে ধৈর্য্যের কীর্ত্তি-স্তম্ভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যখন গঙ্গাপ্রসাদ স্বয়ং অশক্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারই নিয়মানুবর্ত্তন করিয়া আশুতোষ স্বয়ং বহুদিন সেই হিসাব লিখিয়াছিলেন।

পারিবারিক হিসাব এমন বিশুদ্ধভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত রক্ষিত হওয়ার রীতি আমি ইহার পূর্ব্বে আর কোথায়ও দেখি নাই। রাজা, মহারাজা বা ধনাঢ্য মহাজনের হিসাব কর্ম্মচারীদিগের দপ্তরে রক্ষিত হয়; কিন্তু কোন একটা বিষয় তাহা হইতে বাছিয়া বাহির করিতে হইলে কাগজের স্তূপ ঘাঁটিতে হয়, এবং একাধিক কর্ম্মচারী তাহা খুঁজিতে খুঁজিতে হয়রাণ হইয়া হয়ত সপ্তাহান্তে তাহার একটা হদিস করিয়া উঠেন। কিন্তু এই হিসাবের পুস্তকগুলি একরূপ কল্পতরু, সারাজীবনের আয়-ব্যয় এক মুহূর্ত্তের মধ্যে উহা হইতে পাওয়া যায়। গঙ্গাপ্রসাদের সমস্ত জীবনের আয়—টাকা, আনা, পাই—আমি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম।

স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় আশুতোষের পূর্ব্ব পুরুষদের বংশলতা সমগ্র-ভাবে খুঁজিয়া পান নাই, তাহার অপেক্ষা আমি আর একটা বংশলতা বেশী দিয়াছি (৪ পৃঃ), কিন্তু আমিও রাম হইতে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত বংশলতা খুঁজিয়া পাই নাই। সুখের বিষয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের পারিবারিক প্রাচীন কাগজ-পত্র হইতে একটি ফিরিস্তি বাহির করিয়াছেন, তাহা বহুপূর্ব্বে তিনি স্বয়ং বিশ্বস্তসূত্রে প্রাচীন কুলজী ও প্রাচীন কাগজ-পত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখাই নাই, এজন্য এখন দেখিতেছি, আমার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি

হইয়াছে। যাহা হউক, রাম হইতে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত বংশ-লতা এখন সঠিক পাওয়া গেল। তাহা নিম্নে দিতেছি ঃ—

১৪ রাম
১৫ সুযো
১৬ লক্ষ্মীপতি
১৭ দিগম্বর
১৮ ধনপতি
১৯ মাধব
২০ সুরানন্দ
২১ রাঘব
২২ কুমুদ
২৩ হরিদেব
২৪ রামনারায়ণ
২৫ কৃষ্ণবল্লভ
২৬ পুরুষোত্তম

গঙ্গাপ্রসাদ বাল্মীকির রামায়ণখানির সমস্তটার বাঙ্গলায় পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। বহু পণ্ডিত একত্র হইয়া যাহা করিতে সাহস পান না, গঙ্গাপ্রসাদ একক তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া কাজ করিতেন; কোন বিঘ্ন, বিপত্তি বা বাধা তাঁহার নিত্যকার কর্ম্ম-প্রণালী ব্যাহত করিতে পারিত না। তিন-তলার ছাতে বেড়াইয়া বেড়াইয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি রামায়ণ লিখিয়া যাইতেন। তাঁহার প্রতিটি পয়ার সংস্কৃত মূলানুযায়ী এবং ললিত শব্দে গ্রথিত। কবি রাজকৃষ্ণ রায় এইরূপ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মাত্র কতকটা অংশের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ প্রায় সমস্ত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিছেন, কেবল উত্তরকাণ্ডের কিয়দংশ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সেই অংশটুকু আশুতোষ স্বয়ং শেষ করাইয়াছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে গঙ্গাপ্রসাদ বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে এই যে বিস্ময়কর কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার হস্তাক্ষরে এখনও লিপিবদ্ধ। অর্দ্ধ শতাব্দীতেও সেই কালির রেখা ক্ষীণ হয় নাই,—তাহা উজ্জ্বল ও স্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে। এই পুস্তকখানি অবিলম্বে মুদ্রিত হওয়া উচিত।

আমি ২১৩ পৃষ্ঠায় কমলাদেবীর বিবাহ-সম্বন্ধে লিখিয়াছি যে, আশুতোষ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। রমাপ্রসাদ বলিতেছেন, একথা ঠিক নহে, তিনি যৌবনে সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন, এমন কি তদুদ্দেশ্যে স্থাপিত এক সমিতির উৎসাহশীল সদস্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই

সমিতি বিধবা-বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি দুই একটি বিষয়ে উদ্যোগী হইলেও উহাতে জাতিভেদ-নিবারণ, পৌত্তলিকতা-উচ্ছেদ প্রভৃতি উগ্রপন্থীদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মতালিকা ছিল না। হৃদয়ের কারুণ্যনিঃসৃত স্বাভাবিক মানব-ধর্ম্মভুক্ত বিষয়-গুলিই এই সমিতির প্রতিপাদ্য ছিল।

এই পুস্তক অতিরিক্ত ত্রস্ততার সহিত লিখিত হইয়াছে,—স্মৃতি-ভ্রম, প্রুফ-সংশোধনের দোষ এবং অনবধানতা-জনিত নানা ভুল ইহাতে আছে, যদি দ্বিতীয় সংস্করণ করিবার প্রয়োজন হয় তবে পুস্তকখানি যথাসম্ভব নির্দ্দোষ করিতে চেষ্টা পাইব। এবারকারের মত বহু ত্রুটির জন্য পাঠকের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিতেছি। একটি কথা এই প্রসঙ্গে লিখিত হওয়া দরকার মনে করি। পরিশিষ্টে কোন কোন স্থানে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থভাগে তাহা একবার লেখা হইয়াছে, সুতরাং তাহা দ্বিরুক্তির মত শুনাইবে; কিন্তু পরিশিষ্টে প্রসঙ্গগুলি পূর্ণভাবে লিপি-বদ্ধ করার জন্য কোন অংশ বাদ দিতে পারি নাই।

বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কয়েকবার আশুতোষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। বহুপূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি তাঁহার সেই স্মৃতি-কথা শেষ মুহূর্ত্তে আমাকে দেওয়াতে অতি ত্রস্ততার সহিত তাহা ছাপা হইয়াছে। তজ্জন্য ভুল, ত্রুটি থাকা সম্ভবপর; আশাকরি গুপ্ত মহাশয় সে জন্য ক্ষমা করিবেন।

এই সন্দর্ভটি আশুতোষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঢাকার একখানি পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল।

বেহালা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

অনুক্রমণিকা

—:*:—

আশুতোষ ও কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রসঙ্গ ১০৮—১৬৭ পৃঃ

প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি-সংগ্রহ—১০৯—৩৩ পৃঃ

অধ্যাপক-নিয়োগ ও পল্লী-গীতি-সংগ্রহ—১৩৩—৫৭ পৃঃ

জীবন-সায়াহ্নে আশুতোষ

ভাইস চ্যান্সেলরের বেশে আশুতোষ ও পুত্র শ্যামাপ্রসাদ

আশুতোষ-স্মৃতিকথা

বংশ-পরিচয়

"কুলে, শীলে, ঠাকুরালে, ব্রহ্মচর্য্যগুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে॥"

—কৃত্তিবাস

কনোজাগত ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যে শ্রীহর্ষের বংশধরেরা বঙ্গদেশে মুখোপাধ্যায়-উপাধিতে পরিচিত, সেই শ্রীহর্ষই 'নৈষধ'-কাব্য-রচয়িতা বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই শ্রীহর্ষ 'নৈষধ'-কার না হইলেও ইনি যে রাজসভা-পূজিত মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীহর্ষ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কথিত আছে, সেই বংশে প্রসিদ্ধ সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য জন্মিয়াছিলেন। এই দুই ভ্রাতা দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরের হরিহর ও বুক্ক নামক নৃপতিদ্বয়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইঁহারা তুঙ্গভদ্রাতীরে পম্পা-নগরীতে বাস-স্থাপন করেন। উভয় ভ্রাতাই তাঁহাদের বিদ্যার জ্যোতিতে সমগ্র ভারত আলোকিত করিয়াছিলেন। সায়নাচার্য্য বেদের ভাষ্য রচনা করিয়া সেই মহা শাস্ত্র সুধী-সমাজের অধিগম্য করিয়াছিলেন এবং মাধবাচার্য্যও অনেক সংস্কৃত-গ্রন্থ রচনা করিয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এই বংশেই দনুজমাধবের মন্ত্রী নৃসিংহ ওঝা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। সম্ভবতঃ সামসুদ্দিন ফিরোজ সাহার (১৩০২-২২ খৃঃ) বঙ্গ-বিজয়ের ব্যাপদেশে নৃসিংহ ওঝা সোনারগাঁর পৈত্রিক বাস ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রামে বাসস্থাপন করেন।* সেই সময়ে স্থানটি একটি মালঞ্চ ছিল এবং এখানে কতকগুলি মালী জাতীয় লোক বাস করিত। বহু ফুলের বাগান থাকাতে পল্লীটির নাম হইয়াছিল 'ফুলিয়া'।

নৃসিংহ ওঝা

নৃসিংহ ওঝা গঙ্গাতীরে নানা স্থান ঘুরিয়া এই ফুলিয়া-গ্রামটি বাস-স্থানোপযোগী বলিয়া মনোনীত করিলেন। ধন-ধান্যে নৃসিংহ ওঝার পুত্রগণ ক্রমশঃ প্রবল ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। এই স্থানটি কালে একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পল্লী হইয়া দাঁড়াইল এবং ভরদ্বাজ-গোত্রের ফুলের মুখটিদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইল।

নৃসিংহের পৌত্র মুরারি ওঝা অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন,—"মদরহিত ওঝা সুন্দর মূরতি, মার্কণ্ডেয় ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি।" বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যতম আদি কবি কৃত্তিবাস এই মুরারি ওঝার নাতি। কৃত্তিবাস শ্রীহর্ষ হইতে ১৮ পর্য্যায়ে জন্মগ্রহণ করেন।

কৃত্তিবাস

এই বংশের প্রভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। কৃত্তিবাসের খুল্লতাত-ভ্রাতা বিভাকর এবং নিশাকরের কীর্ত্তি বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই গৌড়েশ্বরগণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই দুই ভ্রাতার রাজোচিত সম্মান ছিল; এক সহস্র সৈন্য সর্ব্বদা তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত থাকিত। গৌড়েশ্বরের (সম্ভবতঃ রাজা গণেশের) সহায়তায় এবং গ্রন্থকারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-গুণে কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এই

* "পূর্ব্বেতে আছিল যে দনুজ মহারাজা।
তার পাত্র ছিল নরসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥"

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ

স্থানে এই গোষ্ঠীর বংশলতা খুঁজিলে হয়ত পুরুষোত্তমের পূর্ব্ব পুরুষের নাম পাওয়া যাইবে।

বিশ্বনাথের গৃহে রক্ষিত বংশলতা ঃ—

আশুতোষ যেদিন ফুলিয়া-গ্রামে কৃত্তিবাসের সমাধি-স্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করেন, সেদিন তিনি জানিতেন না যে, কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নৃসিংহ ওঝা ও আশুতোষের আদি পুরুষ রাম উভয়ে সহোদর ছিলেন এবং ইঁহারা দুই ভ্রাতা একযোগে ফুলিয়া-গ্রামে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। রাম নৃসিংহের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ইঁহাদের আর একজন ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম গুাকর; ইনি কাচনা নামক স্থানে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

মুখোপাধ্যায়-বংশে নৃসিংহ এবং রাম এই দুই ব্যক্তিই ফুলিয়া-গ্রামের প্রথম অধিবাসী এবং ইঁহাদের সন্ততিবর্গ লইয়াই 'ফুলে-মেল' সংগঠিত হইয়াছিল।

পুরুষোত্তমের পৌত্র—বলরাম ন্যায়ালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরেকৃষ্ণ ও তাঁহার পুত্রদের কেহ কেহ দিগ্‌সুই গ্রামেই রহিয়া গেলেন। হরেকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণমোহন ভাগবতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জিরেটবাসী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগুরু ভগবান দাস বাবাজীকে ভাগবত পড়াইয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দ-বংশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত জগদানন্দ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু ছিলেন।

বলরাম মুখোপাধ্যায়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পণ্ডিতকুলচূড়ামণি জগন্নাথ-তর্কপঞ্চাননের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইলে রাজা রাধাকান্ত দেবের সাগ্রহ অনুরোধে রামচন্দ্র উক্ত কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু কলিকাতায় গোহত্যা হয়, এজন্য ধর্ম্মভীরু অধ্যাপক বৈদ্যবাটীতে থাকিয়া কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন।

রামচন্দ্রের পুত্র নবগোপালও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন এবং তৎপুত্র নবগোপাল ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ততিরা বৈদ্যবাটীতে এখনও বাস করিতেছেন।

বলরাম মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র রামজয় হুগলীর উপকণ্ঠস্থ জিরেট গ্রামে বিবাহ করেন, তাঁহার পত্নীর নাম সরস্বতী। রামজয় ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে অপরিণত বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র বিশ্বনাথ তখন দুই বৎসরের শিশু। এই বিশ্বনাথই আশুতোষের পিতামহ।

পিতামহ বিশ্বনাথ

ইনি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ১৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। দুইবৎসর বয়সে পিতৃহারা হইয়া তিনি মাতুলালয় জিরেটেই প্রতিপালিত হন।

বংশের নরেন্দ্রনারায়ণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভুরসুট পরগণার রাজা হইয়াছিলেন। এই নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (২৬ পর্য্যায়ে) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবিত্বের যশে সমস্ত বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্র এই দুই কবি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের দুই যুগ-প্রবর্ত্তক বিখ্যাত ব্যক্তি এবং একই বংশোদ্ভব।

ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্রের পরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুখোপাধ্যায় বংশের এই শাখায় হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' সম্পাদন করিয়া বহু মান ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের অনেকেই সংস্কৃতের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বঙ্গভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন।

হরিশ্চন্দ্র

নৃসিংহ ওঝার সহোদর রাম মুখো ফুলিয়া গ্রামের যে অংশে বাস স্থাপন করেন, তাহা 'ছোট ফুলিয়া' নামে পরিচিত হয়। আশুতোষের পিতামহ বিশ্বনাথের গৃহে যে কুল-পঞ্জী রক্ষিত ছিল, তাহাতে ১৪ পর্য্যায়ে রাম মুখোর নাম লিখিয়া এক, দুই ক্রমে পুরুষোত্তম ও তাঁহার বংশধরগণের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পুরুষোত্তম রামের ধারার অধস্তন বংশধর। কিন্তু পুরুষোত্তমের পিতা, পিতামহের নাম দেওয়া হয় নাই। সচরাচর গৃহ-পঞ্জীতে ৫।৬ পুরুষের নামই দেওয়া হয়, যে হেতু শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্ম-কার্য্য-সম্পাদনের জন্য উর্দ্ধতন কয়েকটি পুরুষের নামই প্রয়োজনীয়। যে সময়ে উক্ত গৃহ-পঞ্জী সঙ্কলিত হইয়াছিল, সে সময়ে ব্রাহ্মণ-সমাজের ঘটক-কারিকা অনেকের বাড়ীতেই থাকিত। সুতরাং ৪।৫ পুরুষের নাম পাইলেই, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের নাম সহজেই পাওয়া যাইত। কিন্তু আজকাল ঘটক-কারিকাগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে এবং যাঁহারা ফুলিয়া ছাড়িয়া গিয়াছেন বা ভঙ্গ হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম প্রসিদ্ধ ঘটককারিকাগুলিতে অনেক সময়ে বর্জ্জিত হইয়াছে। এই কারণে রাম হইতে পুরুষোত্তম কতটা দূরবর্ত্তী মহেন্দ্র বিদ্যানিধি তাহা খুঁজিয়া পান নাই। আমি নানা কুলপঞ্জী দেখিয়া রামের পরবর্ত্তী একটি বংশলতা সংগ্রহ করিয়াছি, এখানে তাহা প্রদত্ত হইল; কিন্তু এই বংশলতায়ও পুরুষোত্তমের নাম পাওয়া গেল না। অনেক সময়ে যে গৃহের বা যে শাখার বংশাবলী এই সকল গৃহ-পঞ্জীতে সঙ্কলিত হয়, তাহাতে

সংগ্রাহক কেবল নিজের পূর্ব্বপুরুষদের ধারাটিই উল্লেখ করেন, সেই বংশের অপরাপর ধারার উল্লেখ করেন না। এই জন্য বহু পুথি আলোচনা না করিলে উদ্দিষ্ট নাম পাওয়া কঠিন হয়। অনেক ঘটককারিকা লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও জীর্ণ, শীর্ণ আকারে বহুসংখ্যক ঘটককারিকার পুথি বিদ্যমান আছে। পুরুষোত্তমের উর্দ্ধতন কয়েকটি নাম এখনও চেষ্টা করিলে হয়ত পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন চতুর্দ্দশস্থানীয় রাম মুখোর বংশলতা (অসম্পূর্ণ) ঃ—
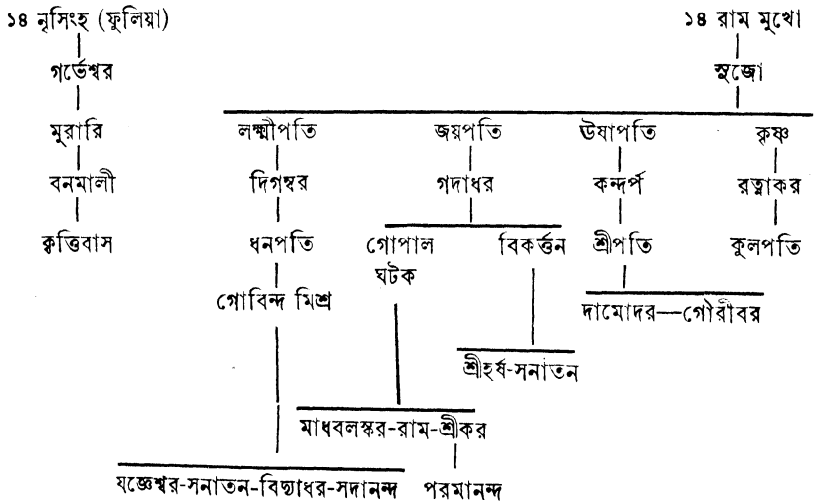
পুরুষোত্তম রামের বংশের এই সকল বংশধরের কোন্ শাখাভুক্ত ছিলেন অথবা এই বংশের অনুল্লিখিত কোন্ বংশধরের সন্তান, তাহা অবধারণ করার চেষ্টা হইতে পারে। অনেক স্থলেই গৃহ-পঞ্জীতে পূর্ব্ব-পুরুষের একটি ধারা ধরিয়া অধস্তন পুরুষ স্বীয় বংশলতা রচনা করেন, অপরাপর ধারা তাহাতে উল্লেখ করা হয় না। জিরেট, বৈদ্যবাটী, দিগসুই প্রভৃতি যে যে স্থানে রাম মুখোর সন্ততিবর্গ বাস করিতেন, এবং এখনও বাস করিতেছেন, সেই সেই

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এই বংশের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, ইহারা যেমন সংস্কৃতে, তেমনি বাঙ্গলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ শিশুকালে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কবির গান শুনিতেন। ইনি সান্নুই গ্রামস্থ বর্দ্ধমানের রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌম চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ব্রহ্মময়ীকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মময়ীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্যামসুন্দরীর পৌত্র প্যারীমোহন কবিরত্ন এক সময়ে বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে ব্যঙ্গ-কবিতা লিখিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার একটি নমুনা দিতেছি ঃ—

"চাপা দাড়ি রাখা,
চোখে চশমা ঢাকা,
ভয়ানক ঢং জেগেছে বাঙ্গলাতে।
দাড়ি রাখে লোকে হইলে মহারোগ,
এদের দাড়ি রাখা কেবল কর্ম্মভোগ,
কামান'র পয়সাটি পায় না নাপিতে।
ফিলজফার যেন ভাব্ছেন ফিলজফি,
নবাবী আমলের পুরাণা মৌলভী
বাল্মীকি কিংবা বেদব্যাস কবি,
নিমগ্ন আছেন থিওরী চিন্তাতে।"

এই কবিতাটি রজনী সেনের বৈবাহিকের দাবী সম্বন্ধে "বেয়াই কুটুম্বিতাস্থলে, বৌ দিব না ব'লে, বেশী কথা বলা ভাল নয়"—গানটির প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু দুয়েরই এক ছাঁচ, এক সুর ; মূলতান-রাগে গাহিলে দুইই একরূপ শুনায়।

বিশ্বনাথের জীবন অতীব বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রথম জীবনে তাঁহাকে কিছুদিন মুহুরীগিরি করিতে হইয়াছিল। কিছুকালের জন্য তিনি রংপুর নিমক-মহালে কাজ করিয়াছিলেন। পরে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বাদায় বামুনঘাটার (কেহ কেহ বলেন পুকুরকাটার) দারোগাগিরি কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক সময়ে রংপুর যাইবার পথে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনি বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হন ; দস্যুরা তাঁহার সমুদয় অর্থাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল।

মাতুলালয়ে তিনি শৈশবে বহু কষ্ট পাইয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর তাঁহার মাতা সরস্বতী দেবীও পরলোকে গমন করেন এবং তিনি দুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হন। মাতৃ আজ্ঞায় উত্তরকালে তিনি জিরেটেই স্বীয় বাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নানারূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তাঁহার মনটি ছিল আকাশের মত উদার। তাঁহার দানশীলতা এরূপ নির্ব্বিচারে ও অবাধ-ভাবে চলিত যে, অনেক সময়ে ভবিষ্যতের কোন সংস্থান না রাখিয়া তিনি সকলই দান করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার ব্যয়শীলতাও অত্যধিক ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা থাকমণির অন্ন-প্রাশনে তিনি সেই সময়ের একহাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন (১৮৪২ খৃঃ, ২৪শে চৈত্র)। তাঁহার মাতা সরস্বতী দেবী ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ-দর্শনে পুরী গিয়াছিলেন। তথায়ও তিনি বিস্তর দান-ধ্যান করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথকে জিরেটে কেহ 'বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়' বলিয়া ডাকিত না, তিনি 'বিশ্বনাথবাবু' নামে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিলেন। সেকালে এই 'বাবু' শব্দটি এখনকার মত সকলেই ব্যবহার করিতে পারিত না। বিশিষ্ট ব্যয়শীল ও দাতারাই ঐ উপাধি পাইতেন।

বিশ্বনাথের বাঙ্গলা গদ্য-রচনার নমুনা (প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বের)

কিন্তু যে কারণে বিশ্বনাথ আমাদের কাছে আদরণীয়, তাহা এখনও বলা হয় নাই। এক শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার একটা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তটি তাঁহার কাল্না হইতে জলপথে রংপুর পর্য্যন্ত যাওয়ার একটি ইতিহাস। বাঙ্গলা দেশের একশত বৎসর পূর্ব্বের নদী-পথের একটা ভৌগোলিক বিবরণ ঐ রোজ-নামচায় আছে। ইহা পড়িলে সেই সময়কার পূর্ব্ববঙ্গের যে অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার তারতম্য করিয়া দেখা যাইতে পারে। একশত বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে এইরূপ ভ্রমণ-কাহিনী বাঙ্গলা-গদ্যে অনেকে লিখিতেন।

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর রোজ-নামচা 'সাহিত্য-পরিষৎ' প্রকাশ করিয়াছেন। আমি সেই সময়ের লেখা এইরূপ ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বাঙ্গলা পাণ্ডুলিপির আরও দুই একখানির কথা জানি।

প্রাচীন বাঙ্গলা-গদ্যের নমুনা হিসাবে এই রোজ-নামচা খানির একটা

তিনি গণিতে কৃতবিদ্য ছিলেন এবং দুই-একটি পূর্ত্ত-বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ; এই সূত্রে তিনি পূর্ত্ত-বিভাগে কাঁসাই নদীর বাঁধের তত্ত্বাবধায়কের কাজ পাইলেন। ইহার পর ক্রমে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। কার্য্যদক্ষতা, বিপদে উপেক্ষা, অধ্যবসায় ও সাধুতা-গুণে তাঁহার ক্রমেই পদোন্নতি হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে উত্তর-পশ্চিমের অতি দুর্গম স্থানে কাজ করিতে যাইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি কাজ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যের মূল্য যাঁহারা জানিতেন, সেই কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে পুনরায় কাজ গ্রহণ করিতে সম্মত করাইয়াছিলেন।

চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল ফ্রেজার সাহেব এক প্রকাশ্য সভায় ইঁহার কার্য্যের বিশেষ সুখ্যাতি করেন এবং কিছুদিনের জন্য তিনি বস্তি ও বারাণসী জেলায় এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে গাজিপুরের ডিষ্ট্রিক্‌ট্ ইঞ্জিনিয়ার হইয়া ৭ বৎসর কাল ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার জীবন-চরিত-লেখক মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন—"তৎকালে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ইঁহার ন্যায় উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী সাবর্ডিনেট গ্রেডে কেহই ছিলেন না। সাবর্ডিনেট হইয়াও ইনিই প্রথম ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বহুমূত্র রোগের জন্য ৫৪ বৎসর বয়সে পেন্সন লইতে হইয়াছিল।" ইহার দীর্ঘকাল পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

দুর্গাপ্রসাদ পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়গণের অভাবে শিশু ভ্রাতাদের একমাত্র আশ্রয়-স্থল হইয়া বহুকষ্টে তাহাদিগকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। পক্ষী যেমন স্বীয় পক্ষ-পুটে ক্ষুদ্র শাবকদিগকে আবৃত করিয়া রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করে, তিনিও সেই ভাবে বালক হরিপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ এবং রাধিকাপ্রসাদকে সেই দুর্দ্দিনে দুর্ভাগ্যের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

যখন কলিকাতায় আটটি টাকা বৃত্তি পাইতেন, তখন তিনটি টাকায় নিজের ব্যয় চালাইয়া তিনি পাঁচটি টাকা ভ্রাতাদের জন্য জিরেটে পাঠাইয়া দিতেন। যখন বলাগড়ে যাইয়া সারাদিন লেখাপড়া করিতেন, তখন তাঁহার মন পড়িয়া থাকিত জিরেটে তাঁহার শিশু ভ্রাতাদের কচি মুখগুলি দেখিবার আশায়। তাঁহার জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন—"সারাদিন ভিন্ন গ্রামে থাকিতেন বলিয়া কনিষ্ঠ রাধিকাপ্রসাদের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হইতেন। পাঠ সাঙ্গ করিয়া বাড়ী

আসিয়া ভাইটিকে কোলে লইলে তাঁহার মন স্থির হইত।" যখন সম্বলপুরে ছিলেন, তখন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত দুর্গাপ্রসাদবাবুকে ভ্রাতাদিগের খরচের জন্য দেড় হাজার টাকার বেশী অর্থ পাঠাইতে হইয়াছিল। কনিষ্ঠ হরিপ্রসাদ তরুণ বয়সে লেখাপড়ার সুবিধা পান নাই। দুর্গাপ্রসাদের জীবন-চরিত-লেখক বলিয়াছেন—'এই অক্ষম ভ্রাতার তুষ্টিসাধনার্থ ইনি এককালে তাঁহাকে একহাজার টাকা দেন।' বিশ্বনাথের মৃত্যুকালে দুর্গাপ্রসাদ বলিয়াছিলেন,' যেমন করিয়া হউক তিনি ভ্রাতাদিগকে প্রতিপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবেন। প্রথম প্রতিশ্রুতি পালিত হইয়াছিল এবং ভাবিয়াছিলেন, ভ্রাতারা বড় হইলে সকলে মিলিয়া পিতৃঋণ শোধ করিবেন। তাহা হইয়া উঠিল না; সেই ঋণ তাঁহাকেই শোধ করিতে হইল। ভ্রাতারা তৎপরিবর্ত্তে জিরেটস্থ বাড়ীর তাঁহাদের অংশ তাঁহাকে দলিল করিয়া লিখিয়া দিলেন; এই বাড়ী তিনি ৮,০০০৲ টাকা ব্যয়ে নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

দুর্গাপ্রসাদ খাতাপত্র ঘাঁটিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের পিতৃঋণের পরিমাণ ২,০০০৲ টাকা। এই টাকা তিনি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তমর্ণ-দিগকে দান করিলেন। তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে ইহার সুদ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কারণ বহুদিন পূর্ব্বেই তমাদি-সূত্রে ঐ ঋণের দাবী ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।

আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার কুহকে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়াছি। সেকালের লোকেরা পিতৃ-ঋণ কখনও তমাদি হয়, এ কথা ভাবিতেই পারিতেন না। 'মহিষাল বন্ধু' নামক প্রাচীন পল্লী-গাথার নায়ক জনৈক তরুণ যুবকের পিতৃঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য না থাকাতে যেরূপ মনঃক্ষোভ হইয়াছিল, তাহার একটি মর্ম্মস্পর্শী চিত্র উক্ত গীতে দেওয়া হইয়াছে (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ)। এই ব্যক্তির পিতৃঋণ বর্ত্তমান আইন-অনুসারে বহু বৎসর পূর্ব্বেই তমাদি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহা শোধ করিতে না পারিয়া যুবক বৃশ্চিক-দংশনের মত তীব্র জ্বালায় দিনরাত কাটাইয়া উত্তমর্ণের পায়ে পড়িয়া সেই টাকার পরিবর্ত্তে, বিনা বেতনে, বহু বৎসরের জন্য তাহার নিকট দাসত্ব করিবার সর্ত্তে আবদ্ধ হয়। মহর্ষিদেব পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া একটা আশ্চর্য্য

পিতৃঋণের 'তমাদি' নাই

কাণ্ড করিয়াছিলেন বলিয়া নূতন পাশ্চাত্য আলোকে আলোকিত ব্যক্তিগণ ধারণা করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দেশবাসীদিগের পক্ষে ইহা নূতন ও আশ্চর্য্য কাণ্ডই বটে, কিন্তু এইরূপ কার্য্য সেকালের সচরাচর আচরিত ঘটনা। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সেদিন এইরূপ পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দুর্গাপ্রসাদ এইভাবে তাঁহার পিতৃঋণ পরিশোধ করেন, তখন তিনি ভাবেন নাই যে, উহা কোন বিস্ময়কর কাণ্ড। পিতৃঋণ-পরিশোধের যে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের সীমা আছে এবং তাহা অতিক্রান্ত হইলে সেই ঋণের দায় হইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তাহা সেকালের লোকেরা বিশ্বাস করিতেন না। আমাদের সমাজ-জীবনের বড় বড় আদর্শগুলি পরানুকরণে আমরা একান্ত ক্ষুণ্ন করিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে সমাজ সেই সমস্ত মহৎগুণ-বিচ্যুত হইয়া অস্থি-মজ্জাহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। অথচ পাশ্চাত্য জাতিদের রাজসিক রাষ্ট্র-জীবন যেরূপ জাগ্রত ও সবল, আমরা তাহা পাই নাই। আমাদের সমাজিক জীবনে যে সকল গুণ স্বচ্ছতোয়া নদীর প্রবাহের মত স্বর্গকে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখাইত, তাহা আমরা শুধু হারাই নাই, হারাইয়া বাহাদুরী দেখাইতেছি। এ জাতির এখন আর কি গুণ রহিল, যাহাতে ভবিষ্যতে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা আস্থা-পরায়ণ হইতে পারি।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে দুর্গাপ্রসাদ যে পুস্তকালয় স্থাপন করেন, তাহা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়াছে। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথের লিখিত 'ভগবানের লক্ষ নাম' তিনি বহুদিন যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই হস্তাক্ষর-যুক্ত পবিত্র নামাবলী তৎপুত্র সতীশবাবুর কাছে এখন নাই।

দুর্গাপ্রসাদের কনিষ্ঠ হরিপ্রসাদ ততটা উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না।

দুর্গাপ্রসাদের কনিষ্ঠ হরিপ্রসাদ—জন্ম ১৮৩৪ খৃঃ

কিন্তু ইংরাজী ভাল না জানিলেও তিনি বাঙ্গলা গদ্য ও পদ্যে অনেক বই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'বিচিত্র বঙ্গচিত্র' ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়, উহা তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। উৎসর্গ-পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরিক কুসংস্কার ও দুর্নীতি দেখিয়া আপনি সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া থাকেন এবং যাহাতে অবৈধ দেশাচারগুলির মূলোৎপাটন

করিতে চোখের সম্মুখ দিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এই ঘটনার পর আশুতোষের এ সম্বন্ধে সতর্কতা একটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

রাধিকাপ্রসাদ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সিনেটের সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন এবং তদবধি তাঁহার নিকট বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত যে সমস্ত কাগজ-পত্র, পুস্তক ও 'মিনিট' আসিত, তদীয় গৃহে সেই সকলের এক অতীব আগ্রহশীল পাঠক জুটিয়াছিলেন, যিনি নীরবে অবসরকাল সে গুলি একরূপ গ্রাস করিয়া ফেলিয়া ভবিষ্যৎ কীর্ত্তি-মঠ গড়িবার পরিকল্পনা করিতে ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আশুতোষ।

রাধিকাপ্রসাদের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ গিরীন্দ্রচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ ফণীন্দ্রচন্দ্র। পাটের ব্যবসায়ে গিরীন্দ্রচন্দ্র পৈত্রিক সম্পত্তি সমস্তই নষ্ট করিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন।

পিতা গঙ্গাপ্রসাদ

জন্ম—১৮৩৬ খৃঃ, ১৭ই ডিসেম্বর

মৃত্যু—১৮৮৯ খৃঃ, ১৩ই ডিসেম্বর

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদের দ্বারাই শৈশবে গঙ্গাপ্রসাদ লালিত-পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও অপূর্ব্ব মেধাবী ছিলেন বলিয়া তরুণ যৌবন হইতে তিনি অনেক পরীক্ষাতেই বৃত্তিলাভ করিয়া ভ্রাতার গুরুভার কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারিয়াছিলেন।

১৮৬১ খৃঃ বি-এ পাশ।

আইন শিক্ষা

যে বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর (১৮৫৭ খৃঃ) গঙ্গাপ্রসাদ হেয়ার স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন এল-এ (আধুনিক আই-এ) পরীক্ষার সৃষ্টি হয় নাই। এন্ট্রান্স পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর চারি বৎসর পরে বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম ছিল। তদনুসারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর ব্যারিষ্টার মনট্রিওর নিকট কিছুকাল আইন অধ্যয়ন করেন।

সহসা তিনি আইনের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ডাক্তারী ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত হইবার সঙ্কল্প করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে

তিনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন; তৎপূর্ব্বে কোন বি-এ পাশ করা ছাত্র মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন কি-না জানি না। কিন্তু ইনি যে কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজের প্রথম বি-এ পাশ-করা ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিনি মেডিক্যাল কলেজের কয়েকটি বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ধাত্রী-বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি একটি পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেই বৎসরই মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক পাট্রিজ সাহেব তাঁহার মনস্বিতা, চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষকালে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দেই তিনি কাঁসারীপাড়া নিবাসী হরলাল চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা জগত্তারিণী দেবীর পাণি-গ্রহণ করেন; তখন গঙ্গাপ্রসাদের বয়স কিঞ্চিন্ন্যূন ২৮ বৎসর।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দে এম্-বি

বিবাহ

গঙ্গাপ্রসাদের তিনটি সন্তান হইয়াছিল—আশুতোষ ও হেমন্তকুমার, এই দুইটি পুত্র এবং হেমলতা নাম্নী কন্যা।

সে সময়ে কলিকাতা অঞ্চলে ভবানীপুর একটি শ্রেষ্ঠ ভদ্র-নিবাস ছিল। এই স্থানটি সুপ্রীমকোর্ট এবং সদর দেওয়ানীর সন্নিহিত ছিল; এজন্য উকিল-মোক্তারগণ দলে দলে এই স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান হাইকোর্টের ভিত্তি পুরাতন 'ভবানীপুর রোডের' উপর। সেই সময় এই স্থান বড় বড় জজ্ ও শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অধ্যুষিত হইয়া গৌরবজনক হইয়াছিল। জাষ্টিস্ শম্ভুনাথ, দ্বারকানাথ-মিত্র, কবিবর হেমচন্দ্র এবং ভারতীর বরপুত্র মধুসূদন দত্ত এককালে এই ভবানীপুরে বাস করিয়া ইহাকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাপ্রসাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদ ভবানীপুরের প্রথিতযশা, ধনাঢ্য অধিবাসী চন্দ্রমোহন গাঙ্গুলীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমোহনবাবুর ভবানীপুরে একটি ডিস্পেন্সারী ছিল, তিনি গঙ্গাপ্রসাদকে ভবানীপুরে থাকিয়া চিকিৎব্যবসায় করিতে পরামর্শ দেন এবং গঙ্গাপ্রসাদের অকৃত্রিম

সেই সময়ের ভবানীপুর

সুহৃদ্ প্রসন্নকুমার বসু, যিনি উত্তরকালে কৃষ্ণনগর আদালতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল হইয়াছিলেন, তিনিও প্রথম জীবনে ভবানীপুরে অবস্থানকালে গঙ্গাপ্রসাদকে এই অঞ্চলটাই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র করিতে পরামর্শ দেন। এই সকল কারণে কলেজ নিষ্ক্রান্ত কর্ম্মবীর গঙ্গাপ্রসাদ ভবানীপুরে থাকিয়া ব্যবসায় চালাইতে সঙ্কল্প করেন।

যদিও গঙ্গাপ্রসাদের শিক্ষা-জীবনের সুখ্যাতি তাঁহার দিকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তথাপি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর তাঁহাকে

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী

একটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইঁহার নাম গোপালচন্দ্র রায়। ইনি খৃষ্টান ছিলেন এবং বিলাত হইতে এম্-ডি উপাধি পাইয়া ভবানীপুরে অতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত 'ম্যালেরিয়া-জ্বর'-নামক একখানি পুস্তকের বহুল প্রচার হইয়াছিল। গঙ্গাপ্রসাদকে এই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রে যুঝিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। গঙ্গাপ্রসাদের অধ্যবসায় ও দৃঢ় সঙ্কল্পের তুলনা ছিল না; ধীরে ধীরে গোপাল রায়ের যশঃ-চন্দ্রিকা দিগ্বলয়ে ক্ষীয়মান হইল, এবং তরুণ সূর্য্যের ন্যায় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের প্রতিভা-প্রভা গগন-মণ্ডল আলোকিত করিল।

গঙ্গাপ্রসাদের একটি অসাধারণ গুণ আশুতোষ পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সর্ব্বতোমুখী মনস্বিতা। আমরা অনেক বড় ডাক্তারের কথা অবগত আছি, কিন্তু তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের ব্যবসায়ের খ্যাতির জন্য পরিচিত, কিন্তু সংসারের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্ব বিভাগেই গঙ্গাপ্রসাদের সম-শক্তি ও সম-অনুরাগ পরিলিক্ষিত হইয়াছিল। এই দূর-প্রসারিত, বিচিত্র প্রতিভা লইয়া জীবনে কোন নির্দ্দিষ্ট গতিপথ নির্ণয় করিয়া লইতে গঙ্গাপ্রসাদের একটু চিন্তা করিতে হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থের একজন অক্লান্ত পাঠক ছিলেন, হয়ত অধ্যাপক হইলেও তিনি যশস্বী হইতে পারিতেন। ব্যবহারজীবী হওয়ার জন্য তো তিনি রীতিমত মন্ট্রিও সাহেবের নিকট প্রেসিডেন্সী কলেজে ছয়মাস কাল আইন পড়িয়াছিলেন। ইংরাজী কবিতা তাঁহার এত মুখস্থ ছিল যে, তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্রকে তাহা আবৃত্তি করিয়া শিখাইতেন এবং প্রাতঃভ্রমণ-কালে তাঁহাকে বড় বড় মহাপুরুষের

চরিতাখ্যান ও কীর্ত্তি-কথা শুনাইয়া সেই আদর্শে জীবন গঠনের অনুপ্রাণনা প্রদান করিতেন। গঙ্গাপ্রসাদ তৎকালীন বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বিশ্বম্ভর পাইন 'জগন্নাথ মঙ্গল', 'বৃন্দাবন-প্রত্যুপায়', 'প্রেম-সম্পুট', 'ভক্তরত্নমালা', 'কন্দর্প-কৌমুদী', 'সঙ্গীত মাধব' প্রভৃতি বহু পুস্তক বাঙ্গলা-ভাষায় রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 'বসন্ত-সেনা'-প্রণেতা মধুসূদন বাচস্পতি, তৎকালের প্রধান ঐতিহাসিক নীলমণি বসাক, 'এডুকেশন-গেজেটের'-প্রতিষ্ঠাতা বাবু প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি তৎকাল-প্রসিদ্ধ বঙ্গ-ভাষার লেখকদের সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদের স্থান এক পংক্তিতে ছিল। তিনি যে সকল পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা পরে দিতেছি। তিনি রামায়ণের অনেকাংশ বাঙ্গলা পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইহার প্রতিভা বিচিত্রমুখী ছিল। তিনি যে ক্ষেত্রে যাইতেন, সেই ক্ষেত্রেই হয়ত সোনার ফসল-লাভ হইত। ডাক্তারী-ব্যবসায়ে তিনি ধন্বন্তরীর যশঃ অর্জ্জন করিয়া বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই চিকিৎসা-বিদ্যা তাঁহার পায়ে বেড়ি দিয়া তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার গতিপথ একবারে বদ্ধ করিয়া রাখে নাই। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতা-সম্বন্ধেও এই বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করিয়া তদ্‌বিষয়ক সন্দর্ভের মুখ-বন্ধ করিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান

তৎকালে মেডিক্যাল-কলেজে ইংরাজী ও বাঙ্গলা এই দুই বিভাগ ছিল, সুতরাং বাঙ্গলা-বিভাগের ছাত্রদের জন্য বাঙ্গলা-ভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্র সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। গঙ্গাপ্রসাদের 'মাতৃশিক্ষা' একখানি মূল্যবান গ্রন্থ; উহা চিকিৎসা-বিষয়ক খুটি-নাটি ও ঔষধ প্রভৃতির কথা সংবলিত, সাধারণের পাঠোপযোগী একখানি চিকিৎসা-পুস্তক। বাঙ্গলার জননীদের নিকট উহার মূল্য এখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, "বঙ্গের মাতৃগণ উপন্যাস ও গল্প না পড়িয়া 'মাতৃশিক্ষা'র মত পুস্তক পড়িলে অনেক উপকার পাইতে পারেন।" গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তাঁহার বিখ্যাত 'প্রাকটিস্ অব মেডিসিনে'র প্রথম খণ্ড ও ঐ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার

বিস্তৃত 'শারীর বিদ্যা'র (Anatomy) প্রথম ভাগ (মূল্য—৫৲ টাকা) ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

মেডিক্যাল কলেজে যদি বাঙ্গলায় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের রীতি পূর্ব্ববৎ প্রচলিত থাকিত, তবে ডাক্তারীর জ্ঞান দেশময় সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত; সর্ব্ববিষয়ে বঙ্গভাষাকে শিক্ষার গণ্ডী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া দেশের মৌলিক চিন্তা, মৌলিক গবেষণার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি আশুতোষ ও তাঁহার যোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ এই অভিযোগ হইতে শিক্ষাবিভাগকে মুক্তি দিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। যে সময় গঙ্গাপ্রসাদ 'মাতৃশিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গলা-ভাষায় রচনা করেন, সেই সময় ঢাকার ক্যাম্বেল চিকিৎসা-শিক্ষায়তনের অধ্যাপক খ্যাতনামা কাশীকুমার দত্ত (রায় বাহাদুর) বাঙ্গলায় কতকগুলি সুবৃহৎ চিকিৎসা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

যে সময় গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহার রামায়ণের অনুবাদ রচনা করেন, সে সময়ের হিসাবে তাঁহার পদ্যরচনা বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়াছিল। কবি রাজকৃষ্ণের রামায়ণের অনুবাদ হইতে গঙ্গাপ্রসাদের অনুবাদ সুন্দর ও সুললিত হইয়াছিল।

চিকিৎসা-ব্যবসায়-সম্বন্ধে গঙ্গাপ্রসাদের অনুকূল মত ছিল না। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন—"আমার বংশে কেহ যেন ডাক্তার না হয়।" তিনি সুপ্রসিদ্ধ এবং কৃতবিদ্য চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁহার আয়ও প্রচুর ছিল, তথাপি ভিষক-বৃত্তির উপর তাঁহার বিতৃষ্ণার কারণ কি, সহজেই এই প্রশ্ন মনে হইতে পারে। তিনি তাহার কারণ এইভাবে দেখাইতেন। তখন

চিকিৎসা-ব্যবসায় সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত

ভবানীপুর বা কলিকাতা এত বড় ধনিনিবাসে পরিণত হয় নাই। ডাক্তারগণের মধ্যে যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও দুই টাকার বেশী 'ফি' পাইতেন না। গঙ্গাপ্রসাদ যখন ভবানীপুরে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তখনও তাঁহার 'ফি' চার টাকা মাত্র ছিল। তিনি দেখিতেন, এই দুই টাকা কিংবা চার টাকা 'ফি' দিতেও অনেকের কষ্ট হইত। গঙ্গাপ্রসাদ রোগীর অবস্থা-বিবেচনায় কখনও কখনও 'ফি' লইতেন না, এমন কি ঔষধের দাম পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতেন। তথাপি তিনি মাঝে মাঝে

বুঝিতেন, তাঁহাকে সেই অল্প 'ফি' দিতেও গৃহস্থের কষ্ট হইতেছে। এমনও ঘটনা ঘটিয়াছে যে, ঔষধের দাম ও তাঁহার 'ফি' সংগ্রহের জন্য গৃহস্থ পশ্চাৎ দ্বার দিয়া একখানি গহনা লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন, উহা বন্ধক দিয়া টাকা আনিবার ব্যাপার আভাসে টের পাইয়া তিনি সে বাড়ীর 'ফি' গ্রহণ করেন নাই এবং নিজের ডিস্পেন্সারী হইতে বিনামূল্যে ঔষধ যোগাইয়াছেন।

এই সকল অবস্থা-দর্শনে তাঁহার স্বাভাবিক দয়াপ্রবণ হৃদয়ে একটা কুণ্ঠার ভাব জাগিয়া উঠিত। আমাদের শাস্ত্রে ভিষকদের বৃত্তি একান্ত নিঃস্বার্থ হওয়ার বিধান আছে। কথিত আছে, বৈদ্যগণ যে অবধি জনহিতকর চিকিৎসা বৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই অবধি তাঁহাদের আসন ব্রাহ্মণগণের পংক্তি হইতে নামিয়া গেল।

সদ্‌ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসাবৃত্তি অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসায়ে পরিণত করিতে স্বতঃই একটা দ্বিধার ভাব মনে হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এজন্য তিনি বলিতেন—ব্যবহারজীবীর এ সকল বালাই নাই। যাহারা আদালতে উপস্থিত হয়, তাহারা একটা জেদের বশবর্ত্তী হইয়া আসে; ব্যবহারজীবীর অতিরিক্ত দাবী মিটাইতেও তাহারা কোন কুণ্ঠা বোধ করে না। অন্যান্য অর্থোপার্জ্জনের বৃত্তিতেও এই বাধার ভাব মনে হইবার কারণ নাই।

গঙ্গাপ্রসাদ চিকিৎসা করিতে যাইয়াও মাঝে মাঝে রহস্যপ্রিয়তা দেখাইয়াছেন। একদিন তিনি কৌতুক করিয়া একটি অল্পবয়স্ক রোগীর গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন; সে যখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল, তখন তিনি পকেট হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া তাহার পৃষ্ঠের দুষ্ট ব্রণটি কাটিয়া ফেলিলেন, বালকের আর নূতন করিয়া কাঁদিতে হইল না, কিংবা হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করিতে হইল না।

গঙ্গাপ্রসাদ অতি উন্নতমনা ছিলেন। তিনি অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন যথেষ্ট, কিন্তু অর্থলোভ তাঁহার চরিত্রে ছিল না। তিনি নিজে

অর্থ-স্পৃহা শূন্যতা

সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হরলাল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া অর্থলোভ হইতে গুণের আদর্শের প্রতিই অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তৎপুত্র আশুতোষের বিবাহের একটি প্রস্তাব কোন বিশিষ্ট ধনীর গৃহ হইতে আসিয়াছিল। এই ধনী ব্যক্তি আশুতোষকে

বিলাতে পাঠাইয়া শিক্ষা-পরিসমাপ্তির ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত এবং যৌতুক বাবদ নগদ ৩০,০০০৲ টাকা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন *। কিন্তু এই প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া তিনি কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর সঙ্গে আশুতোষের বিবাহ স্থির করিলেন। শ্রীমতী যোগমায়া দেবী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী। আমার এক পুত্রবধূ তাঁহার সহিত মধুপুরে বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন; তিনি এ বৎসরও ভবানীপুর যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া বলিলেন—"তাঁহার সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আর নাই। কি প্রতিমা দেখিয়াছিলাম, আর কিই বা দেখিয়া আসিলাম! কঠোর বৈধব্য ও তপশ্চরণ-হেতু তাঁহার সে বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে; দেখিয়া চক্ষে জল আসিল।" 'আশুতোষের ছাত্র-জীবন'-লেখক অতুলবাবু লিখিয়াছেন—"যোগমায়া দেবীর পিতা অবস্থাপন্ন ছিলেন না। বিবাহের পর যে সকল তত্ত্ব আসিত, পাছে তাহার স্বল্পতা লইয়া কথাবার্ত্তা হয়, এজন্য গঙ্গাপ্রসাদ সেই সকল তত্ত্ব দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং বলিতেন—'আহা তাহারা এমন দেবী দিয়াছে, তার বেশী তাদের আছেই বা কি, আর দিবেই বা কি?' "

পিতামাতা ও বংশের অনেক পুণ্য না থাকিলে আশুতোষের মত পুত্র জন্মে না; অনেক তপস্যায় ও বহু পুণ্যের জোরে ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষ হেন পুত্র পাইয়াছিলেন। পুত্রকে তিনি অপরাপর পিতার ন্যায় শুধু বাৎসল্যের সহিত লালন-পালন করিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইল, মনে করেন নাই। নিপুণ মালী যেমন উৎকৃষ্ট ফুলের গাছটিকে রোপন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া তাহার কুসুম-উদ্গমের সময় হইতে যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, গঙ্গাপ্রসাদও তদ্রূপ শিশু আশুতোষের প্রতিভা প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ্য করিয়া তাহার বিকাশের সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে স্নেহশীল পিতার অভাব নাই, কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য-বোধ এবং তাহার চরিত্র-গঠনের দায়িত্ব-জ্ঞান সকল পিতার থাকে না। আশুতোষ অবশ্যই প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ খনির স্বভাবজাত

* মহেন্দ্র বিদ্যানিধিকৃত 'ভরদ্বাজ গোত্র'—৪৮ পৃঃ

আশুতোষ-পত্নী শ্রীমতী যোগমায়া দেবী (লেডি মুখার্জ্জি)

সোনাকে স্বর্ণকার তাহার ইচ্ছামত গড়ন দিয়া অলঙ্কার তৈয়ারি করিয়া থাকে, সেইরূপ গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাপ্রসাদ একটা গুরুতর মনস্তাপে একরূপ ভাঙ্গিয়া পড়েন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র, আশুতোষের কনিষ্ঠভ্রাতা হেমন্তকুমার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ও দর্শন-শাস্ত্রে 'অনার্স' সহ বি-এ পাশ করেন। অকস্মাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া এই মেধাবী তরুণ যুবক ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর বিংশ বর্ষ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি গঙ্গাপ্রসাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল; তিনি এই দুর্ঘটনার পরে মাত্র দুইটি বৎসর জীবিত ছিলেন। এই পুত্রের স্মৃতি-রক্ষার জন্য গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ২,৫০০৲ টাকা প্রদান করেন, তদ্দ্বারা 'হেমন্তকুমার-পদকে'র সৃষ্টি হইয়াছে।

হেমন্তকুমারের মৃত্যু—১৮৮৭ খৃঃ

গঙ্গাপ্রসাদ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস-পরায়ণ ছিলেন; তিনি পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না, অধ্যয়ন-নিরত এবং সতত কর্ম্মশীল ছিলেন। ইঁহার চরিত্রে যে সকল গুণ কুঁড়ির মত দেখা গিয়াছিল, সেই গুণাবলী আশুতোষে পূর্ণ শতদল হইয়া বিকাশ পাইয়াছিল।

যে সকল কারণে তিনি ভবানীপুরই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র-স্বরূপ মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভবানীপুর রসারোডের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ১লা বৈশাখ তথায় প্রবেশ করেন; এই গৃহে তিনি একাদিক্রমে ১৭ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গৃহ-নির্ম্মাণের ৮ বৎসর পূর্ব্বে আশুতোষ বৌবাজারের মলঙ্গা লেনের এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় গঙ্গাপ্রসাদ মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রতিকৃতি গৃহীত হইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই চিত্র লওয়ার সময় তাঁহার বয়স ছিল ৫২।৫৩ বৎসর; তৎকালে তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট, গৌরবময় মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় না যে, তাহাতে মৃত্যুর কোনরূপ ছায়া পতিত হইয়াছিল। অনেক পরিবারেই বংশগত চেহারার সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু আশুবাবুদের

বংশে এই সৌসাদৃশ্য ও সমলক্ষণগুলি এত সুপরিস্ফুট যে, তাহা সহজেই আবিষ্কৃত হয়। আশুবাবুর পিতার সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য জাজ্জ্বল্যমান, শ্যামাপ্রসাদকে তাঁহার পিতার দ্বিতীয় প্রকাশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, উমাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদেও সেই সাদৃশ্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়; রমাপ্রসাদের মুখমণ্ডলের অধস্তন অংশ ও তাঁহার গোঁফজোড়াটি ঠিক তাঁহার পিতার।
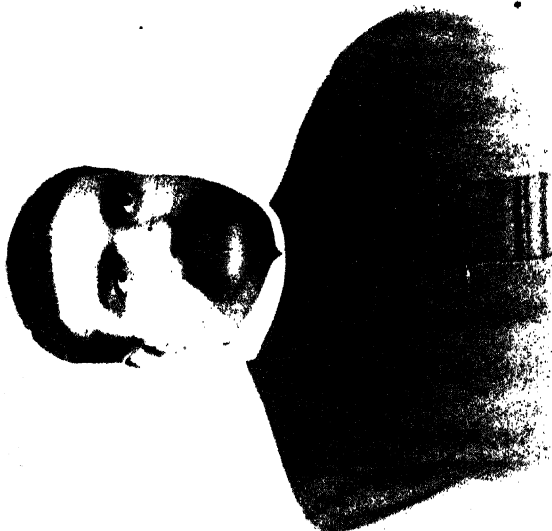
জীবন-প্রভাতে

জন্ম—১৮৬৪ খৃঃ, ২৯শে জুন, সোমবার

মৃত্যু—১৯২৪ খৃঃ, ২৫শে মে, রবিবার

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি আশুবাবু গঙ্গাপ্রসাদের ছাত্রাবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন, সোমবার তাঁহার জন্ম হয়, তখন গঙ্গাপ্রসাদের বয়স ২৯ বৎসর এবং তিনি মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। আশুতোষ বৌবাজার, ১৭নং মলঙ্গা লেনের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক মহাশয় আশুবাবুর নিজ মুখে শুনিয়া তাঁহার জীবনের অনেক কথা 'নোট' করিয়া লইয়াছিলেন। তাহা হইতে জানা যায়, আশুবাবু বাড়ীতে 'প্রথম ভাগ' শেষ করিয়া ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া শিশুবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হ'ন। সেখানে শিক্ষক ও শিশুদলের অবিরত কলরব শুনিয়া বালক মনে করিয়াছিলেন, উহা একটি যাত্রা-দলের বৈঠক; ঐ গোলমাল তাঁহার ভাল লাগে নাই। গঙ্গাপ্রসাদ নিজে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যাইয়া বালকের পড়ার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

বাল্য-জীবন

পিতা ও পুত্রের এরূপ ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্য এবং পিতা কর্ত্তৃক পুত্রের জ্ঞান-উন্মেষের এরূপ অবিশ্রান্ত চেষ্টার দৃষ্টান্ত বিরল। প্রকৃতি যেরূপ তরুটির অঙ্কুরোদ্গম হইতে প্রতিনিয়ত তাহার পত্র-পুষ্প-বিকাশ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও তাহাকে বিরাম দেন না, অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তাহার প্রতি লক্ষ্য আবদ্ধ রাখেন, সেইরূপ গঙ্গাপ্রসাদও আশুতোষের মানসিক উন্নতির প্রতি বদ্ধলক্ষ্য, আগ্রহশীল ও মনোযোগী ছিলেন।

ইংলণ্ডে জেমস্ মিল তাঁহার পুত্র জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের বুদ্ধি-বৃত্তির উৎকর্ষের জন্য এইরূপ চেষ্টিত ছিলেন। বাঙ্গলা দেশে গঙ্গাচরণ সরকার ও অক্ষয়কুমার সরকারের মধ্যে পিতা-পুত্রের এইরূপ মনোরাজ্যের অন্তরঙ্গতা ছিল বলিয়া শুনিয়াছি।

পিতার সঙ্গে অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া আশুতোষ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তখন পিতা উৎসাহী পুত্রকে 'জ্ঞান, ধর্ম্ম—কত পুণ্য কাহিনী শুনাইতেন এবং সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষার বীজ তাঁহার চিত্তে অঙ্কুরিত করিতে প্রয়াসী হইতেন। মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—" 'রবিন্সন ক্রুসো' ও 'গালিভার্স ট্রাভেলে'র সুদীর্ঘ অংশ আশুতোষ এই সময় পিতাকে মুখস্থ শুনাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ আবৃত্তি করিয়াও শুনাইতে হইত। দুই বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া আশুতোষ একবারে হাই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহাকে বাড়ীতে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পিতা স্বয়ং তাঁহাকে পড়াইতেন, তাহা ছাড়া যোগ্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অধ্যবসায়শীল পুত্র পিতার নিকট অধ্যবসায়ের যে প্রেরণা পাইলেন, তাহা উর্ব্বর ক্ষেত্রে শস্যের বীজের ন্যায় তাঁহার শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ ফসল আনয়ন করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই পুস্তক-পাঠের প্রতি তাঁহার লুব্ধ দৃষ্টি পড়িল এবং তাঁহার অদ্ভুত স্মরণ-শক্তির বলে তিনি সেই বয়সে যে বিদ্যা অর্জ্জন করিলেন, তাহা পরিণত বয়সের ছাত্রের যোগ্য। তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সাউথ সুবার্ব্বান স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন; তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্বনামধন্য শিবনাথ শাস্ত্রী। কথিত আছে আশুতোষ সেই সময়েই বীজগণিতের ন্যায় কঠিন বিষয়টিও কতকটা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

আশুবাবু যদিও শৈশব হইতেই লেখাপড়ায় অতিরিক্ত পরিমাণে মনোযোগী ছিলেন এবং তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সেই বয়সে নিতান্ত শান্ত, শিষ্ট, ভাল ছেলে বলিয়া পরিচিত হন নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্তকুমারের আকৃতি অতি সুশ্রী ছিল; তিনি গৌরবর্ণ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। এইজন্য সকলেই এই ফুটফুটে ছেলেটিকে আদর করিত। এদিকে বাল্যকালে আশুবাবুর রোগা চেহারা, শ্যাম বর্ণ, মস্ত বড় একটা মাথা লোকের তাদৃশ আদর আকর্ষণ করিতে পারে নাই। গৃহে কনিষ্ঠ সহোদরটিকে লইয়াই মাতাপিতার অজস্র সোহাগের বৃষ্টি হইত। নিজেকে উপেক্ষিত মনে করিয়া আশুতোষ নীরবে ক্রোধে এবং অভিমানে ধূমায়িত হইতে থাকিতেন। একদিনের একটা ঘটনায়

বাল্যের দুরন্তপণার একটি ঘটনা

আশুতোষের ক্রোধ একটু গুরুতর ভাবে প্রকাশ পাইল। তখন তাঁহার বয়স ৪।৫ বৎসর,—তিনি একটা লোহার ডাণ্ডা অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া হেমন্তকুমারকে উহার গরম দিকটা দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিতে আহ্বান করিলেন। তার পর বালকের ভীষণ চীৎকারে যখন বাড়ীর সকলে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন, তখন অবস্থা যে কিরূপ সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া বালক আশুতোষ পলাইয়া গিয়া একটা গাড়ীর ভিতরে আশ্রয় লইলেন এবং ধ্যানস্থ যোগীর মত ভয়ে মৌনী হইয়া রহিলেন। হেমন্তকুমারের হাতে প্রলেপের ব্যবস্থার পরে সকলে আশুতোষকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু ভীত ও আড়ষ্ট আশুতোষের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সকলে যখন প্রকৃতই তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা গাড়ীর ভিতর হইতে সেই ক্ষুদ্র রত্নটিকে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া বাহির করিলেন।

১৮৬৯ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আশুতোষ বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আড়াই বৎসরের মধ্যে তিনি বাঙ্গলা-স্কুলের সাতটি ক্লাসের পাঠ সাঙ্গ করেন; এই সাফল্য অদ্ভুত বটে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর তিনি বাড়ীতে অধ্যয়ন করেন, তৎপূর্ব্বেই (১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে) ক্যাম্বেলের 'Pleasures of Hope', পোপকৃত হোমারের ইলিয়াডের প্রথম অধ্যায় এবং মিল্টনের 'Paradise Lost'এর প্রথম ক্যাণ্টোর সমস্তই তিনি কণ্ঠস্থ বলিতে পারিতেন। যদিও ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের দু'টি সতর্ক চক্ষু প্রহরীর মত সর্ব্বদা আশুতোষের প্রত্যেকটি কাজ নিয়ন্ত্রিত করিত, তথাপি পুত্রটি সর্ব্ব বিষয়ে পিতার অনুগামী ও আজ্ঞাধীন থাকিয়াও শুধু স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে সেই স্নেহশীল পিতার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণে পড়াশুনা করার দরুন তাঁহার কঠিন রোগ হইয়াছিল; পরীক্ষার প্রায় তিন মাস পূর্ব্ব হইতে তাঁহার শরীরময় একজিমা দেখা দেয়, অনেক সময় তিনি নড়িতে চড়িতে অসমর্থ হইয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতেন; এতৎসত্ত্বেও তিনি সাউথ সুবার্ব্বন্ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সেই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যুৎপন্ন ছাত্র ছিলেন; তথাপি যে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ কঠিন পীড়া। ১৮৭৯

পাঠ্য-জীবন

খৃষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ২০৲ টাকার বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

এফ্-এ পরীক্ষার সময় গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহার পুত্রের স্বাস্থ্যের দিকে বেশী মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে বেশী রাত্রি জাগিয়া পড়িতে নিষেধ করা সত্ত্বেও আশুতোষ পিতাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তিনি নিদ্রিত হইলে প্রদীপ জ্বালাইয়া পড়িতে বসিতেন এবং এইভাবে নৈশ জাগরণের রীতি অনেক দিন চালাইয়াছিলেন; অতুলবাবুর পুস্তক হইতে আমরা একথা জানিতে পাই। মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"তিনি রোজই রাত্রি একটার আগে ঘুমাইতেন না এবং বিদ্যানুরাগ আপন অধিকার-সীমা অতিক্রম করিল। দ্বিতীয় বর্ষে (দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময়) তাঁহার শিরঃপীড়া হইল,—অগত্যা মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে কলেজ হইতে ছুটি লইতে হইল।" ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ, এপ্রিল ও মে মাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিয়া গঙ্গাপ্রসাদ যথোচিত যত্নে স্বয়ং চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের প্রকোপ কমিল না, বরং বাড়িয়াই চলিল। বাধ্য হইয়া আশুতোষকে তিনি আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য গাজিপুরে পাঠাইলেন। সেখানে গঙ্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন; আশুতোষ তাঁহারই কাছে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতে লাগিলেন। গাজিপুর সহরকে একখানি গোলাপের বাগান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; আশুবাবু সেই গোলাপের সুরভি ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া পুলকিত হইলেন। অতুল ঘটক এই উপলক্ষে একটি কৌতুকাবহ গল্প লিখিয়াছেন। তিনি যখন আশুতোষের নিজের মুখে সকল কথা শুনিয়া তাঁহার চরিতাখ্যানের 'নোট' লইয়াছিলেন, তখন গল্পটি যে সত্য, তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"একটি বালক-নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রাঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া ইন্দারার পার্শ্বে উপবিষ্ট আশুতোষকে বহুসংখ্যক ভীমরুল আক্রমণ করে, এবং তাঁহার গ্রীবাদেশে এরূপ ভয়ানকভাবে দংশন করে যে, তিনি দুই দিন অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আশুতোষের জ্ঞান হওয়ার পর কিছুকালের জন্য তাঁহার নিদারুণ মস্তিষ্ক-পীড়ার সম্পূর্ণ উপশম হইয়া গেল। এই অলৌকিক ঘটনা শ্রবণ করিয়া ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিলেন, 'ভীমরুলের বিষ ব্যাধির বিষ নষ্ট করিয়াছে।'"

যাহা হউক, এবার সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পরেও আবার শরীর খারাপ হইল, রোজ বিকালে মাথা ধরিত। এই অবস্থায় যে তিনি পরীক্ষা দিবেন, তাহা কেহ মনেও করিতে পারেন নাই; কিন্তু আশুতোষ জেদ করিলেন, পরীক্ষা তিনি দিবেনই। পাছে মনোভঙ্গ হইলে আশুতোষ দমিয়া যান, কিংবা তাঁহার দুর্ব্বল দেহ অসোয়াস্তির দরুন কাতর হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় গঙ্গাপ্রসাদ সেইবারই তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিলেন। পরীক্ষা-গৃহে লিখিতে লিখিতে আশুবাবুর দক্ষিণ বাহু অবশ হইয়া পড়িত। মহেন্দ্র বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন—"পিতৃদেব পরীক্ষা-গৃহে ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারী লইয়া উপস্থিত হইতেন। পুত্রের শরীরে ব্যাটারী সংলগ্ন করিয়া দিলে এক ঘণ্টা লেখা চলিত। তথাপি তিনি তৃতীয় হইয়া পঞ্চবিংশতি মুদ্রার বৃত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন।"

আশুতোষ স্থূলকায় ছিলেন; বাঙ্গলা দেশে স্থূল শরীরটা অনেক সময় স্বাস্থ্যের নিবাস বলিয়া অনুমিত হয়। আমরা বহুবৎসর আশুতোষকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে এবং তাঁহার গৃহে দেখিয়াছি; তখন তো তাঁহাকে সুস্থ বলিয়াই মনে হইত, কখনও কখনও সামান্য সর্দ্দি-জ্বর হইয়া দুই একদিন শয্যায় থাকিতে দেখিয়াছি। তিনি সন্দেশাদি মিষ্ট দ্রব্য খাইতে ভালবাসিতেন; খুব প্রচুর পরিমাণে না হইলেও, যাহা তাঁহার নিত্যকার আহার্য্য ছিল, তাহা রুগ্ন ব্যক্তির পথ্য আদৌ নহে। কিন্তু এখন মনে হয়, তাঁহার মূর্ত্তি হৃষ্ট-পুষ্ট থাকিলেও তাহা তাঁহার অসীম কর্ম্ম-শীলতার উপযোগী ছিল না। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল কাঠামোর উপর ভগবান একটা বৃহৎ ও অসাধারণ বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র এরূপ বিরাট ও বিশাল ছিল এবং তাঁহার কর্ম্মশীলতা এরূপ প্রভঞ্জনের গতিতে সেই যন্ত্রটি পরিচালনা করিত যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। যখন এইরূপ অসাধারণ কর্ম্মশক্তির অধীন হইয়া মনস্বী ব্যক্তিরা তাঁহাদের কর্ত্তব্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'ন, তখন তাঁহাদের পক্ষে দেহকে উপেক্ষা করা কতকটা স্বাভাবিক হয়। আশুতোষ চলিয়াছিলেন ক্ষিপ্র অশ্বের গতিতে,—সে অশ্ব 'রেসে'র অশ্ব,—তাহার দুর্জ্জয় গতিবেগ কোন বাধা গ্রাহ্য করে নাই। এই উৎকট কর্ম্মের যখন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন তাহার পরিণাম হয় আকস্মিক। কর্ম্মই এইরূপ মনস্বীদের জীবন, এবং কর্ম্মের অবসানই ইঁহাদের

মৃত্যু ; ইঁহারা দীর্ঘকাল শয্যায় পড়িয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া নিঃশেষ হ'ন না। কেশব সেন মৃত্যু-শয্যায় শুইয়াও একটা গুরুতর ইংরাজী প্রবন্ধের 'প্রুফ' দেখিতেছিলেন ; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল ৪৫। কৃষ্ণদাস পাল এই একই বয়সে 'হিন্দু পেট্রিয়টের' প্রবন্ধ চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। ইঁহারা কাল-বৈশাখী,—ঝড়ের বেগে কোন স্থানে আসিয়া প্রাচীন আবর্জ্জনা উড়াইয়া নূতন জগতের প্রতিষ্ঠা করিয়া আবার ঝড়ের মতইচলিয়া যান। বাইরণ সম্বন্ধে এক কবি যাহা লিখিয়াছেন, ইঁহাদের সম্বন্ধেও তাহা সত্য :—

"He came and went like a shooting star, dazzling and perplexing"—তিনি আসিয়াছিলেন একটি জ্বালাময়, কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মত, জগৎ তাঁহার আগম ও নির্গম বিস্মিত নেত্রে অবাক্ হইয়া দেখিয়াছিল।

আশুতোষকে নর-শার্দ্দূলই বলুন, আর পুরুষ-সিংহ, কিংবা আর যাহাই বলুন, সেই সকল শক্তি তাঁহার মনের। তাঁহার দেহের আয়তন দর্শনীয় হইলেও সেই অসামান্য মনের যোগ্য বাহন তাহা ছিল না ; সে প্রচণ্ড শক্তি উহা চিরকাল বহন করিতে পারে নাই।

তাঁহার জীবনে বারংবার উৎকট পীড়া হইয়াছে এবং বোধ হয় প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে তাঁহার শরীর ভাল থাকিত না। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে প্রায় এক বৎসর কাল তিনি গুরুতর রোগ ভোগ করিয়াছিলেন ; ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে তাঁহার মস্তিষ্ক-রোগ ও আনুষঙ্গিক স্নায়ু-দুর্ব্বলতা হইয়া তাঁহাকে বহু কষ্ট দিয়াছিল। ইহার ছয় বৎসর পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তাঁহার মস্তিষ্কের যন্ত্রণা অতীব তীব্র হয় এবং ঐ সময়ের কিছু পরে তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হ'ন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শিরঃপীড়ায় ভুগিয়া তাঁহাকে আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া ব্যারাকপুরে যাইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

বৎসরের এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসতিনি প্রায়ই রুগ্ন থাকিতেন

তথায় থাকা কালীন তিনি যে সকল পত্র লিখেন, তাহার দুইখানির হস্ত-লিপির ব্লক 'বঙ্গবাণী' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালটায় তিনি নানা পীড়াজনিত অসোয়াস্তি ভোগ করেন। এপ্রিল, মে ও জুন—এই তিনটি মাসই তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল ছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ২৫শে মে এক আকস্মিক পীড়ায় তাঁহার পার্থিব জীবন শেষ

হইয়া গেল। রোগ যেন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত কয়েক বৎসর আড়ালে থাকিয়া তাঁহার জন্য ওৎ পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

ভিতরে ভিতরে হয়ত স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; কিন্তু তাঁহার বলিষ্ঠ গঠনে মৃত্যুর কোন পূর্ব্ব লক্ষণই দেখা যায় নাই। সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। দুই দিন পূর্ব্বেও কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, তিনি চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবেন। বহু কর্ম্মের ভিড়ের মধ্য হইতে ভগবান তাঁহাকে অকস্মাৎ আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন, এবং ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলেও, উহা সকলের নিকট একান্তই 'অকাল মৃত্যু' বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঈশ্বর তাঁহার এত বড় কর্ম্মীকে আরব্ধ কর্ম্মের মাঝখান হইতে কেন লইয়া গেলেন, সেই সমস্যার সমাধান করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে।

কলেজ-জীবন

আশুতোষের কলেজ-জীবনের ইতিহাস অত্যুজ্জ্বল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তিনি বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন; তখন তাঁহার অন্যতম ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত টনি সাহেব। পর বৎসর (১৮৮৫ খৃঃ অঃ) তিনি এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেন; তাঁহার বিষয় ছিল গণিত এবং তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন অধ্যয়নে চির-নিরত, তপস্বীর ন্যায় চরিত্রবান্ ও ভট্টাচার্য্যের মত সাংসারিকতা-বিবর্জ্জিত বুথ্ সাহেব। আমরা যখন ঢাকা কলেজে পড়িতাম, তখন ইনি ঢাকা-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময় এফ্-এ পরীক্ষার গৃহে অকস্মাৎ ঢুকিয়া তিনি দেখিলেন, একটি পরীক্ষার্থী অঙ্ক কষিতে যাইয়া ভুল করিতেছে; স্থান, কাল ভুলিয়া গিয়া বুথ্ সাহেব সেই ছাত্রটির খাতায় অঙ্কটি বিশুদ্ধ ভাবে কষিয়া দিয়া শিষ্ দিতে দিতে পরীক্ষা-গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। আশুতোষ এই ভোলানাথ কল্প অধ্যাপকের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ 'এ কোর্সে' পাঁচ দিন বি-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন, তজ্জন্য তিনি ১৫০ শত টাকার বৃত্তি পাইয়াছিলেন। গণিতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হইয়া তিনি 'হরিশ্চন্দ্র পারিতোষিক' লাভ করিলেন। পরীক্ষার্থীদের

বুথ্ সাহেব

মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি আশুবাবু অপেক্ষা ৬০ নম্বর কম পাইয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইনি গণিতে এম-এ পাশ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্র-গণিত ও পদার্থ-বিদ্যা—এই তিন বিষয়ে এম-এ পরীক্ষা দেন, তাঁহার পরীক্ষক ছিলেন বুথ্, ইলিয়ট ও গিলিলাণ্ড। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দেই একাধিক বিষয়ে এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার রীতি সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দেই তিনি গণিতে ষ্টুডেণ্ট্‌শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন এবং ঐ বৎসর আশুতোষ সংস্কৃত ও ইংরেজী—এই দুই বিষয়ে পুনরায় ষ্টুডেণ্টশিপ পরীক্ষা দেওয়ার প্রার্থী হইয়াছিলেন। ইলিয়ট সাহেব ও গুরুদাসবাবু উভয়ে তাঁহার আবেদনের বিরোধী হইলেন; ইলিয়ট বলিলেন, "এমন ভাল ছেলেকে বারংবার এই পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইলে অপরের প্রতি অবিচার করা হইবে।" গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "এই পরীক্ষা একের অধিক বার একজনের দেওয়ার নিয়ম নাই। সুতরাং তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইল।"

আশুতোষ এম-এ'র প্রথম বাঙ্গালী পরীক্ষক। আগে সংস্কৃত, আরবী, পার্‌সি প্রভৃতি বিষয় ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষাগুলির পরীক্ষক সর্ব্বদাই ইংরেজেরা হইতেন; যে বৎসর আশুতোষ দ্বিতীয় বার এম-এ পাশ করেন, তাহারপর বৎসরই অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি এম-এ পরীক্ষকের পদের জন্য প্রার্থী হ'ন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হইলেও সহজে এই বিষয়ে সফল হইতে পারেন নাই। সিণ্ডিকেটে তাঁহার বিষয় লইয়া বেশ কথা কাটাকাটি হইয়াছিল। তাঁহার পক্ষে ও বিপক্ষে মোট সাতজন দাঁড়াইলেন; স্যর আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌, জজ্ চন্দ্রমাধব ঘোষ, রেভারেণ্ড জে উইল সন, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (তখনও তিনি জজ হ'ন নাই), ডাক্তার কানাইলাল দে ও মিঃ এচ্ জে কটন। এই সাত জনের মধ্যে চার জন তাঁহার পক্ষে ছিলেন, বাকী তিন জন বিপক্ষ। হাইকোর্টের উকিল মহেশচন্দ্র চৌধুরী নিরপেক্ষ রহিলেন। সুতরাং অধিকাংশের ভোটের জোরে আশুতোষেরই জয় হইল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আশুতোষ এম-এ'র পরীক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই নিয়োগের সময় ডাঃ সরকার কৃত সহায়তা তিনি চিরদিন স্মরণ রাখিয়াছিলেন। তিনি ক্রমাগত তিন বৎসর 'ঠাকুর ল-লেক্‌চারে'র ক্লাসে পাঠ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক

বারই প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ জজ্ আমির আলি ও ব্যবহারশাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার পরীক্ষক ছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সিটি কলেজ হইতে 'ল' পাশ করিয়া ঐ সনের ৩১শে আগষ্ট আশুতোষ ওকালতির সনদ প্রাপ্ত হ'ন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'অনার্স-ইন্-ল' (Honours-in-Law) এবং পর বৎসর 'ডক্টর-ইন্-ল' (Doctor-in-Law) উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। সিটি কলেজে তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ লর্ড সিংহ (তখন মিঃ এস, পি, সিংহ)। 'Law of Perpetuity' সম্বন্ধে তিনি অধ্যাপক স্বরূপে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

কি গুণে আশুতোষ বড় ?

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আশুতোষ সমস্ত পরীক্ষায়ই অতীব প্রশংসনীয় সফলতা লাভ করিয়া যখন কলেজ-জীবন সাঙ্গ করেন, তখন তিনি বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী যুবক বলিয়া ভারতীয় ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গুণেই কি আশুতোষ বড় হইয়াছিলেন ? প্রত্যেক বৎসরই তো কোন না কোন ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম হ'ন, এখনও ছাত্রগণ একাধিক বিষয় ও একাধিক পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কৃত হইতেছেন ; এ সকল অবশ্যই ছাত্র-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। কিন্তু আশুতোষ কি শুধু পরীক্ষায় প্রথম হওয়াটাকেই বড় বা প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন ? তাহা হইলে অন্যান্য 'ভাল ছেলে'র সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য কোথায় ?

আশুবাবুকে বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল বৃত্তি, পদক ও উপাধি দিয়াছিল, সেই সকল সোনার তক্মা তাঁহাকে বড় করে নাই। সিনেট গৃহে দেখিয়াছি গুরুদাসবাবুর ন্যায় অদ্বিতীয় ব্যবহারজীবী ও বিচারপতি, পাণ্ডিত্যের অর্ণবযান ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সাহিত্য ও দর্শন-শাস্ত্রের রাজর্ষিতুল্য ষ্টিফেন সাহেব—এই সকল মহা মহা পণ্ডিত তাঁহার কাছে চন্দ্রের পার্শ্বে তারা-মণ্ডলের মত প্রভাহীন হইয়া গিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা সাহেবরা, সর্ব্বক্ষম গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীগণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতিগণ তাঁহার কাছে নিষ্প্রভ। সিনেটের বাহিরেও দেখিতে পাই লর্ড কর্জ্জনের মত প্রতিভাপূর্ণ বড়লাট তরুণবয়স্ক আশুতোষের গুণের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেছেন

এবং নূতন ইউনিভারসিটি-বিল সঙ্কলনের সময় আশুতোষের বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিতেছেন, ইউনিভারসিটি কমিশনের সভাপতি, শিক্ষা-বিষয়ে পরম অভিজ্ঞ স্যাড্‌লার সাহেব আশুতোষের দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন এবং হার্টগের ন্যায় বিশিষ্ট সভ্যাগণ তাঁহাকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতেছেন। নিশ্চয়ই ইঁহারা আশুতোষের উপাধির বহর দেখিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন নাই। উপাধি ও বৃত্তির বলে কেহ বাহবা পাইতে পারেন, কিন্তু সর্ব্ব বিভাগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কি গুণে তাঁহার নিকট মাথা হেঁট করিয়াছিলেন? আইনের অগাধ সমুদ্র-সদৃশ রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিত আশুতোষকে শৈশব অবস্থায় স্নেহ করিতেন; আশুতোষ তো ডাঃ রাসবিহারীর কাছে শিক্ষানবিসি করিয়াছিলেন। এই পুত্র-প্রতিম, ক্ষণজন্মা পুরুষ বার্দ্ধক্যে ইঁহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছেন।

তিনি তরুণ বয়সেই গণিত সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কার করিয়া মিঃ গ্রেসায়ার ও মিঃ কেলি প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; এই শাস্ত্রে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ বিলাতের বড় বড় কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইঁহার তরুণ বয়সের লেখা 'কণিক্‌সেক্‌শন্' বহুদিন 'ফার্ষ্ট আর্টস্'-পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। সুপ্রসিদ্ধ র‍্যাঙ্গ্‌লার ডাঃ আর, পি, পরাঞ্জপে তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"যদি আশুতোষ গণিতের অধ্যয়নে ও গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি জগতের গণিতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের প্রথম পংক্তিতে স্থান পাইতেন।"

কিন্তু কোন এক বিশেষ বিভাগে সফলতা লাভ করিলেই যে এক দেশের সমস্ত সুধীসমাজ তাঁহাকে তাঁহাদের নেতা বলিয়া অবিসম্বাদিত ভাবে তদীয় শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইবেন, ইহা বিবেচনা করা ভুল।

তবে তাঁহার এমন কি গুণ ছিল, যাহাতে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিলে সকলকেই মাথা নত করিতে হইত?

ভগবানই তাঁহার ললাটে শ্রেষ্ঠত্বের তিলক পরাইয়া তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন; ভগবদ্দত্ত এই তিলক,—এই জয়শ্রী বুঝিতে কাহারও তিলার্দ্ধ বিলম্ব হয় নাই। তিনি যে সকল স্বর্ণপদক, বৃত্তি, উপাধি প্রভৃতি পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেয় নাই। তিনি ছিলেন অসাধারণ গুণী,

বৃত্তি-পদকাদি ছিল তাঁহার বাহ্য বিভূতি মাত্র। যেমন ভগবান কাহাকেও সাত ফিট দীর্ঘ করেন,—তাঁহার মাথা অপর সকলের মাথা হইতে উচ্চে থাকিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব আপনা আপনি প্রতিপন্ন করে, তাঁহার পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি অঙ্গের সৌষ্ঠব সাধন করিলেও তাঁহার উচ্চ শিরই তাঁহার দৈহিক শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র প্রতিপাদক,—সেইরূপই ভগবান তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, শাসন-ক্ষমতা, স্বশক্তিতে বিশ্বাস, স্বীয় সিদ্ধি-সম্বন্ধে অটল ধারণা, জীবন-পণ অধ্যবসায়, এবং অনন্যসাধারণ কর্ম্ম-দক্ষতা ও সর্ব্ব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি প্রভৃতি মহাগুণ দিয়াছিলেন। তিনি যে বিষয়ের খুটিনাটি জানিতেন না, সে বিষয়েও তাঁহার এতটা দূরদৃষ্টি ও গঠনমূলক পরিকল্পনার শক্তি ছিল যে, যাঁহারা সেই বিষয়ের আচার্য্য এবং আজীবন সেই কর্ম্মের কর্ম্মী ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ সমস্যা ও কার্য্য পদ্ধতি তাঁহার মত সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করিতে পারিতেন না। আশুতোষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই সকল বিষয়ের সমস্ত সমস্যা সমাধান করিয়া কর্ম্ম-তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিতেন। দাঁড়ীরা বৈঠা বাহিয়া যায়, কিন্তু একজন মাঝি থাকা চাই,—সে বৈঠা বাহিতে জানুক বা না জানুক, নৌকা কোন্ দিকে চালাইতে হইবে, এবং নদীর বেগ কোন্ দিকে, তাহা দাঁড়ীদের অপেক্ষা সে বেশী বুঝে,—আশুবাবু ছিলেন সেইরূপ একজন মাঝি। অপরাপর লোকেরা কর্ম্মক্ষেত্রে সুদক্ষ দাঁড়ী—বৈঠা-পরিচালক, কিন্তু মাঝি নহে। দাঁড়ী ছাড়াও শুধু মাঝির হাতের কায়দায় কিংবা যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে নৌকা চলিতে পারে, কিন্তু মাঝি বা কর্ণধার না থাকিলে নৌকা অচল হয়। যেখানে একটা নির্দ্দিষ্ট ও চিরাচরিত কর্ম্মতালিকা আছে, সেখানে ক্ষেপণী-ধারীরা একরূপে নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে, যেহেতু একটি সীমাবদ্ধ প্রণালীর ভিতর দিয়া চলা-ফেরায় তাহারা অভ্যস্ত। কিন্তু আশুতোষের মত লোক যে যে প্রতিষ্ঠানে গিয়াছেন, সেখানে এত মৌলিক বিষয়ের আমদানি করিয়াছেন যে, তাঁহাকে ছাড়া সেই সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের গত্যন্তর ছিল না,—সেখানে তিনি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িতেন। তিনি অবশ্য নানা বিষয়ে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মৌলিকভাবে গণিত-চর্চ্চার জন্য তিনি জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং এই বিষয়টিতে তাঁহার প্রতিভা ও গবেষণা-শক্তি অদ্ভুত ছিল; তিনি মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও গয়ারাম স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয়দের নিকট রীতিমত সংস্কৃত-

স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; ইংরাজীতে মিল্টনের কাব্য, বার্কের বক্তৃতা, বহু কাব্য এবং বহু ভাল ভাল পুস্তক তাঁহার একরূপ কণ্ঠস্থ ছিল ; তিনি আইনের মহাপণ্ডিত ছিলেন ; কিন্তু এ সকল সে গুণ নহে, যাহার জন্য তিনি দেশ-প্রসিদ্ধ হইয়া কর্ম্মজগতে সর্ব্বোচ্চ আসন গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ছাঁচে সন্দেশ তৈয়ারি করিয়া কেহ কেহ শিক্ষানবিসি করে, তারপর সন্দেশের দোকান খোলে। তিনি সেইরূপ বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই সেই বিষয় ফেরি করিয়া হাটে বিক্রয় করিবার জন্য নহে, পরন্তু তাহা গৌণভাবে অবলম্বন করিয়া এরূপ একটা মহা-বিপণি খুলিবেন, যাহাতে গৌড়জন নিরবধি সুধার আস্বাদ পাইবে,—ইহাই ছিল তাঁহার মুখ্য সঙ্কল্প। এই মহাবিপণি তৎকৃত 'পোষ্টগ্রাজুয়েট-বিভাগ' এবং সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি মৌলিক গবেষণার একটা প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে লেখা হইবে। তিনি স্বয়ং কেন গণিতের গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া জগতের মনীষিগণের মধ্যে একটা অদ্বিতীয় নাম কিনিলেন না,—এজন্য 'হায়' 'হায়' করিয়া অনুতাপ করিবার কারণ নাই, যেহেতু একটা দেশের সমস্ত লোকের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিতে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং অসীম দেশানুরাগ তাঁহার স্কন্ধে যে কর্ত্তব্যের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছিল, সেই গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার লওয়ার উপযুক্ত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেশে ছিলেন না।

অতি তরুণ শিশু যেমন বয়োজ্যেষ্ঠের হাত ধরিয়া নিশ্চিন্ত মনে পথে হাঁটে, সিনেটের প্রবীণ সদস্যেরাও সেই শিশুর মতই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন আশুতোষ তাঁহাদের পরিচালক,—তাঁহার কণ্ঠে দোদুল্যমান স্বর্ণপদক এবং 'সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী' প্রভৃতি উপাধির আড়ম্বর দেখিয়া নহে, পরন্তু তাঁহারা নিশ্চিতরূপে জানিতেন যে, ভগবান তাঁহাকে শিক্ষিত সমাজের নেতা করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠান-প্রদত্ত উপাধি দ্বারা পাওয়া যায় না। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার উপর কখনও শাসন-ভার দিতেন, কখনও দিতেন না, কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বময় শাসন-কর্ত্তা যে শাসন-দণ্ড দয়াছিলেন, তাহা কাড়িয়া লইবার শক্তি কাহারও ছিল না।

আশুতোষের উপাধি ও সম্মান-প্রাপ্তি

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা—তৃতীয় স্থান,—বৃত্তি—মাসিক ২০৲ টাকা	—ডিসেম্বর,	১৮৭৯ খৃঃ।
এফ-এ পরীক্ষা—ঐ	—ডিসেম্বর,	১৮৮১ খৃঃ।
বি-এ পরীক্ষা—প্রথম স্থান,—বৃত্তি—১৫০৲ টাকা, (এ-কোর্স) গণিতে সর্ব্বোচ্চ 'নম্বর'-প্রাপ্তির জন্য 'হরিশ্চন্দ্র পারিতোষিক'।	—জানুয়ারী,	১৮৮৪ খৃঃ।
এম-এ পরীক্ষা—গণিতে প্রথম স্থান	—নভেম্বর,	১৮৮৫ খৃঃ।
" " বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্রগণিত ও পদার্থ-বিদ্যা		১৮৮৬ খৃঃ।
'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্য		১৮৮৫ খৃঃ।
'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি (গণিত)		১৮৮৬ খৃঃ।
'এডিনবরা রয়াল সোসাইটি'র ফেলো		১৮৮৬ খৃঃ।
'লণ্ডন ফিজিক্যাল সোসাটি'র সদস্য		১৮৮৭ খৃঃ।
বি-এল পরীক্ষা		১৮৮৮ খৃঃ।
প্যারিসের 'গণিত সোসাইটি'র সদস্য		১৮৮৮ খৃঃ।
'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র ফেলো		১৮৮৯ খৃ।
ঐ সিণ্ডিকেটের মেম্বর		১৮৮৯ খৃঃ।
সিসিলির অন্তর্গত পালামোর 'গণিত সোসাইটি'র সদস্য		১৮৯০ খৃঃ।
প্যারিসের 'ফিজিক্যাল সোসাইটি'র সদস্য		১৮৯০ খৃঃ।
'রয়াল আইরিস্ একাডেমি'র সদস্য		১৮৯৩ খৃঃ।
'অনার্স-ইন্-ল'		১৮৯৩ খৃঃ।
'ডক্টর-অব্-ল' (ডি-এল)		১৮৯৪ খৃঃ।

আশুতোষ ইহা ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডি-এস্-সি', সরকার-প্রদত্ত 'নাইট্' ও 'সি-এস্-আই', নবদ্বীপ ও ঢাকা সারস্বত-সমাজ হইতে 'সরস্বতী' ও 'শাস্ত্রবাচস্পতি', বৌদ্ধ-সঙ্ঘ হইতে 'সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী' প্রভৃতি সম্মান-জনক উপাধি লাভ করেন। যদিও এই উপাধিগুলি একত্র করিলে চার-পাঁচটি পংক্তি পূর্ণ হয়, এবং সেরূপ সম্মান যে কোন লোকের পক্ষে গৌরবজনক, তথাপি আমরা তাঁহার পিতৃদত্ত উপাধিই সর্ব্বোজ্জ্বল মনে করি। সেই ভাস্বর 'আশুতোষ'-নামই সর্ব্ব উপাধিকে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিয়াছিল, কোন উপাধি আশুতোষকে উজ্জ্বল করিতে পারে নাই।

স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; ইংরাজীতে মিল্টনের কাব্য, বার্কের বক্তৃতা, বহু কাব্য এবং বহু ভাল ভাল পুস্তক তাঁহার একরূপ কণ্ঠস্থ ছিল; তিনি আইনের মহাপণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু এ সকল সে গুণ নহে, যাহার জন্য তিনি দেশ-প্রসিদ্ধ হইয়া কর্ম্মজগতে সর্ব্বোচ্চ আসন গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ছাঁচে সন্দেশ তৈয়ারি করিয়া কেহ কেহ শিক্ষানবিসি করে, তারপর সন্দেশের দোকান খোলে। তিনি সেইরূপ বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই সেই বিষয় ফেরি করিয়া হাটে বিক্রয় করিবার জন্য নহে, পরন্তু তাহা গৌণভাবে অবলম্বন করিয়া এরূপ একটা মহা-বিপণি খুলিবেন, যাহাতে গৌড়জন নিরবধি সুধার আস্বাদ পাইবে,—ইহাই ছিল তাঁহার মুখ্য সঙ্কল্প। এই মহাবিপণি তৎকৃত 'পোষ্টগ্রাজুয়েট-বিভাগ' এবং সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি মৌলিক গবেষণার একটা প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে লেখা হইবে। তিনি স্বয়ং কেন গণিতের গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া জগতের মনীষিগণের মধ্যে একটা অদ্বিতীয় নাম কিনিলেন না,—এজন্য 'হায়' 'হায়' করিয়া অনুতাপ করিবার কারণ নাই, যেহেতু একটা দেশের সমস্ত লোকের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিতে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং অসীম দেশানুরাগ তাঁহার স্কন্ধে যে কর্ত্তব্যের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছিল, সেই গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার লওয়ার উপযুক্ত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেশে ছিলেন না।

অতি তরুণ শিশু যেমন বয়োজ্যেষ্ঠের হাত ধরিয়া নিশ্চিন্ত মনে পথে হাঁটে, সিনেটের প্রবীণ সদস্যেরাও সেই শিশুর মতই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন আশুতোষ তাঁহাদের পরিচালক,—তাঁহার কণ্ঠে দোদুল্যমান স্বর্ণপদক এবং 'সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী' প্রভৃতি উপাধির আড়ম্বর দেখিয়া নহে, পরন্তু তাঁহারা নিশ্চিতরূপে জানিতেন যে, ভগবান তাঁহাকে শিক্ষিত সমাজের নেতা করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠান-প্রদত্ত উপাধি দ্বারা পাওয়া যায় না। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার উপর কখনও শাসন-ভার দিতেন, কখনও দিতেন না, কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বময় শাসন-কর্ত্তা যে শাসন-দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহা কাড়িয়া লইবার শক্তি কাহারও ছিল না।

আশুতোষের উপাধি ও সম্মান-প্রাপ্তি

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা—তৃতীয় স্থান,—বৃত্তি—মাসিক ২০৲ টাকা	—ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ।
এফ-এ পরীক্ষা—ঐ	—ডিসেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ।
বি-এ পরীক্ষা—প্রথম স্থান,—বৃত্তি—১৫০৲ টাকা, (এ-কোর্স) গণিতে সর্ব্বোচ্চ 'নম্বর'-প্রাপ্তির জন্য 'হরিশ্চন্দ্র পারিতোষিক'।	—জানুয়ারী, ১৮৮৪ খৃঃ।
এম-এ পরীক্ষা—গণিতে প্রথম স্থান	—নভেম্বর, ১৮৮৫ খৃঃ।
" " বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্রগণিত ও পদার্থ-বিদ্যা	১৮৮৬ খৃঃ।
'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্য	১৮৮৫ খৃঃ।
'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি (গণিত)	১৮৮৬ খৃঃ।
'এডিনবরা রয়াল সোসাইটি'র ফেলো	১৮৮৬ খৃঃ।
'লণ্ডন ফিজিক্যাল সোসাটি'র সদস্য	১৮৮৭ খৃঃ।
বি-এল পরীক্ষা	১৮৮৮ খৃঃ।
প্যারিসের 'গণিত সোসাইটি'র সদস্য	১৮৮৮ খৃঃ।
'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র ফেলো	১৮৮৯ খৃ।
ঐ সিণ্ডিকেটের মেম্বর	১৮৮৯ খৃঃ।
সিসিলির অন্তর্গত পালামোর 'গণিত সোসাইটি'র সদস্য	১৮৯০ খৃঃ।
প্যারিসের 'ফিজিক্যাল সোসাইটি'র সদস্য	১৮৯০ খৃঃ।
'রয়াল আইরিস্ একাডেমি'র সদস্য	১৮৯৩ খৃঃ।
'অনার্স-ইন্-ল'	১৮৯৩ খৃঃ।
'ডক্টর-অব্-ল' (ডি-এল)	১৮৯৪ খৃঃ।

আশুতোষ ইহা ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডি-এস্-সি', সরকার-প্রদত্ত 'নাইট্' ও 'সি-এস্-আই', নবদ্বীপ ও ঢাকা সারস্বত-সমাজ হইতে 'সরস্বতী' ও 'শাস্ত্রবাচস্পতি', বৌদ্ধ-সঙ্ঘ হইতে 'সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী' প্রভৃতি সম্মান-জনক উপাধি লাভ করেন। যদিও এই উপাধিগুলি একত্র করিলে চার-পাঁচটি পংক্তি পূর্ণ হয়, এবং সেরূপ সম্মান যে কোন লোকের পক্ষে গৌরবজনক, তথাপি আমরা তাঁহার পিতৃদত্ত উপাধিই সর্ব্বোজ্জ্বল মনে করি। সেই ভাস্বর 'আশুতোষ'-নামই সর্ব্ব উপাধিকে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিয়াছিল, কোন উপাধি আশুতোষকে উজ্জ্বল করিতে পারে নাই।

লক্ষ্যের পথে

যাঁহারা জগতে বড় কাজ করিবেন, তাঁহারা প্রথম হইতেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তুচ্ছ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে উঠিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় ভবিষ্য ক্ষেত্রের জন্য তৈরি হ'ন। আমাদের সমাজে এখনকার সময়ের তো কথাই নাই, আশুবাবু যখন তরুণবয়স্ক ছিলেন, তখনও সরকারী চাকুরি পাওয়া শিক্ষিত যুবকদের একটা মুখ্য প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল। যখন ডিরেক্টার ক্রফ্ট সাহেব সদ্য কলেজ-নিষ্ক্রান্ত যুবককে স্বয়ং আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাকে শিক্ষা-বিভাগে একটি ২৫০৲ টাকা মাহিনা বেতনের স্থায়ী কাজ দিতে চাহিলেন, তখন আশুতোষের মত তরুণ যুবকের পক্ষে তাহা দুর্লভ সুবর্ণ-সুযোগ বলিয়াই গ্রহণ করা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আশুতোষ সাহেবদের সঙ্গে তাঁহার বেতনের প্রভেদমূলক বৈষম্য গায়ে সহিয়া লইতে পারিলেন না। বিচিত্র বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীকেই স্বর্ণ-পিঞ্জরে আনিয়া আবদ্ধ করা যায়, কিন্তু গরুড় পক্ষীকে কে পিঞ্জরে পূরিবার কল্পনা করিতে পারে? তিনি ক্রফ্ট-সাহেবের নিকট কয়েকটি সর্ত্ত চাহিলেন। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়ার অনুশীলন করিবেন,—অন্যত্র যাইবেন না, অর্থাৎ তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইবে না,—সাহেবদের গ্রেড্ এবং তদুপযোগী উচ্চ-হারে বেতন তাঁহাকে দিতে হইবে। এইরূপ আরও দুই-একটি সর্ত্তের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, এই গুলি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়া যদি সাহেব তাঁহাকে কাজ দিতে চাহেন, তবেই তিনি উহা গ্রহণ করিতে পারেন। ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের অবস্থা ভাল ছিল; কিন্তু তথাপি তাহা এত ভাল ছিল না যে, ভবিষ্যতের উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা-যুক্ত, প্রারম্ভে ২৫০৲ টাকার বেতনের সরকারী কর্ম্ম তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন। ক্রফ্ট সাহেব বিস্মিত হইলেন,—এ ছেলেটির স্পর্দ্ধা কত! শিক্ষা-বিভাগের আইন-কানুন বদলাইয়া তবে তাহাকে কাজ দিতে হইবে! আশুতোষের এই সুস্পষ্ট উত্তরে

গরুড় পক্ষীকে কে পিঞ্জরে পূরিবে?

ক্রফ্‌ট্‌ সাহেব শুধু বিস্মিত হইলেন না—বিরক্তও হইলেন। তিনি জানিতেন না—কালে এই আশুতোষ ক্রফ্‌ট্‌ সাহেব হইতেও অনেক বড় হইবেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ যে খুব উন্নত একটা লক্ষ্যের প্রতি আবদ্ধ এবং তিনি যে এক দিন সেই লক্ষ্যে যাইয়া পৌঁছিবেন, তাহার সম্ভাবনা অপরে না জানিলেও আশুতোষ তাহা জানিতেন। যিনি বড়লাটের মুখের উপর তাঁহার কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন, লাট লিটনকে স্পষ্ট ও নির্ভীক উত্তর করিয়াছেন, সেই স্বাধীনচেতা পুরুষবরকে আমরা এই অল্প বয়স হইতেই আবিষ্কার করিতে পারি। একবার লর্ড কার্জ্জন তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন; তখন ইনি বলিয়াছিলেন যে, মাতৃনিষেধে বিলাত যাইতে পারিবেন না। উত্তরে লর্ড কার্জ্জন বলিলেন—"আপনার মাতাকে বলিবেন, ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধির আদেশে আপনাকে যাইতে হইবে।" তখন তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের মুখের উপর বলিয়াছিলেন—"আমার মাতা কি উত্তর দিবেন, তাহা আমি বলিতে পারি, তিনি বলিবেন—আশুতোষের জননী একথা স্বীকার করেন না যে, তাঁহার পুত্রকে তিনি ছাড়া আর কাহারও আদেশ দেওয়ার অধিকার আছে।" এই স্বাধীনচেতা তরুণ যুবক ক্রফ্‌ট্‌ সাহেবের প্রস্তাবের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে। অশ্বত্থ-বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পর যখন তাহার দুইটি মাত্র পর্ণ উৎপন্ন হয়, তখনই বুঝা যায়, উহা অশ্বত্থ গাছ,—কচু গাছ নহে।

তাঁহার মা ছাড়া তাঁহাকে আদেশ করিবার অধিকার আর কাহারও নাই

শক্তির বিকাশ এবং অনুশীলন

স্যার কার্টেনি ইলবার্ট সাহেব তাঁহার গুণমুগ্ধ; তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি আমার নিকট কি চাও? বল, আমি কি করিতে পারি?" তখন আশুতোষ সদ্য কলেজ ছাড়িয়াছেন; ইলবার্ট সাহেব কি না করিতে পারিতেন? শাসন-বিভাগে তাঁহার অসীম প্রভাব,—তিনি ইচ্ছা করিলে আশুতোষকে আশাতীত উচ্চ কোন চাকুরি দিতে পারিতেন; কিন্তু বৈষয়িক উন্নতি আশুতোষের লক্ষ্য ছিল না। তিনি তাঁহার অপরিসীম শক্তির বিকাশের

উপযোগী একটি ক্ষেত্র খুঁজিতেছিলেন। কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তিনি বলিলেন—"আমাকে সিনেটের ফেলো করুন।" এই 'ফেলো' হওয়ার মূল্য কি, তিনি তাহা জীবনভোর দেখাইয়াছেন,—হাওয়া খাইয়া অবিশ্রান্ত [illegible] ও লড়াই করা। এই নিঃস্বার্থ পুরুষ অন্যান্য পার্থিব ভাগ্য-পথ [illegible] করিয়া কর্ম্ম-সিন্ধুর মধ্যে স্বেচ্ছায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

যদিও তিনি সেই '[illegible] বীর, বঙ্গের মিহির, অতুল্যদ্বারিক' মিত্রকে [illegible] বয়সে একবার হাইকোর্টের জজ্ হইবেন, এই মনোভাব পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা একটি শৈশবের সাময়িক খেয়ালমাত্র। বরং তিনি শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কার করিয়া উচ্চ শিক্ষার বীজ দেশময় ছড়াইয়া আমাদের দেশকে জগতের পুরোভাগে স্থান দিবেন এবং বঙ্গদেশের, তথা সমস্ত ভারতবর্ষের শিক্ষা-তরণীর কর্ণধার হইবেন,—ইহাই তাঁহার জীবনের সমস্ত লক্ষ্যের উপরের লক্ষ্য, এবং জাগ্রত অবস্থার চিন্তা ও নিদ্রার স্বপ্ন ছিল। যিনি অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া মানুষকে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন,—যিনি অন্ধ অশিক্ষিত জন-সাধারণের চক্ষুরুন্মীলনের সহায় হ'ন, তাঁহার অপেক্ষা বড় কে? শাস্ত্রকারগণ গুরুকে ভগবানের তুল্য আসন দিয়াছেন; আশুতোষ তরুণ বয়স হইতে সেই শিক্ষা-গুরুর পদের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে আশুবাবু নিজে বলিয়াছেন :—"It had always been my ambition to be allowed to do something—something great as I flattered my-self in my youthful dreams for the good and glory of my *Alma Mater*." (শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-লিখিত প্রবন্ধ)।

আমরা দেখিতে পাই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের নিলামে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি ক্যালেণ্ডার ও মিনিট বিক্রীত হইতেছিল,—সেদিকে কোন ক্রেতার ভিড় একেবারেই হয় নাই,—লোকে ঐ সকল কাগজপত্র একরূপ আবর্জ্জনা মনে করিয়া দূরে ছিল। একটি মাছিও সেই শুষ্ক, রসবর্জ্জিত কাগজগুলির উপর উড়িয়া বসিল না,—আশুতোষ হঠাৎ আসিয়া ঐ কাগজপত্রগুলিকে হারানিধি মনে করিয়া উহা অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করিলেন এবং গৃহে আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিটি ছত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

আমরা সিনেট সভায় বক্তৃতা-কালে দেখিয়াছি, তিনি লণ্ডন হইতে বোষ্টন্ এবং প্যারিস্ হইতে বার্লিন,—সমগ্র জগতের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির উৎপত্তি, পরিচালনা, বিকাশ ও বর্ত্তমান অবস্থা,—সমস্ত যেন নখাগ্রে দেখিয়া সেই অভিজ্ঞতা সর্ব্বদা তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিতেন; এইরূপ শাণিত অমোঘ বাণ অন্য কাহারও তূণীরে ছিল না। সুতরাং তাঁহার দৈব-মনস্বিতা ও যুক্তি-তর্কের বল এক দিকে এবং অপর দিকে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় তাঁহার বিশাল জ্ঞানের পরিসর দেখিয়া প্রতি-পক্ষীয়েরা হঠিয়া যাইতেন। এই সব্যসাচী, যিনি শিক্ষা-বিস্তারের জন্য শৈশব হইতে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সেই সাধনায় সিদ্ধ হইয়া সিনেটে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এক অক্ষৌহিণী বিপক্ষ কি করিবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি কি ছিলেন, তাহা একটি ছত্রে স্যার পি, সি, রায় বুঝাইয়াছেন—"তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতা-পুরুষ ছিলেন, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

সেরূপ শাণিত বাণ আর কাহারও তূণীরে ছিল না

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন-সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠন করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয় (১৯০৬ খৃষ্টাব্দ), সরকার বাহাদুর আশুতোষকে তাহার সভাপতি স্বরূপ নিযুক্ত করেন। এই নিয়মগুলি প্রধানতঃ আশুতোষের দ্বারাই উদ্ভাবিত এবং ইহাদের ফলে সামান্য একটি পরীক্ষাশালা হইতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা-বিধায়ক জ্ঞান-পীঠে পরিণত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আর্টস' এবং 'সায়েন্স্'—এই উভয় বিভাগের সভাপতি হইয়া তিনি তাহাদের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন। এই ভাবে তিনি কয়েক বৎসর 'এসিয়াটিক সোসাইটি' ও 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে'র কর্ণধারত্ব করিয়াছেন। অপরাপর বহু প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব-ভার সাময়িক ভাবে তাঁহার উপর ছিল। যে কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতা কর্পরেশনে সদস্য (১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) ছিলেন, সে কয়েকবৎসর উক্ত সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা হইয়াছিল। 'মিউনিসিপাল বিলে'র খসড়া প্রস্তুত হওয়ার সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার সমালোচনা খুব সারবান হইয়াছিল। মিউনিসিপালিটির কমিশনারগণ তখন একটা 'ফি' পাইতেন, কিন্তু আশুতোষ তাহা গ্রহণ করিতেন না।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় নব-বিধান

যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তিনি গণতান্ত্রিক ছিলেন না, সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার মুষ্টির মধ্যে রাখিয়া তিনি অপর সকলের স্বাধীনতার পরিপন্থী হইয়াছিলেন, তাঁহারা জগতের চিরন্তন নীতিটা ভুলিয়া যান। এই যুগে শরীরের বলে কিছু হয় না, বুদ্ধি-বলে বড় হইয়া যে কাজ করিবে, তাহাতে বাধা দিবে কে? বিশ্ববিদ্যালয় এবং এখনকার দিনের সকল প্রতিষ্ঠানের মূল নীতি গণতান্ত্রিক, তাহা ডিঙাইয়া কাহারও এক পা' অগ্রসর হইয়ার উপায় নাই। আশুতোষ লিখিয়াছেন—"বাধা-বিঘ্ন বিষাক্ত ফণা বিস্তার করিয়া শত-স্কন্ধ দানবের মত আমার সমস্ত হিত সংকল্প পণ্ড করিতে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু আমাকে সেই সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতে হইয়াছে।" সে যে কি বাধা, তাহা আমি বহুবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই প্রলয়ঙ্কর বিপদ-সঙ্কুল পথে আশুবাবুকে একক যুদ্ধ করিতে করিতে চলিতে হইয়াছে। শুভ ইচ্ছার শক্তি, বুদ্ধির শক্তি এবং স্বার্থত্যাগজনিত বীরত্বের শক্তি,—এই ত্রিশক্তির বলে তিনি জয়ী হইয়াছেন এবং তিনি জয়ী হইলে আর সকলে তাঁহার উদ্ভাবিত নিয়মগুলিতে সই দিতে বাধ্য হইয়াছেন; কর্ত্তৃত্ব তখন স্বাভাবিক গুণে হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'-নীতির অর্থ না বুঝিয়া যদি কেহ আশুতোষের শুভ্র যশের হানিকর কোন কথা বলেন, তখন তাহা ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আশুতোষ কখনও সভাপতির আয়ত্ত অতিরিক্ত একটি ভোট কোন প্রস্তাবের পক্ষে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া জানি না। অপরের যেরূপ একটি ভোট, তাঁহারও সেইরূপ একটি ভোট সম্বল ছিল। এই একটি ভোটও তিনি অনেক সময় ব্যবহার না করিয়া সভা বিজয় করিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার বুদ্ধির জয়ই ঘোষিত হইয়াছে। অন্য পক্ষের লোকদের অপেক্ষা তাঁহার একটি অস্ত্রও বেশী ছিল না। কেহ বলিতে পারিতেন না যে, আশুতোষ কোন নিয়মের বিরোধিতা করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ও বলিষ্ঠের হস্তে কনিষ্ঠ তাড়িত হইলে যেরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করে, এ কান্না সেই ধরণের।

সমস্ত শক্তি তাঁহার মুষ্টির মধ্যে রাখিতেন

শত-স্কন্ধ দানব

প্রত্যুত এই বিরাট্ পুরুষের কর্ম্মশক্তি অসাধারণ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যের জন্য তাঁহার দুইটি টাইপ্‌রাইটার-যন্ত্র অবিরত কাজ করিয়া খেই

পাইত না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য কত প্রতিষ্ঠানের যে সভাপতি ছিলেন, তাহার তালিকা দেওয়া কঠিন। আর্ট ও সায়েন্স্ কলেজ কমিটির সভাপতি এবং সংস্কৃত, বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা এবং ইংরাজী প্রভৃতি বোর্ডের সভাপতি স্বরূপ বহু সভায় উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক সভার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল কার্য্য তিনি নিজে করিতেন। যদি কোন কারণে কোন সভায় উপস্থিত হইতে না পারিতেন, তবে তাঁহার বাড়ীতেই সভা হইত। যে প্রতিষ্ঠানে তিনি উপস্থিত হইতেন, তাহার সকলটিতেই তিনি প্রধান ছিলেন, তাঁহারই কথায় তাহা নিয়ন্ত্রিত হইত।

শিক্ষাসংক্রান্ত নিয়মাদির জ্ঞান ছাড়া আর দুইটি বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তিনি গণিতে বহু গবেষণার ফলে দুই একটি নূতন আবিষ্কার করিয়া অল্প বয়সেই স্বদেশে বিদেশে যশস্বী হইয়াছিলেন। বুথ্ সাহেব ও জজ্ ওকেনেলি ঐ শাস্ত্রে বিশেষ কৃতী ছিলেন। তাঁহারা আজীবন তাঁহার গুণের পক্ষপাতী ও বন্ধুত্বাভিমানী ছিলেন। এই গণিতে মৌলিক অনুসন্ধানের জন্য তিনি ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং দুইখানি ফরাসী ভাষায় লিখিত দুষ্প্রাপ্য পুস্তক অসম্ভব মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অতুলবাবু লিখিয়াছেন—"যে ব্যক্তির নিকট এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম পূর্ণচন্দ্র দত্ত, ইনি হাইকোর্টের একজন অনুবাদক ছিলেন।"

গণিত ছাড়া ব্যবহার-শাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। হাইকোর্টের জজ্ (১৯০৪-২৩ খৃষ্টাব্দ) হইয়া তিনি যেরূপ পরিশ্রমের আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার সহযোগীদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। তাঁহার 'জাজ্মেণ্ট'গুলিতে ব্যবহার-শাস্ত্রে তাঁহার বিদ্যাবত্তার একশেষ প্রদর্শিত হইত, তাহা যেমনই পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনই সারগর্ভ—সর্ব্ব জগতের স্মৃতি-শাস্ত্রের মূল সূত্রগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা চিরদিনই ব্যবহার-জীবীদের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকিবে।

পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে এই সমস্ত কার্য্যের বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

দৈনন্দিন জীবন এবং অভ্যাস

আশুবাবুর জীবন অতি সরল ও সাধারণ ছিল। কলেজে পড়িবার সময়ও তিনি পোষাকের কোন আড়ম্বর করেন নাই। অবস্থাপন্ন পিতার দুলাল ছেলে, আব্দার করিলে তিনি পরিচ্ছদাদির বহু উপকরণ পাইতে পারিতেন। গাড়ী হইতে নামিবার সময় একবার তাঁহার গায়ে চাদর জড়াইয়া যায় এবং তিনি পড়িয়া যাইতে যাইতে নিজেকে সাম্‌লাইয়া ল'ন। তদবধি তিনি শুধু কোট গায়ে দিয়া কলেজে যাইতেন। তখনকার ভদ্রলোকদের পক্ষে বাহিরে যাওয়ার সময় চাদর অপরিহার্য্য ছিল। চাদর ব্যবহার না করার দরুন ক্লাসের ছাত্রদের বিদ্রূপ তিনি সহ্য করিতেন—এই বিষয়টি আমরা অতুলবাবুর পুস্তকে পাইয়াছি।

আমিষ ও নিরামিষ

শ্যামাপ্রসাদ লিখিয়াছেন যে, তিনি কখনও ধূমপান করিতেন না, এমন কি পান পর্য্যন্ত খাইতেন না এবং বহুকাল নিরামিষ খাইয়া জীবন কাটাইয়াছেন। শেষে নিতান্ত পীড়িত হইয়া ডাক্তারের উপদেশে যখন মাছ খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখনও তাহা অতি অল্প মাত্রায় খাইতেন। নিয়মিতরূপে নিরামিষ খাদ্যই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। যাঁহারা মনে করেন, প্রচুর পরিমাণে মাংস না খাইলে মস্তিষ্ক-শক্তির উন্নতি হয় না, এবং বাঙ্গালী মাছ খায় বলিয়াই মনস্বিতায় শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা আশুতোষের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলেই সেই মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। বঙ্গদেশের বহু পণ্ডিত মৎস্য, মাংস না খাইয়াও অদ্ভুত চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা ছাড়িয়া দিলেও এদেশের যে সকল দিগ্‌গজ পণ্ডিত অশেষ পরিশ্রমে সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া ভারতব্যাপী যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই নিরামিষাশী ছিলেন। বৌদ্ধযুগে বহু বিহারে শ্রমণ ও ভিক্ষুরা কোনরূপ আমিষ আহার করিতেন না, তাঁহাদের মধ্যে দীপঙ্করের মত বিশ্ব-বিশ্রুত, কীর্ত্তিমান পণ্ডিতের অভাব হয় নাই। গণ্ডার, হস্তী, অশ্ব, হনুমান প্রভৃতি জীবজন্তু তরু, গুল্ম, ঘাস খাইয়াও শরীরে অসাধারণ শক্তি ধারণ করে।

বিলাস-বর্জ্জিত সরল জীবন

শ্যামাপ্রসাদ ইহাও লিখিয়াছেন যে, আশুতোষের শয্যা অতি সাধারণ রকমের ছিল; কঠিন শয্যাই তাঁহার প্রিয় ছিল। অনেক সময় শুধু মেঝের উপর সামান্য বিছানা পাতিয়া একটি কঠিন উপাধানের উপর মস্তক রক্ষাপূর্ব্বক তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন। স্যাড্‌লার কমিশনের সময় সদস্যগণকে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। যেখানে যেখানে ইঁহারা যাইতেন, সেখানেই রাজা ও রাজতুল্য ব্যক্তিরা ইঁহাদিগের আদর-আপ্যায়ণের জন্য ব্যস্ত হইতেন। সম্ভ্রান্ত অতিথিদের জন্য 'দুগ্ধফেননিভ' শয্যা ও বহুমূল্য পালঙ্কের ব্যবস্থা হইত। কিন্তু আশুতোষ সেই সকল শয্যার বিলাস উপেক্ষা করিয়া স্বীয় সামান্য তোষকটি মেঝের উপর পাতিয়া শুইতেন, গৃহকর্ত্তারা বিস্মিত হইয়া এই যতিধর্ম্মী পুরুষের ব্যবহার লক্ষ্য করিতেন। নানা আমিষ-আয়োজনের মধ্যেও যখন আশুতোষ নিরামিষ আহারের প্রতিই বেশী রুচি ও পক্ষপাত দেখাইতেন, তখন তাঁহারা বুঝিতেন, 'বাঙ্গলার ব্যাঘ্রের' আহার মোটেই ব্যাঘ্রের মত নহে। মাছ, মাংসের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসামান্য ছিল।

আহার মোটেই ব্যাঘ্রের মত নহে

তাঁহার পুস্তকাগারে পাঁচ লক্ষ টাকার বহি সংগৃহীত ছিল; এত পুস্তকের 'ক্যাটালগ্' কোন কালেই ছিল না। ইদানীং ৭৭নং-এর বাড়ী অনেকটা বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে এত বহি রাখিবার জায়গা ছিল না; বাড়ীর বড় ঘরগুলি তো পুস্তকের আলমারীতেই বোঝাই ছিল, তাহা ছাড়া শয়ন-কক্ষ, ভোজন-কক্ষ, দোতলা, তেতলা, বারান্দা ও দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী অলি-গলি সমেত সমস্ত বাড়ীখানিই যেন একটি বিরাট্ গ্রন্থাগারের মত দেখাইত। ক্যাটালগের অভাবে বহির খুব ভাল শৃঙ্খলা ছিল না, এক শ্রেণীর পুস্তক সর্ব্বদাই এক স্থানে সজ্জিত থাকিত না,—যেখানে সেখানে নানা শ্রেণীর পুস্তকের পাতা বাতাসে উড়িতে থাকিত। আমি মাঝে মাঝে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। শ্যামা-প্রসাদ একথাও লিখিয়াছেন যে, যদিও বাহ্যতঃ ইহাদের বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইত, তথাপি আশুতোষের নিজের তত্ত্বাবধানে এই আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও একটা সুনিশ্চিত শৃঙ্খলা সাধিত হইয়াছিল। যখন যে পুস্তকের প্রয়োজন হইত, তাহা তখনই কোন্ স্থানে আছে, তাহা ঠিক করিয়া তিনি বলিয়া দিতে

অসাধারণ মেধা

পারিতেন। বাহিরের সাজ-সজ্জায় শৃঙ্খলার অভাব হইলেও তাঁহার স্মৃতি-শক্তি এরূপ জাগ্রত ও সতর্ক ছিল যে, সেই স্মৃতি-মন্দিরের সূচীপত্রে কোনওরূপ ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পাঠ্যাবস্থায় আশুতোষ স্বীয় কৃতিত্ব দ্বারা বৃত্তি ও পারিতোষিক বাবদ অনেক টাকা পাইয়াছিলেন। এই টাকার পরিমাণ নিতান্ত অল্প ছিল না, সাকুল্যে তাহা দশ-পনের হাজার টাকা হইয়াছিল। আশুতোষ এই টাকার একটি কপর্দ্দকও অন্য কোন উদ্দেশ্যে খরচ করেন নাই, এই টাকার সমস্তই পুস্তক খরিদ বাবদ ব্যয় করা হইত। এই পুস্তক ক্রয়ের নেশা তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল। দেখা যায়, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে সকল পুস্তক তাঁহার নামে আসিয়াছিল, তাহাদের দরুণ 'বিল'ই বহু সহস্র টাকার হইয়াছিল। গণিত শিখিবার প্রবল অনুরাগবশতঃ তিনি বড় বড় ফরাসী অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদের মৌলিক গবেষণাগুলি পড়িবার জন্য ফরাসী ভাষার অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং গণিতের ছেঁড়া দুইখানি পুঁথির জন্য নব-যৌবনে আশুতোষ জষ্টিস্ ওকেনেলির সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া তাহাদের মূল্য অসম্ভবরূপ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বি-এল্ পাশ করিবার অব্যবহিত পরে এই ঘটনাটি হইয়াছিল। অধ্যয়নের প্রতি এই বংশগত ঐকান্তিক অনুরাগের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ তাঁহার অতুলনীয় গ্রন্থাগার বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন—এই গ্রন্থগুলির মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকার কম নহে। শ্যামাপ্রসাদ লিখিয়াছেন—

আশুতোষের পাঠানুরাগ ও তাঁহার স্বীয় গ্রন্থাগার

"Young Ashutosh grew up in this some what grey and subdued domestic circle in which the only touch of colour was added by his great passion for books, a passion which was steadily encouraged by his watchful father."

জ্ঞান-চর্চ্চা ও পাঠের প্রতি অনুরাগই তাঁহার জীবনের একমাত্র তৃপ্তির উৎস স্বরূপ ছিল। তাঁহার পিতার অবিরত উৎসাহে এই অনুরাগ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পারিবারিক জীবনে এমন কোন আমোদ-প্রমোদ ছিল না, যাহার প্রতি আশুতোষের কোন বিশেষ আকর্ষণ ছিল। অন্যান্য বালকেরা যে সকল লঘু এবং তরল আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিয়া

আনন্দিত হয়, বাল্যকাল হইতে আশুবাবুর তাহাতে স্পৃহা ছিল না। গঙ্গা-প্রসাদ পুত্রটিকে জনসমুদ্রের বাহিরে, কুসঙ্গের সংক্রামক সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিয়া গম্ভীর প্রকৃতি ও শিক্ষা সাধনায় নিরত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বালক-বয়সে আশুতোষ সাঁতার কাটিতে ভালবাসিতেন, এবং প্রতি দিবসই নিয়মিত রূপে ভ্রমণ করিয়া শরীর সক্রিয় এবং কর্ম্মশীল রাখিতেন। তাঁহার গ্রন্থাগারে সর্ব্ব-বিষয়ে এত অধিক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল যে, অধ্যয়নের তপস্যাসিদ্ধির সমস্ত উপকরণই তাহাতে সঞ্চিত ছিল। বাস্তবিকপক্ষে আশুতোষের গৃহের বিরাট্ গ্রন্থাগার তাঁহার জ্ঞানের বিশালতা ও ঐকান্তিক পাঠানুরক্তিরই প্রতীক-স্বরূপ।

এই পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষার অগ্রদূত ভোজনে, শয়নে, ব্যবহারে এবং আচার-বিচারে ঠিক 'টুলো' ভট্টাচার্য্য ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যাকে অগ্রসর হইয়া বরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচ্য-রীতিতে। মোট কথা তাঁহার মধ্যে গিল্টিকরা কিছু ছিল না। তাঁহার সমস্তই ছিল খাঁটি। আমাদের দেশের পণ্ডিতদের কেহ কেহ এক কালে শ্রুতিধর ছিলেন; কোন দীর্ঘ কবিতা বা গান তাঁহারা একবার মাত্র শুনিয়া মনে রাখিতে পারিতেন। প্রাচ্য পণ্ডিতেরা এক কালে সমস্ত বেদ কণ্ঠস্থ করিতেন, এই জন্য বৈদিক সাহিত্যকে শ্রুতি বলে। সে দিনও বাঙ্গলার রঘুনাথ শিরোমণি সমগ্র চিন্তামণি গ্রন্থখানি কণ্ঠস্থ করিয়া মিথিলা হইতে নবদ্বীপে আসিয়া নব্য ন্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন,—উক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থ নকল করিয়া আনা নিষিদ্ধ ছিল। সেদিনও শ্রীমান্ সোমেশচন্দ্র বসু বহুসংখ্যক অঙ্কের হরণ-পূরণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে মনে মনে সাধন করিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতবর্গকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া আসিয়াছেন। আমরা বিলাতে যে সকল গুণের অভাব দেখি, অথচ এক সময় সে সকল গুণের দৃষ্টান্ত এদেশে প্রচুর পরিমাণে ছিল, সেই সকল গুণের কোন একটির দৃষ্টান্ত নিজেদের মধ্যে দেখিলে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকি। আমরা নিজের জাতির গুণাগুণ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। ভারতবর্ষের এখন সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, জাতীয় চরিত্র কি গুণে এক সময়ে পুষ্ট হইয়াছিল, তাহা আবিষ্কার করা, তাহা হইলেই হারাণো জিনিষ খুঁজিয়া পাইবার সম্ভাবনা হইবে। আশুতোষের স্মৃতি-শক্তি অতি অসাধারণ ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেকেই উদাহরণ দিতে পারিবেন।

গিল্টি নহে, খাঁটি সোনা

আশুতোষের জীবনে আগাগোড়া ভাবের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ভাবুকতা শুধু তাঁহারই নিজস্ব নহে, অনেকের জীবনেই এরূপ ভাবশীলতা দৃষ্ট হয়। তরুণ জীবনে কত আদর্শ, কত স্বপ্ন আমরা দেখিয়া থাকি! বড় বড় কথা, বড় বড় ভাব অনেকের মনেই থাকে; কিন্তু নিদারুণ অবস্থা-মার্ত্তণ্ড-তেজে তাহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় শুকাইয়া বিলীন হয়।

ভাবুকতা

"আমার উদ্দেশ্য ছিল এই করি, কিন্তু কি করিব, অবস্থার ফেরে পড়িয়া কিছুই করা হইল না, আমি বড় হতভাগা"—এইরূপ মনস্তাপ অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু দুই-একটি লোক এমন থাকেন, যাঁহারা সাধনার জন্যই সৃষ্ট; যতরূপ প্রতিকূল অবস্থাই হউক না কেন, তাঁহারা কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ন না। সেই লক্ষ্য আঁকড়াইয়া ধরিয়া জীবনে অগ্রসর হ'ন, এবং অবস্থার সমস্ত বিরুদ্ধতা জয় করিয়া জাতীয় জীবনের আর একটা ধাপ আগাইয়া দেন।

আশুতোষ যদি তাঁহার অসামান্য খাটুনী বিষয়-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেন, তবে তিনি 'রাজা' 'মহারাজা' হইতে পারিতেন। তিনি যদি কন্যা কমলা দেবীর পুনঃ বিবাহ না দিতেন, তবে তাঁহার কুলের প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকিত; কিন্তু তিনি সাংসারিক সুখ-সুবিধার জন্য কিছু করেন নাই, ভাব তাঁহাকে যে দিকে চালাইয়াছে সেই দিকে তিনি মত্ত হস্তীর মত, এপথ ওপথ না দেখিয়া চলিয়াছেন,—পথের শত বাধা উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পরিণামে এইরূপ লোকেরাই জয়ী হ'ন, জাতীয় উন্নতির আর একটি সোপানের সৃষ্টি করেন। আশুবাবু 'রাজা-মহারাজা' হ'ন নাই, কিন্তু তাঁহার আসন এখন রাজা-মহারাজার উপরে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১০ বৎসর বয়স্ক আশুতোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রথম দর্শন করেন। ইহার অল্প দিন পরে তিনি প্রতিভাবান বালক আশুতোষকে একখানি 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো' উপহার দেন।

এই বিদ্যাসাগর ছিলেন ভাবরাজ্যের আর একটি লোক। বিধবা-বিবাহের জন্য প্রচারকার্য্য করিয়া ইনি সমাজের টিট্‌কারি সহ্য করিয়াছিলেন। সামান্য কথায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ছাড়িয়া দিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি আশে-পাশের দশ জনের মত গতানুগতিক নহেন। তাঁহার ভাবের সঙ্গে সাংসারিক জীবনের সংঘর্ষ হইলে তিনি

বিদ্যাসাগর মহাশয়

নিজের তথাকথিত সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইতে পারেন। এই শক্তিমান, ভাব-সম্পন্ন লোকেরাই জাতীয় জীবনের প্রধান সম্পত্তি। কিন্তু ভাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী শক্তি-সঞ্চয়ের পূর্ব্বে যে সকল লোক অপর কর্ত্তৃক চালিত হইয়া কোন দুরধিগম্য লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান হয়, তাহারা ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইয়া থাকে। অকালপক্কতা ভাল নহে, তাহাতে অখাদ্যের সৃষ্টি হয় মাত্র। শক্তি অর্জ্জনপূর্ব্বক ভাব-জগতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে অনন্য-দৃষ্টি হইয়া লক্ষ্য অনুসরণ করিলে পরিণামে কৃতকার্য্যতা অবশ্যম্ভাবী।

এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প ও তরুণের খেয়াল এক নহে

আশুতোষ তাঁহার পিতার প্রকৃতি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ যখন ক্রুদ্ধ হইতেন, তখন সমস্ত সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রলয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিতেন। কিন্তু তাহা অতি অল্পকাল স্থায়ী হইত। ঝড় চলিয়া গেলে নদী যেরূপ প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে, গঙ্গাপ্রসাদেরও সেইরূপ সমস্ত বিক্ষোভ দূর হইত এবং মুখে প্রসন্নতার লক্ষণ প্রকাশ পাইত। আশুতোষেরও ক্রোধ অল্পকাল স্থায়ী ছিল। পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে ঝটিকা আন্দোলিত, বীচি-বিক্ষুব্ধ যে সমুদ্রের উগ্র মূর্ত্তি দেখিলে প্রাণে ত্রাস জন্মে, পর-মুহূর্ত্তে আবার তাহা যেন ঠিক ঘুমন্ত শিশুটির মত দিগ্বলয়ে মাথাটি রাখিয়া হাস্যরাশির মত শুভ্র ফেন-পুঞ্জের শোভায় চক্ষু মুগ্ধ করে। আশুবাবুর মনে বিক্ষোভ-জনিত কোন উত্তেজনা বেশীক্ষণ স্থান পাইত না,—সে মনের সরল মাধুর্য্য, যাহা কিছু গরল, তাহা ক্ষণিক ক্রোধের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া স্বীয় ঔদার্য্য-গুণে সকল অন্যায় ক্ষমা করিতে অভ্যস্ত ছিল। আজ যাহার উপর তিনি ক্রুদ্ধ, পরের দিন তিনি তাহার অন্তরঙ্গ ও উপকারী বন্ধু। 'বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি মৃদু' এই লোকোত্তরদিগের চরিত্র, তাহা কখনই ধূলি বা কালির দাগ বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারে না।

পিতৃ প্রকৃতির উত্তরাধিকারী

কর্ম্ম-তালিকা

তাঁহার কর্ম্ম-তালিকা ও নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ সিনেটের সদস্য হ'ন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ঠাকুর ল' অধ্যাপক হইয়া 'ল' অব্ পারপিচুইটি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৯০৪ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি একাদিক্রমে (১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে) বহু বৎসর 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল'এর সভাপতিত্ব করেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের কতক সময়ের জন্য হাইকোর্টের জজিয়তি হইতে বিদায় লইয়া তিনি 'স্যাড্লার কমিশনের' সদস্যের কাজ করেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ইণ্ডিয়ান-মিউজিয়ামের' কর্ম্মকর্ত্তাদিগের (Trustees) কমিটির সভাপতি স্বরূপ নিযুক্ত হ'ন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকার-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সংস্কৃতের উপাধি-পরীক্ষার পরীক্ষকদিগের কমিটির সভাপতিত্ব করেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কার্য্য করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সিণ্ডিকেটের সদস্য হইয়াছিলেন। এই পদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে জাষ্টিস ওকেনেলি এবং কর্ণেল জ্যারেট তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভাইস্ চ্যান্সেলার' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি ১৯০৬ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে লাট চেমস্ফোর্ড এবং লাট রোনাল্ডসে এই উভয়ের অনুরোধে পুনরায় সেই পদ গ্রহণ করেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গের 'লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের' সদস্য হ'ন। দুই বৎসর পরে (১৯০২ খৃষ্টাব্দ) সেই প্রতিষ্ঠানে পুনরায় প্রবেশ করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং বড়লাটের মন্ত্রীসভা

তিনি এই পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বড়লাটের মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, যেবার কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটি কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া সরকারী মন্ত্রীসভার প্রবেশ লাভ করেন, তখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর এবং স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য, তিনি এই দুই প্রবল প্রতিপক্ষকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

জীবন-মধ্যাহ্নে

হাই-কোর্টে

আশুতোষ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। এই কাজ গ্রহণে তাঁহার মাতা জগত্তারিণী দেবী বাধা দিয়াছিলেন। যেমন ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ স্বাধীনচেতা,—পুত্রের সর্ব্ববিধ উন্নতির সহায়ক এবং উদার চরিত্র,—ত্যাগ ও দৃঢ়তা প্রভৃতি বিবিধ গুণে বিভূষিত, তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই মহীয়সী মহিলাও তেমনই স্বাধীনচেতা, বুদ্ধিমতী ও দৃঢ়চরিত্রা ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ লিখিয়াছেন,—

জজিয়তি গ্রহণে মাতার নিষেধ

"আশুতোষ জজিয়তির সরকারী নিয়োগ-পত্র হস্তে তাঁহার মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সেকালে হাইকোর্টের জজিয়তি ভারতবাসীর গুণ-গরিমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া লোকদের ধারণা ছিল। কিন্তু এই বর্ষীয়সী মহিলা কিছুতেই এই কাজের গৌরব বুঝিতে পারিলেন না। যত বড় চাকুরিই তাঁহার হউক না কেন, তাহা চাকুরি তো বটেই; তাঁহার পুত্র যে সেই চাকুরি গ্রহণে স্বীকার করিবেন, এ কথায় কিছুতেই মাতা প্রীতি-সহকারে সম্মতি দিতে পারিলেন না। আশুতোষ অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে, তাঁহার পিতা বারংবার বলিয়াছেন যে, তাঁহার পুত্রের যদি চাকুরি নিতেই হয়, তবে হাইকোর্টের জজিয়তির নীচে কোন কাজ যেন তিনি না নেন। এই কাজ তাঁহার অল্প বয়সেই হইয়াছে এবং ইহাতে তাঁহার বিশ্ব-বিদ্যালয়কে সেবা করিবার প্রচুর অবকাশ থাকিবে। অনেক বলা-কহাতে মাতা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রাজী হইলেন। সুতরাং এই পদ গ্রহণ করিয়া আশুতোষ সরকারে চিঠি লিখিলেন, কিন্তু মাতার মনের অসোয়াস্তি ঘুচিল না। তাঁহার সারারাত্রি ঘুম হইল না এবং রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে, এ কাজ আশুতোষের কিছুতেই লওয়া হইবে না। আশুতোষ বলিলেন যে, তিনি পদ গ্রহণ করিয়া চিঠি পাঠাইয়াছেন এবং সে চিঠি সিমলায় রওনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মাতা বলিলেন—'এখনই উহা প্রত্যাহার করিয়া 'তার' করা যাউক, চিঠি পৌঁছিবার

পূর্ব্বেই 'তার' সিমলায় পৌছিবে।' আশুতোষ বুঝাইয়া বলিলেন যে, এরূপ একটা কাজ করিলে তাঁহার মুখ থাকিবে না, উহা তাঁহার পক্ষে বড়ই অশোভন হইবে। অগত্যা মাতা নিরস্ত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন এবং আশুতোষ জজের পদ গ্রহণ করিলেন।"

এই ঘটনায় কয়েকটি কথা মনে হয়। আশুতোষের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিও মাতার সম্মতি না লইয়া কিছু করিতে পারিতেন না। হায় রে! এই বাৎসল্য—এইরূপ মাতাপিতৃ-ভক্তি কোথায় গেল? এই গুণ চলিয়া যাওয়া আমাদের জাতির পক্ষে কি খুব লাভের হইয়াছে?

দ্বিতীয় কথা, এই যে গোলদীঘির পারে প্রকাণ্ড ভিড়,—বেকার এম্-এ, বি-এ পাশ করা মানবকদের চাকুরির জন্য হাহাকার, তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় মেঘের দিকে চাহিয়া থাকা, সমস্ত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসম্মান-ত্যাগের খৎ হাতে লইয়া এই যে বিপুল বঙ্গীয় তরুণ জন-সাধারণ সদাগরী আফিস ও সরকারী আফিসের দুয়ারে ধন্না দিয়া প্রাণান্ত আগ্রহে চাকুরির কাতর প্রার্থনা জানাইতেছে, ইহা কি জাতীয় জীবন-রক্ষার পথ? ক্ষুদ্র বেতনে চির-দাসত্ব ললাটে লিখিয়া, আধমরা হইয়া, ঋণের দায়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া, নিদারুণ অভাবে জ্বলিয়া-পুড়িয়া শেষে চিতার আগুনে জীবনাহুতি-দানপূর্ব্বক এই জীবনব্যাপী বৈশ্বানরের তীব্র জ্বালা নিভাইতে হয়, সেই মনুষ্যত্ব-বিলোপকারী চাকুরিরও এখন আর কোন আশা নাই। আশা না থাকা ভাল। কিন্তু যে দু'-একটি লোক দিল্লীর একান্ত অল্পদরের এই লাড্ডু পাইয়া নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছেন, তাঁহারা একেবারে রসাতলে ডুবিয়া যাইতেছেন।

"কিছুতেই চাকুরি লইতে পারিবে না"

আশুতোষের মাতার ন্যায় যদি বঙ্গের অপরাপর মাতারা আজ বলিতে পারিতেন,—'কিছুতেই চাকুরি লওয়া হইবে না'—তবে বঙ্গদেশের জাতীয় জীবন-রক্ষার হয়ত একটা পথ হইত,—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

দেশের আশা-ভরসা তরুণ যুবকের দল এখন চাকুরি পায় না, কিন্তু যদিই-বা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ অল্প বেতনের কাজ পায়, তাহাতে তাহাদের জীবনের বড় আদর্শ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আদর্শই জাতীয় জীবনকে জয়যুক্ত করে। মধ্যবিত্ত লোকের চৌদ্দ আনা যদি তাঁহাদের স্বাধীন মনোবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দিয়া এই সকল উঞ্ছ-বৃত্তি করে, তবে যে এই জাতি একেবারে অবনতির অতল তলে তলাইয়া যাইবে। তাহা না করিয়া বলিয়া
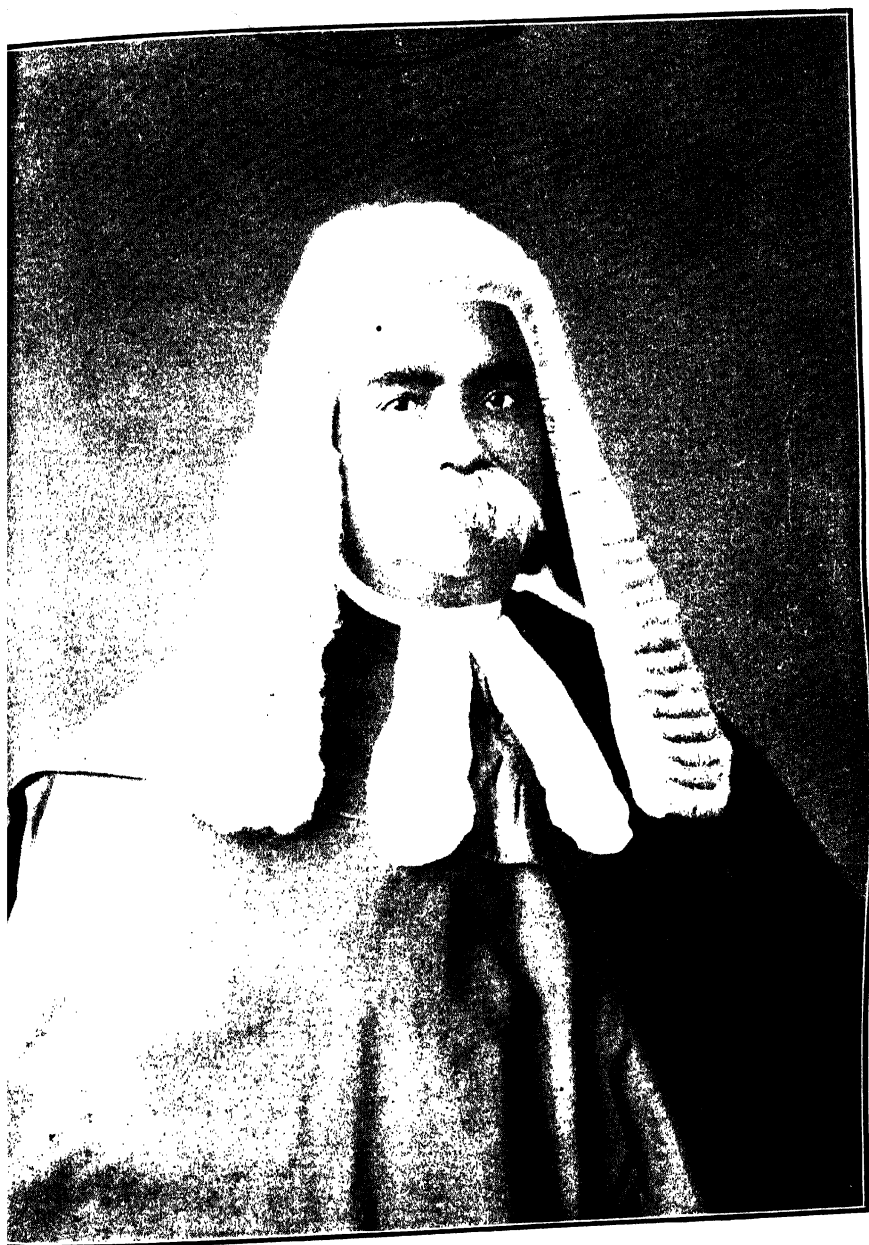
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রূপে আশুতোষ

দেওয়া হউক—চাকুরির চেষ্টা না করিয়া যেরূপে হয়, উপার্জ্জন কর। এই দেশে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক, অনেক সময় লোটা-কম্বল লইয়া আসিয়া ভাগ্যের মুখ দেখিতেছে,—আমরা নিজের দেশে থাকিয়া তাহা কেন পারিব না? তাহাতে যদি ৭ কোটি লোকের মধ্যে দুই লক্ষ অকর্ম্মণ্য লোক, যাঁহারা রৌদ্রে শুকাইয়া যান, বৃষ্টিতে গলিয়া পড়েন, তাঁহারা মৃত্যু-মুখে পতিত হ'ন, সেইরূপ ঝরতি-পড়্তি বসন্তাগমে শুষ্কপত্রের পতনের ন্যায় পরিণামের পক্ষে ভাল। মড়ক ও ভূমিকম্পেও তো কত লক্ষ লোক চোখের উপর মরিতেছে। যাঁহারা টিকিয়া থাকিবেন, তাঁহারা দেশকে বড় করিবেন, উজ্জ্বল করিবেন। একবার আশুতোষের মাতা জগত্তারিণীর মত বঙ্গের অপরাপর মাতারা বলুন—"আমার ছেলের কিছুতেই চাকুরি লওয়া হইবে না।" এখন ২০৲ টাকা বেতনের চাকুরির জন্য পীরের কাছে মাতাদের শিন্নি পড়িতেছে!

১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আশুতোষ হাইকোর্টের জজের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—জজিয়তি গ্রহণের তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্য তিনি অবকাশ পাইবেন। ইহা দ্বারা এবং অপরাপর প্রমাণে বুঝা যায়, এই সময় ওকালতিতে তাঁহার পসার-প্রতিপত্তির এতটা বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি উচ্চ শিক্ষা-কল্পে আত্ম-নিয়োগের জন্য ততটা সময় পাইতেন না। সেই কার্য্যের জন্য তিনি ব্রতী ছিলেন এবং এই জন্যই তিনি ওকালতির প্রচুর আর্থিক সম্ভাবনা ত্যাগ করিয়াও জজের পদ-গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহাকে আজীবন আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ইহারই সেবায় তিনি শুধু রিক্তহস্তে, অবৈতনিকভাবে প্রাণান্ত খাটুনি খাটিয়া এবং ঘোর শত্রুতা সহ্য করিয়া ক্ষান্ত হ'ন নাই, অধিকন্তু যে ক্ষেত্র হইতে তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের সংস্থান হইত, তাহাও অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য আশুতোষ কলিকাতার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইয়াছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ লিখিয়াছেন যে, আশুতোষের বিচার-বুদ্ধি ও ব্যবহার-শাস্ত্রের সাজ-সরঞ্জাম বিপুল ছিল,—রোমান্ সময় হইতে নিতান্ত আধুনিক সময় পর্য্যন্ত

আইনের বিকাশ এবং তাহার বিরাট্ ইতিহাস তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল। প্রত্যেক দেশের বিচার-পদ্ধতি এবং আইন-কানুন তিনি অবগত ছিলেন। কি সূত্র এবং নজিরে কোন্ বিচার-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, তাহার ব্যাপদেশে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট ও তদন্তর্গত ছোট ছোট ষ্টেটের বিচার ও আইনাদি সম্পর্কেও তিনি তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের পরিচয় দেখাইতেন। বৃটিশ ও অপরাপর ঔপনিবেশিক দ্বীপগুলির এবং প্রাচীন ভারতের আচার-নিয়ম, আইন প্রভৃতির তত্ত্ব-সম্বন্ধে তিনি সম্যক্ অবহিত ছিলেন। সুতরাং তিনি যে সকল বিচার করিতেন, সেই বিচার-সিদ্ধান্তে সমস্ত জগতের ব্যবহার-শাস্ত্রের মূল নীতিগুলির আলোক পড়িত।

যে কাজ করিবে—সে কাজ করিবে এবং যে কাজ করিবে না—সে করিবে না

কলিকাতার 'ল'-রিপোর্টে' তাঁহার দুই সহস্রের অধিক জাজ্‌মেণ্ট (রায়) পাওয়া যায়। কিন্তু অপরাপর বিচারপতিদের সহযোগে যে সব 'জাজ্‌মেণ্ট' দিতেন, তন্মধ্যে শুধু তিনিই যে যে 'জাজ্‌মেণ্ট্' লিখিতেন, তাহার সংখ্যা বোধ হয় আরও বেশী। কারণ তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন—"এ বৎসর আমরা তিন জন জজ্ একত্র হইয়া কতটি মোকর্দ্দমা বিচার করিয়াছি, জানেন?—৮০৩টি, ইহার মধ্যে আটশত মোকর্দ্দমার 'জাজ্‌মেণ্ট্' আমি লিখিয়াছি, আমার সহযোগী দুই জনে তিনটি লিখিয়াছেন।" এই বৈষম্যের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি জগতের সেই সনাতন নীতির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন. তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, যে কাজ করিবে, সে কাজ করিবে, এবং যে কাজ করিবে না, সে করিবে না।

শ্যামাপ্রসাদ লিখিয়াছেন যে, আশুতোষের প্রধান এক সহযোগী বিচারপতি একদিন বলিয়াছিলেন—"যৌবনের উদ্যমে এই অপরিমিত পরিশ্রমের উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু পরিণত বয়সে কি এমন সামর্থ্য থাকিবে,—যাহাতে আপনি এই উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে পারিবেন?" উত্তরে আশুতোষ বলিয়াছিলেন,—"যে দিন আমার উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে পারিব না, একই ভাবে পরিশ্রম করিতে না পারিয়া অর্জ্জিত প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিব,—সেই দিন যদি সত্যই আসে, তবে তাহার পর একদিনও যেন বিচার পতির আসনে না থাকি।"

'ইংলিশম্যান' লিখিয়াছিলেন—আশুতোষের কতকগুলি রায় এখন স্মৃতিশাস্ত্রের সম্পদ্-স্বরূপ, এবং পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার ডসন্ মিলার বলিয়াছেন—ইঁহার রায়গুলি উদ্ধৃত করিলেই তাহা আপনা আপনি সার্ব্বজনীন সম্ভ্রম আকর্ষণ করিবে,—"They had only to be quoted to command universal respect."

হাইকোর্টে তাঁহার বিচার-প্রণালী

এতটা পাণ্ডিত্য, এতটা প্রখর বুদ্ধি ও সদ্‌বিচারের প্রতি ঐকান্তিক ইচ্ছা এই সকল রায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাহা সমস্ত বিচার-শালার নজির-স্বরূপ অবলম্বনীয়; এতৎসত্ত্বেও তিনি হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণের সময় (১৯২৪ খৃষ্টাব্দে) বলিয়াছিলেন—"যদিও আমি এক শতাব্দীর তৃতীয়াংশেরও অধিক কাল ব্যবহার-শাস্ত্র অতিশয় পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছি,—তথাপি হাইকোর্টে কর্ম্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে আমার এই বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর যে অবিশ্বাস ছিল, তাহা এখন বহুপরিমাণে বাড়িয়াছে। এখন প্রাণের সহিত বুঝিয়াছি যে, আমি ব্যবহার-শাস্ত্রসম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ।" এইরূপ কথা আমরা আশুতোষের মুখ হইতেই আশা করিতে পারি, কারণ যিনি জ্ঞানের পথে যতটা বেশী অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই ততটা বেশী করিয়া নিজের অজ্ঞতা বুঝিতে পারেন। শত শত বৎসর গত হইল সক্রেটিস্ এই ভাবেই নিজের কথা বলিয়াছিলেন।

আমি ব্যবহার শাস্ত্র-সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আশুতোষ হাইকোর্টের জজিয়তি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার কন্যা কমলার মৃত্যু হয় এবং তিনি ডুমরাওনের রাজার একটা বড় মোকর্দ্দমার ভার প্রাপ্ত হ'ন। এই কার্য্য-উপলক্ষে তাঁহাকে পাটনা ও কলিকাতায় যাতায়াত করিতে হইত। প্রত্যেক সপ্তাহের শেষের দিকে আসিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা-সমিতির কাজ সম্পন্ন করিয়া যাইতেন। ঐ বৎসর প্রায় সমস্ত মে মাসটা তিনি মনঃকষ্টে অতিবাহিত করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী যোগমায়া দেবী অত্যন্ত কাতর ছিলেন, এবং তিনি একটু ভাল হইলে কনিষ্ঠ পুত্র বামাপ্রসাদের গুরুতর পীড়া হয়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্য-নৈমিত্তিক ভূরি-ভূরি কাজের তালিকা। এ সমস্ত কাজ ছাপাইয়া উঠিয়াছিল ডুমরাওন রাজ-সংক্রান্ত পর্ব্বত-প্রমাণ নথি-পত্র।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তিনি পাটনা হইতে দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার হাতের লেখার ব্লক করিয়া সেই চিঠিখানি 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, কার্ত্তিক সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে আশুতোষ লিখিয়াছিলেন :—

"Caseএর progress বেশী হইল না,. আর যেরূপভাবে argument হইতেছে, আমাদের সদাই সতর্ক থাকিতে হয়, এরূপ স্থলে শনিবার সিমলা যাওয়া অসম্ভব। মহারাজা সমস্ত fee দিয়া দিয়াছেন। আমি বাজপাইকে টেলিগ্রাম করিলাম যে, রবিবার পৌঁছিতে পারিব না। কাল কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি। যদি quorum হয় সিণ্ডিকেটের meeting করিব। জ্ঞানবাবুকেও টেলিগ্রাম করিব। ইতি—তোমার বাবা"

সিমলা বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত শিক্ষাসমিতির অধিবেশনে তাঁহার যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন। জ্ঞানবাবু রেজিষ্ট্রারের কথা তিনি শেষ ছত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১৫ই মে তিনি এই চিঠি লিখেন, তখন কে জানিত কালপুরুষ তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া কেশাগ্র ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৭ই মে আশুতোষ এই চিঠি অনুসারে কলিকাতা আসিয়া ১৮ই মে পর্য্যন্ত সেখানে থাকেন, ১৯শে মে সকালবেলা পাটনায় পৌঁছেন। ২৩শে মে শুক্রবার তাঁহার পীড়ার প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সম্পূর্ণরূপ সুস্থ ছিলেন। ২৫শে মে রাত্রি ৬½ টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়,—পূর্ণ বিবরণ পুস্তকের শেষের দিকে দেওয়া হইল।

১৫ই, ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে মে

২৫শে মে'র কাল-রাত্রি

আশুতোষের সংস্পর্শে

প্রথম যেদিন আশুতোষের সঙ্গে দেখা করিতে যাই, সেদিন ছিল রবিবার বেলা আট-নয়টা। তখন আশুতোষ বসিতেন দোতলার বাহিরের খণ্ডের সর্ব্বশেষ উত্তরের ঘরটায়,—এখন যেখানে উমাপ্রসাদের বৈঠকখানা।

কার্ডখানা পাইয়া তিনি বলিলেন—"আপনি ১৯নং শ্যামপুকুর লেনে থাকেন?" আমি বলিলাম—"আপনি আমার বাসার ঠিকানা জানিলেন কিরূপে?"

"কেন, আমি আপনার আবেদন-পত্রে দেখিয়াছি, বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গলার পরীক্ষকের পদের তো আপনি প্রার্থী।"

"সে আরজি তো আফিসে আছে, আর বহু লোকে আরজি করিয়াছে, আপনার কর্ম্মের অবধি নাই, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ঠিকানাটা আপনি একবার দেখিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছেন,—এ তো আশ্চর্য্যের কথা!"

আমাকে তিনি বলিলেন—"আপনার কাজ হইয়া গিয়াছে; যখন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন, তখন পরীক্ষক হইতে আর কোন বাধার কারণ রহিল না। কিন্তু আপনি যদি না আসিতেন, তবে আপনি পরীক্ষক হইতে পারিতেন না।"

"আপনার কাজ হইয়া গিয়াছে"

আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলাম,—"আমি একথা বুঝিতে পারিলাম না। আমার এখানে আসায় পরীক্ষক হওয়ার দাবী কিরূপে এতটা অগ্রসর হইল, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না।"

তাঁহার বিরাট্ গুম্ফদ্বয় ভেদ করিয়া বিদ্যুতের মত এক ঝলক্ হাসি খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"তাই তো দেখ্ছি, আপনারও বিস্তর বন্ধু জুটেছেন,—তাঁরা তো হলফ্ করে বলছেন যে, আপনার মাথা একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে, দীর্ঘকাল মাথার অসুখের দরুণ আপনি এখন মানুষ পর্য্যন্ত চিনতে পারেন না,—একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।"

তিনি বলিতে লাগিলেন—"দেখুন, যতগুলি লোক এই পদের প্রার্থী হয়েছেন, তাঁহাদের মধ্যে আপনার দাবীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আপনি বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাস লিখে প্রমাণ করেছেন যে, এই দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে আপনার মত জ্ঞান আর কা'রও নেই। আপনি দীর্ঘকাল শিক্ষকের কাজ করেছেন। সরকার বাহাদুর পুস্তক লেখার জন্য আপনাকে বিশেষ বৃত্তি দিয়েছেন। সুতরাং যোগ্যতার কথা না তুলে বন্ধুরা আপনার শারীরিক অসমর্থতার কথার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগের

উত্তর দেওয়ার মত আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন তো আমি বুঝ্‌লাম আপনি যখন এতটা পথ ট্রামে ক'রে এসেছেন, তখন আপনি শয্যাশায়ী ন'ন। আপনি লোকজন পথ-ঘাট বেশ চিন্‌তে পারেন না হ'লে এখানে এলেন কিরূপে? কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল—আপনার মস্তিষ্কের বিকৃতির কোন লক্ষণ নাই। সুতরাং এখন আর আপনার দাবী ঠেকিয়ে রাখে কে? যান,—বাড়ী যেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।"

"আপনি শয্যাশায়ী নহেন ও লোকজন বেশ চিনতে পারেন"

তাঁহার পদ-ধূলি লইতে গেলাম, তিনি পা বাড়াইয়া দিলেন। ইহার বহু পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদধূলি লইবার জন্য মাথা নত করিয়া ডান হাতখানি বাড়াইয়া দিয়াছিলাম, তখন তিনি কি ভাবিয়া পা দু'খানি হঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন; অবশেষে আমি ব্যর্থমনোরথ হইয়া, সোজা দাঁড়াইয়া যুক্তকরে প্রণাম জানাইয়াছিলাম, তখন ছিল আমার বয়স ১৭।১৮ মাত্র। আজ সে দিনকার কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

বি-এ পরীক্ষার বাঙ্গলা পরীক্ষকের প্রাপ্তিটা সেই সময় বেশ ছিল। তখন ঐ পরীক্ষায় মাত্র একটি পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন, হেড এগ্‌জামিনারের সৃষ্টি তাহার বহু পরে। আমার পূর্ব্বে পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় এই কাজ করিতেন; তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে আমিই নিযুক্ত হই। এই পরীক্ষকের কাজের আয় ছিল তখন সাত আট শত টাকা।

তারপর একদিন রোগ-শয্যায় শুইয়া আছি, শরীরের উপর একটা বড় রকমের অস্ত্রোপচার হইয়া গিয়াছে। বেলা দুইটার সময় 'ধম্মপদ' লেখক চারুচন্দ্র বসু আমার ১৯নং কাঁটাপুকুর লেনের বাড়ীতে (এখন ৭নং বিশ্বকোষ লেন) আসিয়া জানাইলেন,—*আমি সিনেটের 'ফেলো' হইয়াছি। আশুবাবু ঘুণাক্ষরে একথা পূর্ব্বে আমাকে জানিতে দেন নাই। 'বসুমতী'তে এই উপলক্ষে আমার বন্ধুবর সুরেশ সমাজপতি আশুবাবুর নানারূপ* কুৎসা করিয়া লিখিলেন, তিনি ভাইস্ চ্যান্সেলর হইয়া হাটের হাঁড়ীকে ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' করিতেছেন।

হাটের হাঁড়ীকে ফেলো করিলেন

এই একটি লোক দেখিয়াছি, যিনি নিন্দা-প্রশংসার একেবারে অতীত ছিলেন, যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি এত সূক্ষ্ম ও গভীর ছিল যে, মানুষের অভিসন্ধি তিনি

অতি সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে শত্রুরা কত মিথ্যাই না প্রচার করিত, এবং বাঙ্গলা, ইংরাজী খবরের কাগজে ছাপাইত! কিন্তু উহা কোন দিনই তাঁহাকে বিচলিত করিত না,—সে সম্বন্ধে তিনি কোন আলোচনাই করিতেন না। লেখকেরা কুৎসার অংশের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য গালাগালির স্থানগুলি লাল পেন্সিলে দাগ দিয়া পাঠাইতেন, কিন্তু আশুতোষ তাহা চক্ষু তুলিয়া দেখিতেন না—সরাসরি আবর্জ্জনা ফেলিবার ঝুরিতে ফেলিয়া দিতেন। তিনি যাহা শত্রুতামূলক বলিয়া বুঝিতেন, তৎসম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকিতেন। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি সত্য সত্যই তাঁহার কোন কার্য্যের গুণাগুণ লইয়া আলোচনা করিতে চাহিতেন, তবে তিনি উৎসাহ-সহকারে তাঁহার উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি সেই ব্যক্তিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন।

নিন্দা-প্রশংসার অতীত

অনেক সময় দেখিয়াছি, তিনি শত্রু-মিত্র বলিয়া কোন ব্যক্তির উপর ছাপ মারিয়া রাখিতেন না। যে ব্যক্তি ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেও যদি তাহার কোন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তাঁহার কাছে নতি-স্বীকার করিয়া উপকারের জন্য আসিয়াছে, তখন তিনি তাহার অকপটতায় সন্দিহান না হইয়া সরলভাবে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। তাঁহার ভাইস্ চ্যান্সেলরি পদ যাওয়ার পরে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যাঁহারা গরুড়-পক্ষী হইয়া তাঁহার কাছে এতদিন যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা ঋতু-ভেদে আকাশের বর্ণ-বিপর্য্যয়ের মত রূপ বদ্‌লাইয়া নূতন ভাইস্ চ্যান্সেলরের মনোরঞ্জন করিতেছেন। এই ব্যবহারেও তিনি ক্ষুব্ধ হ'ন নাই। *কিন্তু যখন তাঁহারা বুঝিলেন, ভাইস্ চ্যান্সেলরি পদ না থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি যাহা করেন, তাহাই হয়,—ভাইস্ চ্যান্সেলর-*গণের তাঁহার মত গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না, সর্ব্ববিষয়ে তিনি যে কর্ত্তা, সেই কর্ত্তাই আছেন,—তখন দেখা গেল, স্বার্থের দায়ে বহুরূপীর দল পুনরায় অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়া তাঁহার দ্বারে ভিড় করিতেছেন,—তখন আবার তিনি বন্ধুভাবেই তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং যোগ্যতা-অনুসারে তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন।

'যে কর্ত্তা, সেই কর্ত্তা'

বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় ছিল আকাশের ন্যায় উদার; নিজের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির গৌরবে অপর সমস্ত লোককে তিনি শিশুবৎ মনে করিতেন। মাতা-পিতা যেরূপ সন্তান-কৃত আঘাতের কথা মনে রাখেন না, তিনিও তাঁহাদের প্রদত্ত আঘাত মনে রাখিতেন না। যিনি যত বড় পদেই প্রতিষ্ঠিত থাকুন না কেন, আশুবাবু তাঁহার কর্ত্তব্য-সম্পাদনের সময় কাহাকেও গণ্য করিয়া চলিতেন না। তিনি ভগবান্‌কে একমাত্র অবলম্বন মনে করিয়া যে সকল উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি শুধু সেই আদর্শের অগ্রপন্থী ছিলেন না, তাঁহার লক্ষ্যের উচ্চতা এবং পরিণামে সফলতার উপর ছিল তাঁহার অকাট্য বিশ্বাস। হরিদ্বার হইতে গঙ্গাধারা যেদিন প্রলয়ঙ্কর বেগে সাগরোদ্দেশ্যে ছুটিয়াছিল, সেদিন ঐরাবত বাধা জন্মাইতে চেষ্টা পাইয়াছিল,—তাঁহারও দুর্নিবার কর্ম্মস্রোতের উপর সেইরূপ ঐরাবতোপম বাধা আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু একদিনও তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই,—তাঁহার কার্য্য-সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাইতে দেখি নাই। সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় আশুতোষের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তেমন কথা বলিবার বুকের পাটা আর কাহারও দেখি নাই। যেখানে তিনি মৈনাক-মন্দারের মত দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা হইতে একটু নীচে নামিয়া দাঁড়াইলেই তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অনুকূলতা পাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি হঠিবার লোক ছিলেন না। সংগ্রাম-শয্যা মৃতু-শয্যা হইলেও তাঁহার আপত্তি ছিল না, তিনি কিছুতেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে জানিতেন না।

সত্য বলিবার বুকের পাটা তেমন আর কাহারও দেখি নাই

কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার গুণপণা বিলক্ষণ জানিতেন। ধুতি, চাদর পরিয়া প্রত্যহ তিনি গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকিত, তিনি দুই-একটি বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মাঠে হাঁটিয়া বেড়াইতেন; এই অর্দ্ধনগ্নদেহ ব্রাহ্মণটির সঙ্গে সেই মাঠে দাঁড়াইয়া কখনও কখনও বঙ্গের লাট বহুক্ষণ আলাপ করিয়াছেন। সেক্রেটারীরাও সর্ব্বদা তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিয়াছেন; চটি পায়ে, কখনও একটি মাত্র জামা গায়ে তিনি তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন,—তাঁহারা সসম্ভ্রমে তাঁহার কথা শুনিয়া যাইতেন। লর্ড হার্ডিঞ্জকে তিনি কন্‌ভোকেশনের একবার সময় মুখের উপর যে কথা বলিয়াছিলেন, সেরূপ কথা আশুবাবু ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে

সাহসী হইতেন না। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কার্য্যাবলীর আলোচনা-উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,—"বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যত্ন, পরিশ্রম ও চেষ্টার কোন ক্রটি হয় নাই, কিন্তু ভারত-সরকার তাঁহার এই প্রচেষ্টার কোন সহায়তা করেন নাই।" অদূরে উপবিষ্ট লর্ড হার্ডিঞ্জ এই কথা শুনিতেছিলেন,—কি ভাবে শুনিতেছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কতকগুলি সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া লাট লিটন তাঁহাকে ভাইস্‌চ্যান্সেলরি দেওয়ার প্রস্তাব করিলে তিনি যে নির্ভীক উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গ-দেশের শিক্ষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের অন্যত্র দেওয়া হইল।

গভর্ণমেণ্ট পর পর অনেক ভাইস্ চ্যান্সেলর নিযুক্ত করিয়া দেখিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আশুবাবুর ক্ষমতার একটুও হ্রাস হয় না; তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। এমন কি তিনি যে হাইকোর্টের বিচারপতি, সেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যান্‌ডারসন্ যখন ভাইস্ চ্যান্সেলর হইলেন, তখন অনেকে মনে করিয়াছিলেন, এইবার আশুতোষ নিরস্ত হইবেন। কিন্তু সিনেটের সেই সময়ের দুই-এক অধিবেশনের পরেই তিনি আশুতোষের এরূপ দুর্দ্দান্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন যে, তিনি একান্তরূপে ভড়্‌কাইয়া গেলেন। সেই হইতে আশুবাবুই যে কর্ণধার, সেই কর্ণধারই রহিলেন। একটা প্রস্তাবের আলোচনার পর প্রস্তাবকারীর উত্তর দেওয়ার রীতি, তার পর ভোট নেওয়ার পূর্ব্বে ভাইস্ চ্যান্সেলর প্রস্তাবটির দুই দিক্ দেখাইয়া সদস্য-গণকে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রস্তাবকারী আশুবাবুর উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই ভাইস্ চ্যান্সেলর নিজ বক্তব্য বলিতে উদ্যত হ'ন। আশুতোষ অবশ্য সহজ সৌজন্যে বলিতে পারিতেন,—"আগে আমি কিছু বলিলে, পরে আপনি বলিবেন।" কিন্তু তিনি চেয়ার হইতে একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"না—না—না, আপনি বসুন, এ কি করিতেছেন? এখন আমার বলিবার সময়।" এই কথাগুলি মেঘ-গর্জ্জনের মত অতি কঠোর এবং উগ্রভাবে বলিলেন। স্যাণ্ডার্‌সন ছিলেন মৃদু চরিত্রের লোক; বঙ্গের ব্যাঘ্রের সেই রোষ-প্রদীপ্ত গর্জ্জন শুনিয়া তিনি বুঝিলেন,—বিচারশালায় তিনি প্রধান হইলেও এখানে তাঁহার কোন প্রাধান্য

"আপনি বসুন, এ কি করিতেছেন?"

থাকিবে না। জ্ঞান-মন্দিরের পুরোহিতকে দেবী-ভারতী স্বহস্তে তিলক পরাইয়া দিয়াছেন,—সেই মন্দিরে অপর কাহারও জোর টিকিবে না। আর একদিন জানি, একজন অতি প্রধান সদস্য, যিনি আশুতোষের সময়েই ভাইস্ চ্যান্সেলর হইয়াছিলেন, তিনি ফ্যাকাল্টির সভায় দাঁড়াইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে আলোচনা করিতেছিলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন,—"প্রেসের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, এরূপ-ভাবে অর্থের অপব্যয় বন্ধ করিতেই হইবে। সিনেটের মিনিট, সিণ্ডিকেটের মিনিট, প্রতি সভার নোটিশ—ইত্যাদি অসংখ্য কাগজপত্র ছাপাইবার ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গুরুভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টাই হইতেছে না।" এইরূপ নানা অভিযোগদ্বারা তিনি আশুবাবুর প্রতিপক্ষীয়দের নিকট তাঁহার বক্তৃতা মুখরোচক করিতেছিলেন। সকলে আশুবাবু উত্তরে কি বলিবেন, তাহা শুনিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন। আলোচনায় আশুবাবু ছিলেন সব্যসাচী—সিদ্ধহস্ত, কিন্তু তিনি সভাগৃহে কখনই আলোচনা-কালে তাঁহার করায়ত্ত অস্ত্রগুলি এককালে সন্ধান করিতেন না; দুই-একটি শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াই তিনি জয়-লাভ করিতেন।

ব্যাঘ্র-গর্জ্জন

সদস্য মহাশয়ের অভিযোগের উত্তরে আশুবাবু বলিলেন,—"নব-গঠিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়মাবলীতে আছে যে, এই এই বিষয়ের কাগজপত্র ছাপাইতে হইবে এবং প্রত্যেক সদস্যের নিকট তাহা পূর্ব্বেই পাঠাইয়া তাঁহাদের কোনটির সম্বন্ধে আপত্তি হয় কি-না, তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া শেষে সে গুলি প্রকাশিত করিতে হইবে। সিনেটের বিস্তারিত মিনিট রাখিতে হইবে। যে সমস্ত কাগজ বক্তা ছাপাইতে অনিচ্ছুক, তাহা সরকারী নিয়ম-অনুসারে আমরা ছাপাইতে বাধ্য। এই সকল বিধি-বদ্ধ নিয়মের ত্রুটি হইলে আমাদের সভা-সমিতির সমস্তই অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। যাঁহারা সিনেটের সদস্য-গিরি করিয়া প্রবীণ হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অনভিজ্ঞতা অতীব বিস্ময়কর। তাঁহারা অনায়াসে বড়লাটের কাউন্সিলে প্রস্তাব করিয়া পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলি রদ করিতে পারেন। যে পর্য্যন্ত তাহা না করিবেন, সে পর্য্যন্ত এ সকল তথাকথিত অপব্যয়ের হাত হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করিবার উপায়ান্তর নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়,

ছাপা না হইলে সভা অসিদ্ধ হইবে

যাঁহারা আমাদের কার্য্যাবলীর ত্রুটি ধরিতে এতটা উৎসাহী, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়মগুলি-সম্বন্ধেও এতাদৃশ অনভিজ্ঞ। এই সকল অসার যুক্তিতর্ক দ্বারা আমাদের সময় নষ্ট করিবার তাঁহাদের কি অধিকার আছে? কলরব না করিয়া এইরূপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির এই গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া উচিত (He should walk out of the house)।” শেষ কথা কয়েকটি

গলাধাক্কা

এমন বজ্র-নিনাদে উচ্চারিত হইয়াছিল যে, তাহা যেন ঠিক একটি গলা-ধাক্কার কাজ করিল। আশুবাবু স্বয়ং দেশের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি,—আইনের দিক্ দিয়া তাঁহার উক্তিগুলি একেবারে নির্দ্দোষ। কিন্তু তাঁহার সেই বজ্র-গর্ভ স্বরের তাড়না যাঁহারা খাইয়াছেন, তাঁহাদের শেষে আর বদন-ব্যাদানের ক্ষমতা থাকিত না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনার সময় যে তুমুল ঝটিকা উত্থিত হইয়াছিল, তাহা মনে পড়িলে কল্পনা হয়—মেঘ, বৃষ্টি, ঝটিকা ও বন্যার মধ্যে যেন স্বর্গাধিপ ইন্দ্র এক প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। প্রতিটি নিয়মের সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল, সে কি ঘোর আন্দোলন! তুমুল তর্ক-কোলাহলের করকা-পাতে কর্ণ যেন বধির হইবার উপক্রম হইত! প্রায় প্রত্যেকটিতেই স্যার্ গুরুদাস এবং বহু প্রধান প্রধান সদস্য আশুবাবুর প্রতিপক্ষ, সাহেব-সদস্যেরাও সেই দলের। কিন্তু সেই উত্তেজিত বক্তৃতাগুলির বিরুদ্ধে আশুতোষ অর্জ্জুনের মত একাই এক অক্ষৌহিণী পরাজয় করিয়াছেন। অনেক সময় সুদীর্ঘ ৪।৫ ঘণ্টাব্যাপী বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরে তিনি মাত্র ১৫ মিনিটকাল বক্তৃতা করিয়া প্রতিপক্ষীয়দের যুক্তি-তর্কের ভিত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। বিরুদ্ধ ব্যক্তিদের যুক্তি-তর্কের অসারতা দেখাইবার পক্ষে তাঁহার সেই স্বল্প কথার উত্তর অমোঘ মুষলের কাজ করিয়াছে। তাঁহারই উত্তর শেষ কথা, তৎপর উত্তর দিবার কিছুই থাকিত না। সুতরাং ভোটসংগ্রহের সময় তাঁহার জয় অবিসংবাদিত হইত। একদিন মনে আছে, একটি নিয়ম-সম্বন্ধে এত বিরুদ্ধতা হইল, এবং দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতার স্রোত এরূপ ভাবে চলিতে লাগিল যে, আশুবাবুর মুষ্টিমেয় দল প্রমাদ গণনা করিলেন। সকলেই সারগর্ভ যুক্তি দ্বারা আশুবাবুর প্রতিকূলতা করিতেছেন; সেই সকল অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে বলিবার কি থাকিতে পারে, আমরা ভাবিয়া পাইতে-

ছিলাম না। চিরজয়ী আজ পরাজিত হইবেন, মহাসমুদ্রের চির-সুদক্ষ কাণ্ডারী আজিকার ঝটিকায় তাঁহার তরী রক্ষা করিতে পারিবেন না,—আশঙ্কা হইল,—আজ আশুতোষের পরাজয় সুনিশ্চিত। বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা চলিয়াছিল। শেষে আশুতোষ উঠিলেন, তাঁহার হাতে একখানি বিখ্যাত বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার; তিনি তাহার এক পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়িলেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার ব্যাপদেশে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণের মধ্যে আন্দোলন হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যেরা যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সেই সদস্যরাও সেই যুক্তিগুলি অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে তাহা একেবারে নিষ্ফল হইবে।

আশুতোষ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিপক্ষীয়দের যুক্তির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিলেন, আমরা দেখিলাম বর্ত্তমান সভায়ও সেইরূপ যুক্তিই অবলম্বিত হইয়াছে। আশুতোষ ঐ ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টাইয়া বহু বৎসর পরের একটা বিবরণীর অংশ পাঠ করিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল,—"এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময় যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই নিয়ম কার্য্যকরী হইবে না—নিষ্ফল হইবে, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে। এখন তাঁহাদের বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে যে, এই নিয়মগুলি খুব হিতকর এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। আসুন, আমরা অন্য বিষয়ের আলোচনা করি।"

"এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন, অন্য বিষয় আলোচনা করা যা'ক"

এত যুক্তিতর্ক ও প্রতিবাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাসিয়া গেল। জীবন্ত অভিজ্ঞতার ফল-সম্বলিত রিপোর্টটি দেখিয়া আর কোন সদস্য প্রতিকূলতা করিতে সাহসী হইলেন না।

সিনেটে সময় সময় বিরুদ্ধ দল সংখ্যায় অতীব গরিষ্ঠ হইত। কিন্তু সিনেট-সভার সঙ্গে অপরাপর সভার এই প্রভেদ দেখিয়াছি যে, বিজ্ঞ সদস্যগণ যুক্তি-তর্কে কোন বিষয়ে ভুল বুঝিলে শুধু জেদের খাতিরে হাত উঠাইয়া উপহাসাস্পদ হইতে রাজী ছিলেন না। যাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিবেন না, এইরূপ একান্ত বিরুদ্ধ প্রতিপক্ষের দুই-একটি লোক কোন পক্ষের অনুকূলেই হাত উঠাইতেন না,

নিশ্চেষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তির মত বসিয়া থাকিতেন। বহু পরিমাণে সংখ্যা-গরিষ্ঠ প্রতিপক্ষ দলকে গায়ের জোরে নহে, পদের জোরে নহে, শুধুই বুদ্ধির জোরে, অনিচ্ছার ব্যূহ ভেদ করিয়া স্বীয় মতাবলম্বী করা কত বড় কঠিন কাজ, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে,—ইহা একরূপ অসাধ্য সাধন। এজন্য তাঁহাকে আমরা শ্রেষ্ঠ ও মনস্বী মানবদের মধ্যে মহামানবরূপেই দেখিয়াছি।

আশুতোষ সভ্য-জগতের আধুনিক সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি-সম্বন্ধে এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবহিত ছিলেন যে, এ বিষয়ে আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার এই বহুদর্শন ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে তিনি যাহা বলিতেন, তাহার পশ্চাতে থাকিত দৃঢ় ব্যূহ-গঠিত ভূরি-প্রমাণ যুক্তিরাশি। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে তাঁহার যোগিজনোচিত একাগ্র সাধনা নিয়োগ করিয়াছিলেন; তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার বজ্রগম্ভীর কঠোর স্বর, যুক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বীয় প্রাধান্য-জ্ঞান-সম্ভূত নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস এবং ছলনাকারীদের প্রতি রোষাগ্নির জ্বালা,—এই মিশ্র-ভাবের অভিব্যক্তি হইত, এরূপ স্বল্পাক্ষরা অথচ তেজোময়ী উক্তিতে যে প্রতিপক্ষের মনের যুক্তি অনেক সময় অধর পর্য্যন্ত আসিতে যাইয়া ঠেকিয়া পড়িত—'বলি, বলি, বলি,—বলা হ'ল না'।

যেদিন কলিকাতায় কলেজগুলির এম-এ ক্লাসগুলি ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব লইয়া আশুতোষ ফ্যাকাল্‌টির সভায় দাঁড়াইলেন, সেদিন তাঁহাতে সম্মিলিত কলেজ-সমূহের দৃঢ়-সঙ্কল্পিত প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কলেজের অধ্যক্ষেরা বলিলেন,—কেহ যদি মাথার মুকুট কাড়িয়া লয়, তবে যে দশা হয়, আজ এম্-এ ক্লাস-বর্জ্জিত কলেজগুলি সেইরূপ সঙ্কটের অবস্থায় দাঁড়াইবে। সুদীর্ঘকাল যে উচ্চ স্থান ও মর্য্যাদা কলেজ-গুলি ভোগ করিয়া আসিতেছে, আজ তাহা হইতে তাহারা কেন বঞ্চিত হইবে? উত্তরে আশুতোষের প্রধান যুক্তি এই ছিল যে, এখন কলিকাতার কৃতী অধ্যাপকেরা নানা কলেজে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করিতেছেন। মনীষী অধ্যাপকগণ হাটে-পথে পড়িয়া নাই। হয়ত কোন বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের একজন আছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে, একজন আছেন স্কটিশ চার্চ্চ বা অপর কোন

কলিকাতার কলেজ-গুলির এম-এ ক্লাস তুলিয়া দেওয়া

কলেজে। সমস্ত ছাত্রমণ্ডলী যাঁহাদের অধ্যাপনা দ্বারা উপকৃত হইতে প্রত্যাশা করে, তাঁহারা কলেজ-বিশেষের একচেটিয়া হইয়া থাকিবেন কেন? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম্-এ ক্লাসগুলি যদি এরূপভাবে গঠিত হয় যে, এই দেশের যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অধ্যাপক, তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অধ্যাপনার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করা যায়, তবে সমস্ত ছাত্রই তাঁহাদের অধ্যাপনার ফল এবং উপকার পাইতে পারিবে। শিক্ষার অলিগলির মধ্যে এই সকল অধ্যাপক এক ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে সার্ব্বজনীন জাতীয় উচ্চশিক্ষার হানি-জনক হইবে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'-এক ঘণ্টা পড়াইয়াও অধ্যাপকেরা তাঁহাদের নিজ নিজ কলেজে যেমন কাজ করিতেছিলেন, তেমনই করিবেন। এম-এ ক্লাস উঠিয়া গেলে তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইবার প্রচুর অবকাশ থাকিবে।

এই যুক্তি এবং অপরাপর যুক্তি সত্ত্বেও কলেজের অধ্যক্ষগণ তাঁহাদের সুচিরাগত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা-চ্যুত হইতে সহজে স্বীকৃত হ'ন নাই। যখন সর্ব্বশেষ সিনেট-সভায় আশুতোষ এই প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইলেন, তখন আশুতোষের শক্তি যে অমোঘ তাহা কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। আশুতোষের মুখেই শুনিয়াছি, স্বয়ং লাটসাহেব আশুতোষের এই আশ্চর্য্য সফলতায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও সরকারী নীতি

সিনেটের একশত জন সদস্যের মধ্যে আশীজনই গভর্ণমেণ্ট্-কর্ত্তৃক নিযুক্ত। ইহা ছাড়া ex-officio সদস্যগণের অনেকেই একরূপ গভর্ণমেণ্টের তরফেরই লোক। এইরূপ অনুকূলভাবে-গঠিত সিনেটের শিক্ষা-বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর তাঁহারা আবার কথা বলিবার অধিকার রাখিতে চান কেন,—ইহাই ছিল আশুতোষের প্রশ্ন। সিনেটের অধিকাংশ সদস্যই ত' তাঁহাদের লোক এবং শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন। অপর পক্ষে রাজ-পুরুষেরা তো শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। এইরূপ ক্ষেত্রে **শিক্ষা-সম্বন্ধে** সিনেটের স্বাধীনতায় তাঁহাদের হস্তক্ষেপ আশুতোষ অন্যায় মনে করিতেন। অপর দিকে সরকার-পক্ষের অভিপ্রায় এইরূপ বুঝা যাইত,

যে তাঁহারা যখন সমস্ত রাজ্যটা শাসন করিতেছেন, তখন শিক্ষাবিভাগের উপর কর্ত্তৃত্বই বা তাঁহারা ছাড়িয়া দিবেন কেন? যদি সিনেটের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সরকারের মতদ্বৈধ হয়,—শিক্ষা বিষয়েই হউক, অন্য যে কোন বিষয়েই হউক,—তখন সিনেটকে সরকারের আদেশ মানিয়া লইতে হইবে।

দেশহিতের জন্য আশুবাবু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন; পাঠ্য-নির্দ্ধারণ, অধ্যাপক-মনোনয়ন, শিক্ষার বিষয়-স্থিরীকরণ প্রভৃতি খুটিনাটি বিষয়ে রাজপুরুষেরা কেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন? বিশেষতঃ যেখানে অধিকাংশ সদস্যই সরকারের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, সে স্থলে শিক্ষা-বিষয়ে গৃহীত সিনেটের সিদ্ধান্তকে রাজপুরুষেরা কেন ডিঙ্গাইয়া যাইবেন? অর্থাদি-সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবস্থা মানিতে পারা যায়, যেহেতু, আমরা হয়ত অনেক আশা করিতে পারি, কিন্তু সরকার যাহা দেওয়া সম্ভবপর মনে করিবেন, তদতিরিক্ত দাবী চলে না। কিন্তু তাঁহারা যোগ্য ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত ডিঙ্গাইয়া তাঁহাদের অধিকার-বহির্ভূত সমস্ত বিষয়ে শেষ মঞ্জুরী দিবার ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিতে চাহিবেন কেন?

কর্ত্তৃপক্ষ বিলক্ষণরূপে জানিতেন আশুবাবু কত বড় লোক। তাঁহারা কি জানেন না মহাত্মা গান্ধী কত বড় লোক? কিন্তু তথাপি তাঁহাকে জেলে যাইতে হইয়াছিল। যে বৃহৎ সাম্রাজ্যের আমরা অংশীদার বলিয়া গৌরবান্বিত, শুধু শিক্ষা-বিভাগে তাঁহাদের প্রচেষ্টা আবদ্ধ নহে। এই বৃহৎ সাম্রাজ্যরক্ষা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। সুতরাং যখন আশুবাবু শুধু শিক্ষা-নীতি ও তাহার আদর্শ-গঠনে ব্যস্ত, তখন কর্ত্তৃপক্ষ রাষ্ট্রনীতির কথা ভুলিতে পারেন নাই। আশুবাবুর সহিত কর্ত্তৃপক্ষের সংঘর্ষ এইখানে।

শিক্ষানীতি ও রাষ্ট্রনীতি

আশুবাবু গবর্ণমেণ্টের চিরবিশ্বস্ত কর্ম্মী ছিলেন। তিনি রাজদ্রোহকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। অসহযোগ-আন্দোলন যখন বন্যার মত এদেশের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল, তখন আশুবাবু সেই বন্যা প্রতিরোধ করিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারই বাধায় ছাত্রগণের সকলে স্কুল, কলেজ ছাড়িয়া দেয় নাই। নতুবা চিত্তরঞ্জনের মত মনীষী ও ত্যাগী কর্ম্মবীরের চেষ্টায়

স্কুল-কলেজগুলি একেবারে ভাসিয়া যাইত। আশুবাবু এই দেশব্যাপী প্লাবনের গতিরোধ করিয়াছিলেন, সরকার বাহাদুর ইহা ভালরূপেই জানিতেন।

যদি ‘ফেল’ ছেলেদের সংখ্যা বাড়িয়া যায়, তবে সেই ভগ্নমনোরথ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে গুপ্তহত্যাকারী ষড়যন্ত্রীদের দল প্রসারতা লাভ করিবে,—নিরাশ ছেলেদের মধ্যে দস্যুতা, রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব ও নানারূপ ভ্রান্ত, বিপজ্জনক মতবাদ পুষ্টিলাভ করিবে। যে কৈশোর ও তরুণ-যৌবন উচ্চ আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে ভয় করে না, উদ্‌ভ্রান্ত হইলে সেই তরুণেরা কত কি অনিষ্টকর পথে প্রধাবিত হইতে পারে! এই বয়ঃসন্ধিকাল বড় বিষম; ইহা সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে জাতীয় জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে। এই সময়টা যদি তাহারা অধ্যয়নে নিরত থাকে, তবে বিপথে যাইবার অবকাশ পাইবে না। এই শুভ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া আশুতোষ শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছিলেন। তিনি কর্ত্তৃপক্ষের শত্রু ছিলেন না, অনেক তথাকথিত সুহৃদ হইতে তিনি সরকার বাহাদুরের বেশী বন্ধু ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ ইহা সম্যক্ জানিতেন। তথাপি তাঁহাকে কেন সাময়িকভাবে তাঁহাদের বিরোধিতা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার কারণ পূর্ব্বেই আভাসে বলিয়াছি।

রাজ্যশাসন-তন্ত্র পরিচালন-কালে সরকার বাহাদুরের নানা দিক্ দেখিতে হয়। ছেলেরা যাহাতে বিদেশী শাসন সহজে মানিয়া লয়, সেইরূপ শিক্ষাই শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের স্থির করা স্বাভাবিক। ইহারাই তো ভবিষ্যতের বাঙ্গালী জাতি, ইহারা যদি স্ব স্ব প্রধান হয়, কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধী হয়, তবে তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না।

আশুবাবু সরকারের হিতকামী হইলেও তিনি ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে পরোক্ষ-ভাবে যে স্বাধীন চিন্তা-বিকাশের সুযোগ দিতেন, এবং যাহা তাঁহার স্বকীয় কার্য্যাবলীতে সর্ব্বদা স্পষ্ট হইয়া উঠিত,—সেই জিনিসটা কর্ত্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করিতে পারিত না। তাঁহারা যদি বুঝিতেন, তাঁহাদের হিতকামী আশুবাবু সর্ব্বদা তাঁহাদের অনুগামী হইয়া কাজ করিবেন, তবে তাঁহারা শিক্ষার ভার তাঁহার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন।

লাট্ লিটনের যে চিঠি লইয়া এতটা বাদানুবাদ হইয়াছে, তাহাতে এই উদ্দেশ্য ছিল, আশুবাবুকে রাজকীয় শ্বেতছত্রের নীচে ভিড়াইয়া আনা যায়

কি-না ? কর্ত্তৃপক্ষ জানিতেন, শিক্ষা-বিষয়ে আশুবাবুর মত যোগ্য ব্যক্তি দেশে আর একটি নাই,—এ দেশে কেন, জগতেও সেরূপ লোক দুর্লভ। লাট কারমাইকেল দ্বারভাঙ্গা-গৃহে আশুবাবুর প্রস্তর-বিগ্রহ উন্মোচন-কালে বলিয়াছিলেন,—জগতে আদর্শবাদী লোক অনেক দেখা যায়,—বহুকর্ম্মী লোকেরও জগতে অভাব নাই। কিন্তু উচ্চ আদর্শের পরিকল্পনা করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার মত কর্ম্ম-কুশলতা কোন এক ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া বড় দুর্লভ। আশুবাবু জগতের মধ্যে সেইরূপ এক দুর্লভ ব্যক্তি (যখন এই প্রস্তর-মূর্ত্তি উন্মোচিত হয়, তখন অবশ্য আশুবাবু জীবিত ছিলেন)। লর্ড রোলাণ্ড্সে (Marquis of Zetland) প্রভৃতি খ্যাতনামা রাজপুরুষেরা আশুবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। যেদিন মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট-হাউসে সিনেটের সদস্যদিগের অভিনন্দন গ্রহণ করেন, সে দিন চ্যান্সেলর বড়লাট সাহেব উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সম্রাট্ আশুবাবুর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-সক্রান্ত সমস্ত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন এবং আশুবাবুই সম্রাট-সমক্ষে এই ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

স্বয়ং সম্রাট্ তাঁহাকে খাতির করিতেন

সকলেই জানেন স্যাড্‌লার সাহেব যে কমিশনের নেতা ছিলেন এবং যাহা তাঁহারই নামাঙ্কিত ছিল, তাহা আশুবাবুর দ্বারাই প্রকৃত পক্ষে নিয়ন্ত্রিত হইত। স্যাড্‌লার গুণগ্রাহী ছিলেন,—তিনি আশুবাবুর প্রকৃত বন্ধুত্বাভিমানী ও তৎপ্রতি চির-শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

গভর্ণমেণ্ট্ চেষ্টা করিয়াও আশুবাবুকে তাঁহাদের অনুগত নিজস্ব ব্যক্তি করিয়া গড়িতে পারিলেন না, কারণ, তাঁহার মধ্যে গড়িবার কিছু ছিল না, তিনি গড়ন লইয়াই জন্মিয়াছিলেন। ইংরাজের রাজ্যে বাস করিয়াও তিনি কাহারও নিকট মাথা হেট করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ছিলেন মহামানব,—বাঙ্গালী, ইংরাজ, বৌদ্ধ, মুসলমান—সকলের একজন। তিনি একমাত্র সম্রাটকে মানিতেন—যিনি বিশ্ব-নিয়ন্তা। এই মহামানবকে লইয়া কর্ত্তৃপক্ষ বাস্তবিকই একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্য-নীতির মধ্যে যিনি ধরা দিবেন না, তাঁহাকে শাসন বা শিক্ষা-সংসদের অঙ্গীয় করিয়া লওয়া সরকারের পক্ষে এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ এই দুর্নিবার, স্বাধীনচেতা লোকটির স্বাধীন মনোবৃত্তি যদি আজ-কালকার সবুজদের মধ্যে সংক্রামিত হয়,

তাহারা যদি শাসনের নিকট মাথা অবনত না করে, তবে কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সহ্য করিতে পারিবেন কি-না,—এই হইল সমস্যা। অবশ্য তরুণেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের শাসনাধীনে থাকিয়া সুপথে পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু এই যে নিজের মতকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখার প্রবৃত্তি, তাহা আশুবাবুতে শোভা পাইলেও অপরের পক্ষে শোভন বা নিরাপদ হইবে না। অথচ ব্যক্তিত্ব হিসাবে আশুবাবু যত বড়ই হউন না কেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের নীতির বাহিরে তিনি স্বাবলম্বন করিয়া একটা ভিন্ন তন্ত্রের সৃষ্টি করিবেন, সরকার পক্ষ ইহাও সহ্য করিতে পারেন নাই। ইঁহারা চাহিতেন—শিক্ষা-বিষয়েই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক—সর্ব্বাগ্রে শাসন মানিয়া চলিতে হইবে। এই ব্রতের এই কথা। হয়ত সমালোচনাকালে আশুবাবু লাট-বেলাটের পদোচিত সম্ভ্রম রাখিয়া কথা বলেন নাই, তিনি কখনই মৃদু হইতে পারেন নাই, তাঁহার নীতি ছিল 'মৃদুহি পরিভূয়তে',—এই সকল কারণে আশুবাবুর অসাধারণ ক্ষমতা ও মনস্বিতা কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিয়াও কোটী কোটী লোকের শিক্ষার ভার তাঁহার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। রাজপুরুষেরা তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে সর্ব্বদা সম্ভ্রম দেখাইয়াছেন,—তাঁহারা গুণের আদর করিতেন। কিন্তু যে শাসন-যন্ত্রের তাঁহারা অঙ্গ, সেই শাসন-যন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনার পক্ষে সাম্রাজ্য-নীতির সম্পূর্ণ অনুগ লোক ছাড়া অপর কাহাকেও গ্রহণ করিতে তাঁহারা স্বতঃই কুণ্ঠা বোধ করিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গভর্ণমেন্টের যে প্রবল সংঘর্ষ হয়, এবং যাহার ফলে আমরা এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহার মোটামুটি একটা বর্ণনা এখানে দিতে চেষ্টা করিব। লাটসাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্যক্ স্বাধীনতা স্বীকার করেন নাই। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কন্‌ভোকেশনে তিনি চ্যান্সেলার স্বরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় নিরপেক্ষ স্বাধীনতার দাবী করিতে পারে না, যেহেতু সুরু হইতেই সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তিনি স্যাড্‌লার-কমিশনের রিপোর্ট হইতে এই কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষের প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমস্তই সরকার-কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল

কন্‌ভোকেশন সভায় বাদানুবাদ

প্রতিষ্ঠানের একটা উদ্দেশ্য ছিল, যেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি **সরকারের প্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতানুসারে** স্কুল ও কলেজগুলিকে কতকগুলি নিয়মানুসারে পরিচালনা করিতে পারে। সুতরাং প্রথম হইতেই এই সকল প্রতিষ্ঠান স্বাধীন বিদ্যায়তন-স্বরূপ উদ্ভূত হয় নাই। সিনেটের সদস্যগণের অধিকাংশই সরকারের মনোনীত লোক এবং তাঁহারা সরকারী আইন-কানুনের অধীন হইয়া প্রদত্ত ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে কার্য্য করিতে নিয়োজিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের কার্য্য-রীতির উপর সর্ব্বদা সরকারের তত্ত্বাবধান থাকিবে,—ইহাই তাঁহাদের নিয়োগের সর্ত্ত।” চ্যান্সেলার উক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন,—“সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই সম্বন্ধ গভর্ণমেণ্ট নূতন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই,—ইহা চিরদিনই আছে। আমাদের এখন দেখিতে হইবে যে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতর ভাবে মেলামিশা করিয়া এই চিরন্তন সম্বন্ধটি যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রকৃত হিতকর করিয়া তুলিতে পারি।”

কিন্তু আশুতোষ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা খুব সুচক্ষে দেখেন নাই। তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন, কোন প্রবল শক্তি যদি একটা প্রতিষ্ঠানে যাইয়া ঘনিষ্ঠতা করিতে চাহেন, তবে প্রতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাটা তাঁহাদের অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যাইবে। তিনি শিক্ষা-সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি দিবারাত্র প্রাণপাত করিয়া খাটিতেছিলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্ষুদ্র স্বার্থ তাঁহার নিকট স্বীয় দেহের রক্ত-বিন্দুর মূল্য বহন করিত, এখানে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশ-ধরেরা জ্ঞানের নানা পথে ধাবিত হইয়া ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিবে,—তাহারা শুধু বিদ্যার ক্ষেত্রে জগজ্জয়ী হইবে, এমন নহে,—কোন হুজুগে না মাতিয়া নগরবাসীর সুমহান কর্ত্তব্য-পালন করিতে শিখিবে—এই লক্ষ্যে তিনি পাথর কাটিয়া পথ তৈয়ারি করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন, যাহা তিনি করিতেছিলেন তাহা পরম মঙ্গলকর,—শুধু ভারতবাসীর পক্ষে নহে—শাসক-দিগের পন্থা যাহাতে নিরাপদ ও সুখদ হয়, অহিতকর সংসর্গ যাহাতে ছাত্রদিগকে পরিচালিত না করে,—সেই মহাহিতকর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি জাতীয় শিক্ষা ও চরিত্র গড়িতে প্রাণান্ত চেষ্টা পাইতেছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানের উপর শুধু দৈহিক বলে অথবা পদের গর্ব্বে যে কেহ যখন-

তখন হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার উচ্চ আদর্শ খর্ব্ব করিয়া ফেলিবে, ইহা কিছুতেই তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত প্রাণের দরদ দিয়া গড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়। যদি কোন মহাচিত্রকরের হাত হইতে যখন-তখন তুলি কাড়িয়া লইয়া কোন রাজপুরুষ তাঁহার ধ্যান-মূর্ত্তি অঙ্কনে বাধা দেন, তবে তাহা তাঁহার পক্ষে যেরূপ অসহ্য হয়, কর্তৃপক্ষের এই হস্তক্ষেপও তাঁহার পক্ষে তেমনই মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল!

চান্সেলারের উক্তির উপর তাঁহারই গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"এলাহাবাদ-য়ুনিভার্সিটির চ্যান্সেলার স্যার হারকোর্ট বাট্‌লার, তাঁহার বাৎসরিক বক্তৃতায় আশঙ্কা করিয়াছেন—যে কথার তিনি রেঙ্গুন-য়ুনিভার্সিটির চ্যান্সেলার রূপে পুনরুক্তি করিয়াছেন যে, বাহির হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হস্তক্ষেপ করিবার একটা চেষ্টা অবিরত পিছন পিছন লাগিয়া আছে, এই চেষ্টা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত করা সম্বন্ধে তিনি অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের মতানুবর্ত্তী। তাঁহাদের মত এই যে, সরকারের এই অবৈধ হস্তক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয় কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবে না।" আশুতোষ গ্ল্যাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার আর্ল অব্‌ রোজবারীর রহস্যপূর্ণ শ্লেষোক্তিগুলি খুব রসান দিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত আর্ল বলিয়াছিলেন—"আমরা সরকার হইতে বেশী কিছু পাইব না, এমন কি তাঁহাদের সাহায্য আমরা অতি অল্পই চাহিয়া থাকি। কিন্তু 'কম্‌লী নেহি ছোড়্‌তা', সরকার প্রতিদিন আমাদিগকে তাঁহাদের উপর ভর রাখিয়া দাঁড়াইতে আমন্ত্রণ করেন। আমার মনে হয়, তাঁহাদের অতি মৃদুভাবে উচ্চারিত কথাগুলি যেন আমাদের কর্ণমূলে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে—'তোমাদের পা বেশ ভাল হইতে পারে, কিন্তু তোমরা খোঁড়া হও। তোমরা নিজের চক্ষে দেখিতে পাও? তথাপি অন্ধ সাজ। তোমরা শুনিতে পাও? কিন্তু তোমাদের কালা হইতে হইবে। বেশী সাহস দেখাইবার দরকার নাই,—এক হাত দিয়া এই পঙ্গুর লাঠিখানা ধর দেখি। যখন এই লাঠি ভর করিয়া হাঁটা তোমাদের অভ্যাস হইয়া যাইবে, তখন আর এক হাতের জন্য আর একখানি লাঠির দরকার হইবে,—যত শীঘ্র এই সকল অভ্যাস হয়, ততই ভাল।' ভীষণ শক্তিশালী ব্যক্তিকেও এই ভাবে রোগীর অবস্থায় আনা যাইতে পারে। তাহাকে চামচ দিয়া

খাওয়াইতে শিখিলে সে ক্রমে ক্রমে হাতের ব্যবহার ভুলিয়া যাইবে। মোট কথা প্রতি রন্ধ্র-পথে সরকার আমাদের কার্য্যগুলির মধ্যে হস্ত-চালনার সুযোগ চান।”

আশুতোষ বলিলেন—“স্বাধীনতার কেন্দ্রস্থানে এই কথা উচ্চারিত হইয়াছিল এবং যিনি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার দেশে যদি এই কথাগুলি খাটিয়া থাকে, তবে আমাদের দেশে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপটা যে গুরুতর আশঙ্কার উদ্রেক করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?”

লাট লিটন আশুতোষকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা সেই সময়ের শাসকবর্গের মনোভাবের একটা স্পষ্ট প্রকাশ মাত্র। লাট লিটনের চিঠিতেই জানিতে পারা যায় যে, আশুতোষের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অসামান্য কর্ম্মশক্তির উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল,—তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কর্তৃপক্ষের কথা শুনিয়া কাজ করেন;—তাহা হইলে তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তিকে আসন-চ্যুত করা তিনি কিছুতেই উচিত মনে করিবেন না। চিঠিখানি একটু ত্রস্ততার সহিত লেখা হইয়াছিল,—একটু সাবধান হইয়া লিখিলে এরূপ অনর্থ হইত না। তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

“আপনি এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে কোন সাহায্য করেন নাই, বরঞ্চ আমাদের প্রতি কার্য্যে বাধা জন্মাইয়াছেন,—আপনি আমাদের যে সমস্ত সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা আদৌ গঠন-মূলক নহে, বরং আরব্ধ কার্য্যের বিঘ্নকর। আপনি আমাদের ‘বিলের’ বিরুদ্ধে আসাম সরকারকে ও সার মাইকেল স্যাড্‌লারকে আবেদন-নিবেদন করিয়াছেন, এবং কতকগুলি পত্রিকাকে দিয়া এরূপ প্রবন্ধ লিখাইয়াছেন, যাহাতে আমাদের শাসনের সম্বন্ধে লোকের অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে।”

লর্ড লিটনের চিঠি

এই কথাগুলি বেশীমাত্রায় কড়া এবং বঙ্গেশ্বরের মুখে অশোভন। অথচ আশুতোষের প্রতি এইরূপ মনোবৃত্তি বহন করিয়াও লাটসাহেব আশুতোষকে ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন তিনি শান্ত-শিষ্ট হইয়া সরকারের কথা মানিয়া কাজ করেন।

বোধ হয় বাঙ্গলা দেশের হাওয়ায় লাট সাহেবের মনের ভাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। আমরা এরূপই দীন-হীন হইয়া পড়িয়াছি যে, কটু কষায় হজম করিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি,—ম্যালেরিয়ার রোগীও বোধ হয় কুইনাইন-সেবনে সেরূপ অভ্যস্ত নহে। কিন্তু এই হতভাগ্য মালেরিয়া-পীড়িত দেশেও দুই-একটি সুস্থ লোক থাকিতে পারে, যাঁহার জিহ্বা অনর্থক কটু জিনিষের আস্বাদ চাহে না। 'সুন্দর বনের বাঘ' ছাড়া যাঁহাকে অন্য কোন উপাধি বাঙ্গালী জাতি দিয়া তৃপ্ত হয় নাই, যাঁহার নামের পিছনে ছাব্বিশটা উপাধি-ব্যাঞ্জক অক্ষর ছাপাইয়া উঠিয়াছে 'বাঙ্গলার বাঘ' নাম, সেই নর-শার্দ্দূল আশুতোষ এইরূপ দুর্ব্বাক্য শুনিতে মোটেই অভ্যস্ত ছিলেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তর জিনিষ কিছু ছিল না,—এই মহা-প্রীতির সামগ্রী এবং ইহার ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদের খাতিরেও তিনি লাট সাহেবের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি সহ্য করিলেন না। তিনি লিখিলেন—"আপনি লিখিয়াছেন, আমি সংবাদ-পত্রগুলিকে সরকারের বিরুদ্ধে লিখিতে উত্তেজিত করিয়াছি,—এই উক্তি মানহানি-কর। আপনাকে আমি আহ্বান করিতেছি, আপনার এই অভিযোগ উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করুন। আপনি লিখিয়াছেন,—আমি আপনার 'বিলের' বিরুদ্ধে কাগজপত্র, স্যাড্‌লার সাহেব ও আসাম-গভর্ণরের নিকট পাঠাইয়াছি। হাঁ, পাঠাইয়াছি; একজন সিনেটের সদস্য, তাঁহার নিকট এই সকল কাগজপত্র পাঠাইতে আমরা বাধ্য। অপর একজন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খুটিনাটি সমস্ত অবগত হইয়া ইহার ইষ্টের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন; তাঁহার কাছে এই সকল কাগজ-পত্র না পাঠাইলে তাহা সিনেটের পক্ষে অশোভন হইত।"

তারপরে তিনি বলিলেন যে, লর্ড মিণ্টো, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড চেমস্‌ফোর্ড তাঁহাকে সাদরে ডাকিয়া আনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার দিয়াছেন এবং তিনি অনেক সময়েই কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন—ইহা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতকল্পে করিয়াছেন। তাঁহারা একবাক্যে তাঁহার স্বাধীন মনোবৃত্তির প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলারদের কার্য্য লক্ষ্য করিয়াছেন। এই স্বাধীন মনোবৃত্তি তাঁহার স্বকীয়

একটা খেয়াল মাত্র নহে,—তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পথে তিনি চলিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন হইয়া তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে,—এই কথা শুনিলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাইস্‌চ্যান্সেলরেরা বিস্মিত হইতেন। আশুতোষ স্বীকার করিলেন, তিনি লাটসাহেবের এবং তাঁহার মন্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য তিলমাত্রও চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সরকার যাহাতে তাঁহাদের অন্যায় পন্থা হইতে বিরত হ'ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতার্থে তিনি সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই, তাঁহারা তাঁহার প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেন নাই। উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

আশুতোষের উত্তর

"আপনি এবং আপনার মন্ত্রী যে আমাকে সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তাহাতে আমি বিস্মিত হই নাই। আপনি দেশবাসীকে মানুষ হওয়ার জন্য মুখে উদ্বোধন করেন। আপনাদের সম্মুখে এইখানেই একজন আছেন, যাঁহার স্বীয় বিশ্বাসানুসারে কথা বলিবার সাহস আছে এবং তিনি যাহা ভাল বোঝেন, তাহা করিতে চেষ্টিত,—কিন্তু আপনারা তাঁহাকে দেখিতে পারেন না। এ দেশে এরূপ একজন ভাইস্‌চ্যান্সেলর পাওয়া আপনাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না, যিনি আপনাদের আজ্ঞাধীন হইয়াই আদেশ প্রতিপালন করিবেন এবং সিনেটে গুপ্তচরের কাজ করিবেন; তিনি সহজেই আপনাদের অন্তরঙ্গ হইবেন। কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তিকে জনসাধারণ এবং সিনেটের সদস্যগণ কখনই বিশ্বাস করিবেন না। আমরা নবাগত এইরূপ একজন ভাইস্‌চ্যান্সেলরের প্রতীক্ষায় রহিলাম। তিনি সিনেটের চিরাচরিত পন্থা ত্যাগ করিয়া কিরূপ নব-প্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহা দেখিবার জন্য কৌতূহল জন্মিতেছে। আমি আপনার পত্রের উত্তরে যাহা বলিব, তাহা যাঁহার আত্ম-সম্মান জ্ঞান আছে, তাঁহার একমাত্র উত্তর এবং আমার বিশ্বাস তাহাই আপনি ও আপনার মন্ত্রিগণ আমার নিকট প্রত্যাশা ও ইচ্ছা করেন,—আপনি যে অপমান-সূচক প্রস্তাব করিয়া ভাইস্‌চ্যান্সেলরের পদ আমাকে দিতে চাহিয়াছেন, তাহা আমি প্রত্যাখ্যান কতিতেছি।"

যে 'বিল' লইয়া এই বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাহার দায়িত্ব ছিল, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর; তাঁহারই প্রভাবে লাট লিটনের মনোভাবের হয়ত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। আশুতোষের পত্রের এক স্থানে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত

আছে। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,—এরূপ নির্ভীকভাবে 'বিলে'র প্রতিবাদ তো সিনেট বহুদিন যাবত করিয়া আসিয়াছেন,—তার পরেও লাটের সঙ্গে তাঁহার বহুবার দেখা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে কোনদিন তিনি এরূপ বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই।

যাহা হউক, আশুতোষ এই ব্যাপারে একেবারে সহায়হীন ছিলেন না। সম্ভবতঃ ভারত-সরকার ও আসাম-সরকার উভয়েই সেই 'বিলে'র প্রতিবাদী ছিলেন। আশুতোষের সঙ্গে লাট্‌ লিটনের এই দ্বন্দ্ব লইয়া সমস্ত পত্রিকা-মহলে খুব হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। সমস্ত দেশীয় পত্র এই ব্যাপারে লাট লিটনের নিন্দায় মুখরিত হইয়াছিল; 'ইংলিশম্যান' ও 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌' লাট সাহেবকে সমর্থন করিয়াছিল। আশুবাবুর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই হইয়াছিল—"লাট লিটনের চিঠি কতকটা গোপনীয়,—ইহাতে তিনি খোলাখুলিভাবে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন,—ইহা লইয়া প্রকাশ্য সভায় এতটা গোলমাল করা আশুতোষের সুরুচির পরিচায়ক হয় নাই।" চিঠিতে ইহা 'গোপনীয়' বলিয়া বলা হয় নাই, এবং শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছে,—কাহারও কোন ব্যক্তিগত স্বার্থঘটিত কথা ইহাতে ছিল না,—তখন চিঠিটা 'গোপনীয়' বলিয়াই বা ধরা হইবে কেন? সাধারণের হিত এবং অহিত সম্বন্ধে আলোচনার অর্থ কি আমরা এই বুঝিব যে, লাট লিটন আশুতোষের মত লোককে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া ধম্‌কাইবার অধিকারী?

অতি শান্ত, শিষ্ট এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও এই চিঠির ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্যার জগদীশ ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত ব্যক্তিরাও যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, যদি সত্য সত্যই আশুতোষ 'বাঙ্গলার ব্যাঘ্র'বৎ হইয়া থাকেন, তবে লাট লিটনও গায়ে পড়িয়া তাঁহাকে উস্কাইয়া তুলিয়াছিলেন।

অনেকে মনে করেন, লিটন্‌ সাহেব আশুতোষকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা কন্‌ভোকেশনে তৎপ্রদত্ত বক্তৃতার ফলে। আশুতোষ সেই বক্তৃতায় কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে কতকটা বিচলিত হইয়া লর্ড লিটন্‌ ঐরূপ চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এই ধারণা ভুল। কর্ত্তৃপক্ষের

পরামর্শদাতারা সম্ভবতঃ লর্ড লিটন্‌কে বুঝাইয়াছিলেন যে, আশুতোষ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলরের পদ পাইবার জন্য এরূপ লোলুপ যে, তিনি যে কোন সর্ত্তে উহা পাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিবেন না। লর্ড লিটন্ ঐ চিঠি কন্‌ভোকেশনের বক্তৃতার পরে লেখেন নাই। কন্‌-ভোকেশন আরম্ভ হইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ পত্র আশুবাবুর হস্তগত হইয়াছিল।

১৯২২ সালে লর্ড লিটন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'রিফর্ম্‌ড্ ইউনিউনিভার্সিটি' অর্থাৎ নবগঠিত ও সংশোধিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'আন্‌রিফর্ম্‌ড্ ইউনিভার্সিটি' অর্থাৎ অসংশোধিত বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দিয়া-ছিলেন। ঐ সনের কন্‌ভোকেশনের বক্তৃতায় আশুতোষ যেরূপ নির্ভীক-ভাবে তাহার জবাব দিয়াছিলেন, তাহাতে লর্ড লিটন নিশ্চয়ই খুব বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পোষাক-পরিবর্ত্তনের ঘরে আশুতোষকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি আপনার চ্যান্সেলরের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা (Loyalty) দেখান নাই।" উত্তরে আশুতোষ বলিয়াছিলেন,—"আমি কাহারও প্রতি শ্রদ্ধায় ন্যূন নহি। আমি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদা শ্রদ্ধাশীল ও অনুরক্ত।" আমি এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলাম, এবং বিশ্বস্তসূত্রে অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম। লর্ড লিটন্ ছিলেন মহৎ বংশোদ্ভব, মনের বিক্ষোভ তিনি পোষণ করিয়া রাখেন নাই। আশুবাবুর মৃত্যুর পরে তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট যে সহানুভূতি-জ্ঞাপক সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মহানুভবতা-সূচক। তিনি সেই বিজ্ঞপ্তিতে বুঝাইয়াছিলেন যে, আশুতোষের মহান বীর চরিত্রের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপদ

ভাইস্‌চ্যান্সেলরের পদ গেল, তথাপি আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার না হইয়াও কর্ণধারই রহিলেন ; প্রতিটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ কার্য্য তাঁহারই ছাপমারা, তাঁহারই ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিলেন, আশুবাবু যাহা বুঝিবেন তাহাই হইবে, অপরের কোন নির্দ্দেশ-পালনের জন্য সেই বিশাল শিক্ষা-শালায় তিলমাত্র

অবকাশ নাই। কিন্তু অপর দিকে সরকারের পূর্ণ ক্ষমতা,—সিন্দুকের চাবিটি তাঁহাদের হাতে। শুধু ছাত্রবেতনে পোষ্টগ্রাডুয়েট বিভাগের কাজ নির্ব্বাহ পায় না। আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ অসম্ভব ভাবে বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা সুচারুরূপে পরিচালনা করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। সরকারী সাহায্য ব্যতীত এই জগন্নাথের রথ অচল হইয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট্ তাঁহাদের প্রতিশ্রুত অর্থ দিতেও নির্ম্মমভাবে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় যে কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিল, আমরা শুধু তাহার সাক্ষী নহি, ভুক্তভোগী। অধ্যাপকদের বেতন রীতিমত দেওয়া অসম্ভব হইল। কর্ত্তৃপক্ষের অনুগত বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আশুতোষের বিরোধী হইলেন। তাঁহারা শুধু সিনেট-সভায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, সাধারণের মধ্যে আশুবাবুর বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইলেন। সংবাদ-পত্রগুলিতে তাঁহার কার্য্যকলাপের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমি আশুতোষের দুই-এক জন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে, এই সময় কলিকাতাবাসী কোন বিখ্যাত ধনী মাড়োয়ারী তাঁহাকে ১০ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্তটা স্থির হওয়ার পরে প্রতিপক্ষের জনৈক বড় লোক সেই ব্যক্তির কানে এরূপ অব্যর্থ মন্ত্র প্রয়োগ করিল যে, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিলেন না। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবস্থা তাহা বলিবার নহে। আশুতোষ যে ভাবে এই বিপদের দিনে অটল পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, অপর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীদের কষ্টে যেরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে এক দিকে এই মহাপুরুষের অলোকসামান্য, অটল দৃঢ়তা ও অপর দিকে তাঁহার চিত্তের পুষ্পাদপি কোমলতা আমাদের চক্ষে দীপ্যমান হইয়াছিল।

সরকারের চাবি তাঁহাদের হাতে

অধ্যাপকদের কেহ আসিয়া বলিলেন যে, অর্থাভাবে তাঁহার বাড়ীর দুগ্ধবতী গাভীটিকে তিনি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অপর একজন বলিলেন যে, তাঁহাদের দেশে ম্যালেরিয়ার মড়ক লাগিয়াছে, তথাপি তিনি অসমর্থ হইয়া তাঁহার শিশুসন্তান-সহ পরিবারবর্গকে দেশে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন। বহু মাসের বেতন বাকি, প্রত্যহ এই দুরবস্থাপন্ন অধ্যাপকদের দল ভিড় করিয়া তাঁহার নিকট স্ব স্ব মনোব্যথা প্রকাশ করিতেন।

শত যুদ্ধের বীর

আশুতোষকে কোন বিপদ বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি শত যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বীর; যতই বিপদে পড়িতেন, ততই যেন তাঁহার বল বৃদ্ধি হইত। বিপদের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত ললাটে, মুষ্টিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেন, অর্জ্জুনের মত স্বীয় অব্যর্থ যুক্তিতর্কের গাণ্ডীব দ্বারা তিনি শত অক্ষৌহিণীকেও পরাস্ত করিতে ক্ষমবান্ ছিলেন; সে গাণ্ডীবে জ্যা দেওয়া অন্যের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি বিচলিত হইয়া পড়িতেন, তাহা পর-দুঃখের কথায়। যখন অধ্যাপকেরা সজল চক্ষে, কেহ অল্প কথায়, কেহ বিস্তারিত ভাবে, তাঁহাদের অভাব বর্ণনা করিতেন, তখন সেই মহাভাগের চক্ষু-যুগল সঙ্গে সঙ্গে সজল হইত, নিঃসহায়ের মত তিনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতেন, মনে হইত যেন পৃথিবীর অন্তস্তলের কোন মহা বিপ্লবে অটল হিমাদ্রির আসন টলিতেছে।

এই অধ্যাপকের দল ছিল তাঁহার প্রধান সহায়,—সহায় তিনিই সর্ব্ববিষয়ে ছিলেন তাঁহাদের। তাঁহারা তাঁহার উপকার আর কি করিবেন? তাঁহাদের প্রাণের অনুরাগ ছিল আশুতোষের বল। যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতেন,—অম্লান বদনে সহ্য করিতেন,—যাহা অপর কোন ব্যক্তির নিকট তাঁহারা কিছুতেই করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

কিন্তু একবার আশুতোষের এই অনুরক্ত দলের মধ্যেও ভাঙ্গন লাগিল,—তাহা তাঁহার চিত্তে অসহ্য বেদনার সৃষ্টি করিলেও তিনি তাহাও ধীরতার সঙ্গে সহ্য করিয়াছিলেন।

নিজের দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল; লক্ষ্ণৌ, বেনারস্ প্রভৃতি স্থানের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি জাঁকালো হইয়া উঠিল। তাঁহারা অধ্যাপকদিগকে উচ্চ বেতন দিতে প্রস্তুত হইলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা এখানে যত বেতন পাইতেন, কোন কোন স্থানে তাহার দ্বিগুণ বেতনের আশা তাঁহারা পাইলেন। এই আকর্ষণ আশুতোষের অনুরাগী দলের মধ্যে অনেকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। রাধাকুমুদ, রাধাকমল—দুইটি বিশিষ্ট অধ্যাপক লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন, রমেশ মজুমদার ঢাকায় কাজ গ্রহণ করিলেন। মেঘনাদ সাহা, হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকেরাও কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন। আশুতোষ যদি অল্প কিছু

বেতন বাড়াইয়া দিতে পারিতেন, তবে ইঁহারা অনেকটা ক্ষতি সহ্য করিয়াও তাঁহার প্রতি প্রাণের অনুরাগ বশতঃ এখানেই থাকিয়া যাইতেন। তাঁহারা যে শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কাহার কৃপায়? গবেষণাক্ষেত্রে উৎসাহ দিয়া তিনিই তো তাঁহাদিগের গুণপণার উৎস-স্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় যথাযোগ্য লেবরেটরি লাভ করিয়াই তো রমণ-সাহেবের প্রতিভা খুলিয়া গিয়াছিল! যেরূপ সূর্য্যের আলো না পাইলে চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্ হইতেন না, রমণ-সাহেবও আশুতোষের কৃপা না পাইলে নোবেল-প্রাইজ্ পাইয়া জগদ্ব্যাপী যশঃ অর্জ্জন করিতে পারিতেন না। অর্থের লোভ প্রতিরোধ করা পরিবার-দায়গ্রস্ত বাঙ্গালীর পক্ষে অতি কঠিন। এক এক জন কৃতী পুরুষ এই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেলেন, আশুবাবুর মনে হইতে লাগিল যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি হাড় খসিয়া পড়িতেছে। সহিদুল্লা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা-বিভাগে ২৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন, ঢাকা হইতে তাঁহাকে ৪০০৲ টাকা বেতন দেওয়ার প্রস্তাব আসিল। সহিদুল্লা আমাকে বলিলেন, "আর ৫০৲টি টাকা আশুবাবু আমাকে বাড়াইয়া দিন, আমি থাকিয়া যাইব,—আমার পরিবার বৃহৎ। আমার কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।" সহিদুল্লা বাঙ্গলা বিভাগে ছিলেন, আশুতোষ জানিতেন, ইঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ; ইনি ইংরাজী, ফরাসী, উর্দ্দু, আরবী, পার্শী, সংস্কৃত, প্রাচীন বাঙ্গলা প্রভৃতি বহু ভাষাক্ষেত্রে শুধু কৃতী নহেন, বিশেষজ্ঞ। আমি বলিলাম—"এরূপ লোককে ৫০টি টাকা বাড়াইয়া রাখা উচিত।" আশুতোষের চক্ষে একটি মিশ্রভাবের দৃষ্টি খেলিয়া গেল, তাহাতে দুঃখ, ক্ষোভ ও অটল পণের ভাব যুগপৎ দেখিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন—"আপনি শুধু সহিদুল্লাকে দেখিতেছেন, আর ১০।২০ জন অধ্যাপককে দেখিতেছেন না। সকলের উপরই যে আকর্ষণ আসিয়াছে, অনেকেই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাওয়ার জন্য পা বাড়াইয়া আছেন, কিছু কিছু বেতন বাড়াইয়া দিলে ইঁহাদের অনেকেই থাকিয়া যাইবেন, আমার প্রতি অনুরাগ বশতঃ তাঁহারা অনেক লোভ সংবরণ করিতে প্রস্তুত। কিছু বিবেচনা আমরা করি, এইরূপ ন্যায্য দাবী অবশ্যই তাঁহারা করিতে পারেন। সহিদুল্লাকে ৫০৲ টাকা বাড়াইয়া দেওয়ার অর্থ হইতেছে যে, মাসিক ২।৩ হাজার টাকা আমাকে

রমণ সাহেবের নোবেল প্রাইজ পাওয়া

সর্ব্বসাকুল্যে বাড়াইবার ব্যবস্থা করা। কাহারও নিকট প্রস্তাব আসিয়াছে এবং আরো কাহারও কাহারও নিকট প্রস্তাব আসিবে। সকলেরই বেতন বাড়াইবার জন্য আমাকে প্রস্তুত হইয়া সহিদুল্লার বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে। আর যাঁহারা অপর স্থানে যাইতে প্রলুব্ধ হইবেন না, অথচ এখানে যোগ্যতার সহিত কাজ করিতেছেন, সহকর্ম্মীদের বেতন বাড়াইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করাও তো সঙ্গত হইবে নাকো।" কিছুক্ষণ থামিয়া তিনি বলিলেন—"এইরূপ প্রলোভনে যাঁহারা ছাড়িয়া যাইবেন, তাঁহাদের দাবীর প্রশ্রয় দেওয়াও আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। যে কেহ অপর স্থানে বেশী টাকা পাইয়া যাইবেন, তিনিই ঐরূপ দাবী উপস্থিত করিবেন। স্বাভাবিক-ক্রমে এইস্থানে থাকিয়া যাঁহারা বেতনের উন্নতির প্রত্যাশা করিবেন, আমরা যদি যথা সময়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি, তবে অবশ্যই তাহা করিব। আমাদিগের উপর এই বিশ্বাসটুকু না থাকিলে আমরা কি করিতে পারি? আমাদের এখনকার অর্থ-সঙ্কটের কথা তো কাহারও অবিদিত নাই।"

এত বড় বড় অধ্যাপকগণ চলিয়া গেলেন, আশুতোষ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন, কিন্তু ধরিয়া রাখিবার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।

আমার সম্বন্ধে

তাহার পরে আসিল আমার পালা। একদিন আশুবাবু বলিলেন—"হারটোগ্ সাহেব (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর) আমাকে আপনার কথা বলিয়াছেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ৮০০৲ টাকা বেতনে আপনি ঢাকাতে যাইতে প্রস্তুত আছেন কি-না (তখন আমি এখানে ৪০০৲ টাকা পাইতাম)—আমি হারটোগ্‌কে কি লিখিব?" আমি বলিলাম—"আপনি আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?" তিনি উত্তর দিলেন—"বলিয়াছি, সে বড় কঠিন ঠাঁই,—ইনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে যে প্রস্তুত হইবেন, এরূপ বোধ হয় না।" তথাপি হারটোগ্ সাহেব পুনঃ পুনঃ এ বিষয়টি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন,—"আপনি কি বলেন?" আমি বলিলাম—"আপনি তো উত্তর দিয়াছেন, আমি আপনাকে ছাড়িয়া কোথায়ও যাইব না।" আশুতোষ স্মিতমুখে বলিলেন—"বাড়ী যাইয়া ভাবুন, যা'হোক হঠাৎ কিছু বলিয়া ফেলিবেন না।"

আমি বাড়ী আসিয়া নিজেও বিবেচনা করিলাম, ছেলেদের সঙ্গেও আলোচনা করিলাম। ঢাকা অবশ্য আমার দেশ, আমার আত্মীয়দের অনেকেই সেখানে। আশুতোষের প্রতি আমার প্রাণের অনুরাগ ও আকর্ষণ তো আছেই—তাহা ছাড়া এখানকার বঙ্গ-বিভাগটি সৃষ্টির মধ্যে আশুতোষের অনুবর্ত্তী হইয়া আমিও কিছু খাটিয়াছি; প্রাণের দরদে গড়া এই আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়! কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, এখানে আমার কয়েকখানি বাড়ী ও কিছু জমি আছে। আমি না থাকিলে ছেলেদের দ্বারা এগুলি রক্ষা করা কঠিন হইবে। ছেলেদের অনেকেই একান্ত তরুণ, কেহ কেহ পড়েন কেহ বা এখানে কাজ কর্ম্ম করেন, সুতরাং পরিবারের অধিকাংশ এখানে থাকিবেন,—ইঁহাদের অভাব-অভিযোগ এবং ব্যারাম-পীড়ার সময় সমস্ত তত্ত্বাবধান আমিই করিয়া আসিতেছি,—দুই জায়গায় দুইটি স্বতন্ত্র পারিবারিক ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কেহ পীড়িত হইয়া পড়িলে ঢাকা-কলিকাতায় ছুটাছুটি করিতে হইবে,—এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, ৪০০৲ টাকা বেতন বেশী পাইলেও অত্যধিক ব্যয়-নিবন্ধন তাহা দ্বারা বিশেষ সুবিধা হইবে না, অথচ বৃদ্ধকালে পরিবারের অনেকের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইবে। তিন-চার দিন পরে আশুবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন—"হারটোগ্ সাহেব আবার তাগিদ দিয়াছেন, আপনার সিদ্ধান্তটি আমাকে জানান।" আমি বলিলাম,—"আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহাই বলিব,—আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না,—কিছুতেই নহে।" তাঁহার দুইটি বিরাট্ গুম্ফ, গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রোজ্জ্বল কৃষ্ণ মেঘের ন্যায়, হাসির ছটার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি সেদিন তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িলাম। ইহার পরে প্রকাশ্য সভায় তিনি আমার ঢাকার চাকুরি প্রত্যাখ্যানের কথা উত্থাপন করিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কিন্তু যদিও তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ খুবই প্রবল ছিল, তথাপি আমার প্রত্যাখানটা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ-গন্ধ-শূণ্য ছিল না। কিন্তু সেই মহামনা ও সরল-প্রকৃতি পুরুষ আমার অনুরাগটাই শুধু দেখিতে পাইয়াছিলেন।

এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে একদিন পোষ্টগ্রাজুয়েট এক্জিকিউটিভ্ সভার আমরা উপস্থিত হইয়াছি। কতকগুলি প্রস্তাবের আলোচনা ও ব্যবস্থা

শেষ হইয়া গেলে আশুবাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি এখান হইতে উঠিয়া যান।" আমি বুঝিতে পারিলাম না তিনি কেন আমার প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন। ভাবিলাম কি ভাবে কি বলিয়াছেন,—তাহা হয়ত আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আমি ঐ সভার সদস্য, সভাগৃহ হইতে বিতাড়িত হইবার মত আমি কি করিয়াছি? আমি বসিয়াই রহিলাম। খানিক পরে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে তিনি বলিলেন,—"বসিয়া আছেন! আমি আপনাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বলিতেছি, বুঝিতে পারিতেছেন?" এবার তাঁহার কথায় অনিশ্চিত কিছুই ছিল না, সুতরাং নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া সহ-সদস্যদিগের দৃষ্টি হইতে অপমানের অবস্থা লুকাইয়া আমি ধীর পদে রেজিষ্ট্রারের ঘরে প্রবেশ করিলাম। রেজিষ্ট্রার জ্ঞানবাবু আমাকে বলিলেন,—"সভা চলিতেছে, আপনি আসিয়া পড়িলেন যে? সভা কি ভাঙ্গিয়াছে?" আমার চক্ষে দুই ফোঁটা জল, তাহা তখনও গণ্ডে গড়াইয়া পড়ে নাই। কিন্তু বন্ধুর সদয় কণ্ঠ শুনিয়া তাহা রোধ করিতে পারিলাম না; কোনরূপে জ্ঞানবাবুর দৃষ্টির আড়ালে রুমালে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহার নিকট করুণভাবে ঘটনাটি বলিলাম। তিনি বলিলেন—"তাই তো, আপনাকে কি জন্য সভা হইতে উঠাইয়া দিলেন? আপনার বিরুদ্ধে বা সম্পর্কিত কোন কথা সভার কর্ম্ম-তালিকায় ছিল কি?" আমি বলিলাম—"কিছুই না।" সুতরাং জ্ঞানবাবু এই রহস্যের ভেদ করিতে পারিলেন না। প্রায় ১০ মিনিট পরে চাপরাশি আসিয়া জানাইল,—আশুবাবু আমাকে সভা-গৃহে ডাকিয়াছেন; দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম, সভার কাজ চলিতেছে,—তখন আমি পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমাকে সভাগৃহ হইতে চলিয়া যাওয়ার আদেশ কেন দেওয়া হইয়াছিল, বলিতে পারেন?" তিনি মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন—"আপনার বেতন তিনি মাসিক ১০০৲ বাড়াইয়া দিয়াছেন।" অথচ ঘুণাক্ষরেও তিনি আমাকে ইহার আভাষ দেন নাই। আমি বুঝিলাম—সেই ঢাকার চাকুরি-প্রত্যাখ্যানের পুরস্কার এতদিন পরে তিনি আমাকে দিলেন। আশুবাবু ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি। তাঁহার বিচার যে কত উচ্চ মনের যোগ্য হইত, তাহা আর একটি ঘটনাদ্বারা বুঝাইব; এই ঘটনাটিও আমার সম্পর্কিত।

এই আখ্যায়িকার পরবর্ত্তী অংশ

সদাশয়তা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একদিন আমার সমক্ষে আশুবাবুকে বলিলেন—"প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটা বড় রকমের সংগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সঙ্কলন করার ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়—দীনেশবাবুর উপর এই ভার দিতে পারেন।" ইহার কিছুদিন পরে বিলাতের 'টাইম্‌স্'-এর 'লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট' আমার ইংরাজী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা-উপলক্ষে সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"প্রাচীন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পাওয়া গেল, কিন্তু এই গ্রন্থোক্ত বহু পুস্তকের মধ্যে অতি অল্পই ছাপা হইয়াছে,—সুতরাং এই প্রাচীন সাহিত্য সুধীসমাজের অনায়ত্ত হইয়াই রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের বড় রকমের একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলন করা।"

আশাতীত সুবিচার

আশুবাবু স্থির করিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বঙ্গ-সাহিত্যের পরিচয়-স্বরূপ একটি বড় সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। এইবার আমার ডাক পড়িল। আমাকে আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত পারিশ্রমিক হইলে আপনি এই কার্য্যের ভার লইতে পারেন?" আমি বলিলাম—"এ সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব? আপনি প্রসন্নমনে যাহা দেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইব।" আশুবাবু বলিলেন—"এ সকল কথা এ ভাবে চলিবে না, আপনি একটা স্থির করুন, সিণ্ডিকেট হইতে আমাকে ব্যবস্থা করিতে হইবে, আপনি কাল আমাকে বলিবেন।"

আমি পরদিন তাঁহাকে বলিলাম—"২০০০৲ টাকা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব, অবশ্য আপনি যদি কিছু কম দেন, বা যাহাই দেন না কেন, কিছুতেই আমার আপত্তি হইবে না।"

আশুবাবু কিছু বলিলেন না, আমি চলিয়া আসিলাম। পরবর্ত্তী সিণ্ডিকেট-সভার অধিবেশনের পরে আমি জানিতে পারিলাম—এই পুস্তক-সঙ্কলনের জন্য আমার পারিশ্রমিক ৪০০০৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। এত বড় বিস্ময় জীবনে খুব কমই ঘটিয়াছে। তারপর পুস্তকখানির কার্য্য-সমাধা হইলে আমি

বুঝিতে পারিলাম যে, উহা সঙ্কলন করিতে ৪টি বৎসর আমার প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, প্রায় ৩।৪ হাজার খানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি আদ্যন্ত পড়িয়া আমাকে চয়ন করিতে হইয়াছে, তাহাদের কতকগুলি ২৫০ বৎসর হইতেও বেশী প্রাচীন এবং অনেকগুলিই ৪।৫ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। রাত্রি দিন ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে গ্রন্থ-কীটের মত প্রত্যেকটি দুর্ব্বোধ ছত্রের খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই চয়নিকা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বহুসংখ্যক ছবির সন্ধান লইয়াছি ও ফটো-গ্রাফারের সাহায্যে তাহাদের প্রতিলিপি তুলিয়াছি। এই পরিশ্রমে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল,—ইহার রয়েল আট-পেজী আকারের ১০০ পৃষ্ঠার ভূমিকাটি পাঠ করিলেই দেখা যাইবে—এতদর্থে আমার খাটুনি কিরূপ উৎকট হইয়াছিল। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল,—এক এক খণ্ড রয়েল আট-পেজী ফর্ম্মার ন্যূনাধিক এক সহস্র পৃষ্ঠায় পূর্ণ। ৪০০০৲ টাকা পাইয়াছিলাম, তাহাতে কষ্টে-স্বষ্টে আমার পারিশ্রমিক কোনরূপে পোষাইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে আমি এই কার্য্যের এবম্বিধ গুরুত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

কিন্তু আশুবাবু ভিন্ন অপর কে এই দুর্লভরূপ সুবিচাব করিতে পারিতেন? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, অন্য কেহই প্রার্থীর প্রার্থনা ছাপাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা করিতেন না। বড় জোর পুস্তকখানি শেষ হইলে আবেদন-নিবেদনের পর উপসংহারে একটা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত হইতে পারিতেন। কার্য্যের গুরুত্ব-সম্বন্ধে এরূপ অন্তর্দৃষ্টি-সূচক মহানুভবতা প্রথমশ্রেণীর বিচারকের যোগ্য,—ইহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

এই ভাবের সুবিচার বহুলোকের প্রতি তিনি করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একান্ত আর্থিক দুরবস্থার সময়ও তিনি ক্ষুদ্রাশয়ের পরিচয় দেন নাই—অবশ্যই অর্থকৃচ্ছ্রের সময় তাঁহাকে অনেক কাট-ছাঁট করিতে হইয়াছে, কিন্তু এ সময়েও তাঁহার উদার দৃষ্টির নিদর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি গৃহে, প্রতি কক্ষে রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার ভিতরে ক্ষুদ্রত্ব বলিয়া কিছু ছিল না, তাঁহার আকৃতি ছিল বৃহৎ, মস্তিষ্ক ছিল বৃহৎ, অন্তঃকরণ ছিল বৃহৎ—মহত্ত্ব দিয়াই যেন ভগবান তাঁহার সমস্ত দেহ-মন গড়িয়াছিলেন। উদাহরণ দিতে হইলে,

আমি স্বয়ং তাঁহার যে সকল কার্য্যের সংস্পর্শে আসিয়াছি, তাহা লইয়াই আমাকে কথা বলিতে হইবে,—আমার উপায়ান্তর নাই। পাঠক যেন না ভাবেন, আমি কেবলই নিজেকে জাহির করিতেছি।

আর একদিনের কথা বলিব,—

প্রধান পরীক্ষকের প্রতিবৎসর কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের দরকার হয়,—খাম, ফিতা, গালা, ফাস্ কাগজ, আলপিন, ব্লটিং কাগজ, লেড্ পেন্সিল, লাল-নীল পেন্সিল ইত্যাদি। তখন চন্দ্রভূষণ মৈত্রেয় এসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষকস্বরূপ আমি চন্দ্রবাবুর নিকট ঐ জিনিষগুলি চাহিলাম। তিনি প্রথম বলিলেন—"পাঠাইয়া দিব।" তারপর কি ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"দেখুন, আজকাল খরচ-পত্রের বড় কড়াকড়ি হইতেছে, আমি নিজ দায়িত্বে কিছু একটা করি না। আপনি একটা লিষ্ট্ দেন, আমি থিবো সাহেবকে (রেজিষ্ট্রার) দেখাইয়া তাহা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।"

খাম, ফিতা, গালা ইত্যাদি চাওয়ার শাস্তি

এই সামান্য বিষয়ের জন্য থিবো সাহেবকে ত্যক্ত করিতে আমি দ্বিধা বোধ করিতেছিলাম; কিন্তু চন্দ্রবাবুর আগ্রহাতিশয্যে শেষে সম্মত হইলাম।

আমি একটি ক্ষুদ্র লিষ্ট্ প্রস্তুত করিতেছি, চন্দ্রবাবু বলিলেন—"কই ছুরি ও কাঁচির কথা লিখিলেন না?" এইরূপ আরও দুই একটি পদ তাঁহার কথামত আমি লিখিয়া দিলাম। পরদিন প্রাতে আমি ভবানীপুরে আশুবাবুর বাড়ীতে গিয়াছি, তিনি আমাকে দেখিয়া একটু বিরক্তির সুরে বলিলেন—"আপনি এ কি করিয়াছেন? থিবো সাহেব বলিয়া গেলেন, আপনি এক রাজ্যের জিনিষ-পত্রের জন্য একটা লম্বা লিষ্ট্ খাড়া করিয়াছেন, আমরা তো এইরূপ জিনিষ-পত্র প্রধান পরীক্ষক স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাই না।" আমি বলিলাম—"আমি তো বরাবরই উহা পাইয়াই আসিয়াছি।" বিরাজমোহন মজুমদার মহাশয় সেইখানে ছিলেন; তিনি বলিলেন—"প্রধান পরীক্ষক স্বরূপ আমি তো কোনদিন রেজিষ্ট্রারের ঘর হইতে কিছু নেই নাই (তখন কন্‌ট্রোলারের ডিপার্টমেণ্ট হয় নাই)।" আমি মনে ভাবিলাম, তাঁহার ল' কলেজ আছে, তথাকার আফিসের তিনি কর্ত্তা, সেই স্থান হইতে মায় চাপরাসী, সমস্ত কাগজপত্র ও সরঞ্জাম, সবই পাওয়া যায়। তাঁহার অন্য স্থান হইতে কিছু

লওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রকাশ্যে বলিলাম—"আপনি না নিতে পারেন, কিন্তু অপর অনেক প্রধান পরীক্ষকেরা নেন, তাহা আমি জানি।"

এই বলিয়া একটু উত্তেজিত কণ্ঠে আমি বলিলাম—"পূর্ব্বে আট-নয় হাজার ছাত্র পরীক্ষা দিত, এখন তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষা দেয়, প্রধান পরীক্ষকের ফি কিছুই বাড়ে নাই। কিন্তু যদি এই জিনিষগুলি না দেওয়াই এখনকার রীতি হইয়া থাকে, তবে চন্দ্রবাবু তো আমাকে বলিলেই পারিতেন, এই সামান্য ২।৩ টাকার জিনিষের জন্য আমাকে ফর্দ্দ দাখিল করিতে বলিয়া এবং ২।৩ টি পদ বাড়াইবার পরামর্শ দিয়া থিবো সাহেবের দ্বারা আমাকে এইরূপ লাঞ্ছিত করা হইল কেন? চন্দ্রবাবু বলিলেই আমি নিরস্ত হইয়া যাইতাম, এই ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য এতটা ঢাক-ঢোল পেটায় আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি।"

আশুবাবু আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—"থিবো সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন, এ সকল জিনিষের জন্য রেজিষ্ট্রারের আপিসে আর আপনি যাইবেন না।"

সিণ্ডিকেটের পরবর্ত্তী অধিবেশনে একটা প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহা এই যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষকদের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং প্রধান পরীক্ষকেরা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রাপ্যের উপরে আরও ১০০৲ টাকা পাইবেন।

অতিরিক্ত ১০০৲ স্যার দেবপ্রসাদ কমাইয়া দিলেন

এই বিধি ২।৩ বৎসর বলবৎ ছিল, তারপর স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এই অতিরিক্ত ১০০৲ টাকা উঠাইয়া দেন। এখন ছাত্র-সংখ্যা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছে,—তথাপি যাহা কমিয়া গেল, তাহা আর বাড়িল না!

সদ্বিচারকের মনোবৃত্তি লইয়া আশুতোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট কেহ অবিচার পাইয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। মহানুভব জনোচিত উদারতা তাঁহার প্রকৃতির অঙ্গীয় ছিল। সুদিনে দুর্দ্দিনে তিনি কখনই তাহা হইতে বিচ্যুত হ'ন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে ঠিকই বলা যাইতে পারে :—

"ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধম্।"

ছাত্রদিগের জন্য দরদ

যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের আইন-অনুসারে নূতনভাবে সংগঠিত হয়, তখন সকলের আশঙ্কা হইয়াছিল, নব বিধি অনুসারে পরীক্ষা অতি কঠোর হইবে;—ছাত্রদের মধ্যে একটা অনির্দ্দিষ্ট ভীতির ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ঢাকা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই পরীক্ষার আদর্শ কঠিন হইল এবং সরকারী অর্থ সাহায্যে সুপ্রচুর হইলেও সেই সেই প্রতিষ্ঠানে গবেষণার কার্য্য খুব ফলপ্রসূ হইল না,—আদব-কায়দার আদর্শ ও শৃঙ্খলার দিকেই কর্ত্তৃপক্ষ বেশী মনোযোগ দিলেন।

আশুবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ নূতনভাবে গঠন করিলেন। তিনি প্রথমেই পরীক্ষা ও প্রশ্ন করিবার রীতি সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া ফেলিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নববিধি প্রচলিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে প্রশ্ন যেরূপ হইয়া আসিতেছিল, আশুবাবুর নির্দ্দেশে আমরা প্রশ্নের সেই রূপ বদলাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইলাম।

প্রশ্ন করার রীতি

আশুতোষের সহিত প্রশ্নকর্ত্তাদের অনেক বিষয়েই পরামর্শ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। পোষ্টগ্রাজুয়েট্ বিভাগের বহুসংখ্যক বোর্ডেরই সভাপতি ছিলেন আশুবাবু। প্রশ্নকারীদের উপর নির্দ্দেশ হইত প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যেন প্রশ্ন তৈয়ারি করা হয়। খস্ড়া প্রস্তুত হইলে আমরা আশুবাবুর নিকট লইয়া যাইতাম। তখন পূর্ব্বকার রীতি অনুসরণ করিয়া যে খসড়া প্রস্তুত করিতাম, তাহার জন্য তাঁহার কত যে ভ্রূকুটি সহ্য করিয়াছি, তাহা আর কি লিখিব? প্রশ্নকারীকে তিনি বলিতেন—"মহাশয়, এটি স্মরণ রাখিবেন যে, প্রশ্ন দ্বারা আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় আমরা মাপ করিব না। আপনি কত বড় বিদ্বান্, তাহা ক্ষুদ্র বালকদিগকে বুঝাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত করিতে যাইবেন না,—এটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন, যে-যে শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা হইবে, সেই-সেই শ্রেণীর বালকদের নিকট আপনারা যাহা ন্যায়তঃ প্রত্যাশা করিতে পারেন, সেই পরিমাণ বিদ্যা তাহাদের হইয়াছে কি-না, তাহাই

দ্রষ্টব্য, তদতিরিক্ত কোন জটিল সমস্যা দ্বারা পরীক্ষা-গৃহে তাহাদের মাথা ঘুরাইয়া দিবেন না।”

এই উপলক্ষে একদা এক প্রধান অধ্যাপককে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি ম্যাট্রিকের অঙ্কের প্রশ্ন আশুবাবুকে দেখাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেদিন রবিবার, বেলা প্রায় ১১টা। আশুবাবু স্নান করিতে যাইবেন, একজন চাকর তাঁহার গায়ে তেল মাখাইয়া দিতেছিল। তিনি সেই অবস্থায়ই অধ্যাপক মহাশয়ের হাত হইতে তাঁহার খস্‌ড়াটা লইয়া ২।৪ মিনিটকাল তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলেন, তারপর বলিলেন—“মহাশয়, আপনি যদি বিরক্ত না হ’ন, তবে আপনাকে দিয়া একটু পরিশ্রম করাইয়া লইব। আপনার আহারাদি হইয়াছে কি?” তিনি বলিলেন—“আমি খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া আসিয়াছি।”

একজন প্রবীণ প্রশ্ন-কর্ত্তার দুর্ভোগ

“তবে দু’এক ঘণ্টা আপনি ওখানে থাকিতে পারিবেন?”

“অনায়াসে।”

আশুবাবু ভৃত্যের দ্বারা কিছু কাগজপত্র, কলম, কালি, ব্লটিং-পেপার আনাইয়া প্রশ্নকারীর হাতে দিলেন এবং বলিলেন—“যদি কিছু মনে না করেন, আপনার এই প্রশ্নগুলির উত্তর আপনি স্বয়ং লিখুন। আমি ইহার মধ্যে স্নান ও খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া আসি। বিরক্ত হইবেন না।”

অধ্যাপক ঘাড় গুঁজিয়া ছাত্রের মত প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বসিয়া গেলেন; প্রায় ২½ ঘণ্টার পর আশুবাবু সেই ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—“কই আপনার উত্তর শেষ হইয়াছে?”

তিনি কাগজগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন—“এই মাত্র হ’ল।” তারপর কাগজগুলি আশুবাবুর হাতে দিলেন; তাহার উপর দৃষ্টিপাত না করিয়াই আশুবাবু বলিলেন—“প্রশ্ন সম্বন্ধে এই কথাগুলি মনে রাখিবেন। ছেলেরা তিন ঘণ্টাকাল সময় পাইবে, তন্মধ্যে তাহাদিগকে প্রশ্নগুলি পড়িয়া লওয়ার জন্য ১৫ মিনিট সময় দেওয়া উচিত। তারপর উত্তর লেখা শেষ হইলে, তাহা একবার পড়িয়া দেখিবার জন্য ১৫ মিনিট সময় দেওয়া সঙ্গত। দুইবার ১৫ মিনিট করিয়া আধঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল,—সুতরাং ২½ ঘণ্টা সময় তাহারা পাইল এবং তাহারই মধ্যে তাহাদিগকে সকলগুলি প্রশ্নের

উত্তর দিতে হইবে। এখন দেখিতে পাইতেছি আপনার মত মনস্বী ও গণিতের প্রধান অধ্যাপককে নিজের রচিত প্রশ্নের উত্তর দিতে ২½ ঘণ্টা সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে। ছাত্রেরা কি আপনার মত কৃতী যে, তাহাদের নিকট আপনি এইরূপ ফল প্রত্যাশা করিতে পারেন? খুব মেধাবী ও মনস্বী ছেলেরা যেরূপ জানে, সেই আদর্শে প্রশ্ন প্রস্তুত করিবেন না। যাহারা মাঝামাঝি দলের ছেলে, তাহাদের অনুযায়ী প্রশ্ন দিবেন। তাহাদের অনেকেরই ভাবিয়া ভাবিয়া লিখিতে হইবে, সেটুকু ভাবিবার সময় আপনি দিলেন কই? আপনার মত হাতে কলম পাইয়াই কি তাহারা না ভাবিয়া চিন্তিয়া খস্ খস্ করিয়া লিখিয়া যাইতে পারিবে? জানিবেন প্রশ্ন হইবে average ছেলেদের জন্য,—প্রশ্ন-কর্ত্তার বিদ্যার দৌড় তাহাতে যেন না দেখান হয়,—আপনাকে কষ্ট দিলাম, খস্ড়া লইয়া যাউন—আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন; তদনুসারে প্রশ্ন করিয়া লইয়া আসিবেন।”

এই ভাবে প্রশ্ন করার রীতির একটা আমূল পরিবর্ত্তন হইল। যদি নববিধি-গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ক্যালেণ্ডার’ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ‘ক্যালেণ্ডার’ পাঠক তারতম্য করিয়া দেখেন, তবে এই রূপান্তরের তত্ত্বটি বুঝিতে পারিবেন, এ যেন বিজয়-বটিকা সেবনের পূর্ব্বে ও তাহা সেবনের পরে রোগীর অবস্থা।

আশুতোষের সদাশয়তায় এবং পাছে পরীক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার হয়, এই আশঙ্কায়, প্রশ্নগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইতে লাগিল। কিন্তু অপর দুইটি কারণেও ছাত্রগণের পরীক্ষা ‘পাশ’ করার পন্থা সুগম হইয়াছিল।

প্রথমতঃ তাঁহার সময়ে কতকগুলি প্রশ্নের মধ্যে ‘বাছ্নি’ করিয়া (alternate) প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুবিধা ছাত্রদিগকে দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রশ্ন এবং বিষয়-নির্ব্বাচন-মূলক ব্যবস্থা

তাঁহার পূর্ব্বে শুধু রচনার প্রশ্নে দুই-তিনটি বিষয়ের কোন একটির উত্তর দেওয়ার রীতি ছিল; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সেইরূপ ‘অলটারনেট’ প্রশ্নের রীতি ছিল না। দুই-তিনটি নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের যেটি ইচ্ছা সেইটিই পরীক্ষার্থী নির্ব্বাচন করিয়া লিখিতে পারে, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী ‘নম্বর’ পাইতে লাগিল।

দ্বিতীয়তঃ শুধু প্রশ্ন-সম্বন্ধে নহে, বিষয়-সম্বন্ধেও ছাত্রদের নির্ব্বাচন করিয়া লইবার সুবিধা দেওয়া হইল। এমন কি কোন পরীক্ষায় গণিত পর্য্যন্ত বাধ্যতা-মূলক

পাঠ্য-তালিকার অন্তর্গত রহিল না। সংস্কৃত এবং ভূগোলের পরিবর্ত্তেও ছাত্রগণ অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিতে পারে, এই নিয়ম হইল। পাঠ্য-তালিকার মধ্যে নির্ব্বাচনের এই সুবিধা দেওয়াতে পাশের সংখ্যা সহজেই বাড়িয়া গেল। সুতরাং আশুতোষ যে শুধু সদাশয়তার বশবর্ত্তী হইয়া ছাত্রদিগকে বেশী করিয়া পাশ করাইয়া দিতেন, তাহা নহে। সদাশয়তার মধ্যে এইটুকু ছিল যে, যেখানে ছাত্রদের জ্ঞানের দৌড়-পরীক্ষা লক্ষ্য না করিয়া প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য থাকিত নিজের পাণ্ডিত্যের দৌড় দেখাইতে,—সেখানে তিনি সেই অত্যাচার হইতে ছাত্রদিগকে রক্ষা করিতেন।

বস্তুতঃ আশুবাবু এইভাবের প্রশ্ন করিতে উপদেশ দিতেন, যাহা শ্রেণী-ভেদে ছেলেদের ঠিক উপযোগী। যেরূপ প্রশ্ন ছেলেদের মাথা ডিঙ্গাইয়া যায়, সেইরূপ প্রশ্নকারীর প্রতি তিনি অন্তরে অন্তরে বিরক্ত হইতেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়-সংক্রান্ত সকল কাজেই তাঁহার ছাত্রদের উপর প্রাণের একান্ত দরদ প্রকাশ পাইত। যে সকল পরীক্ষক নম্বর দিতে কার্পণ্য করিতেন, তাঁহাদের উপরও তাঁহার ধারণা ভাল হইত না। তিনি ছিলেন ছাত্র-বন্ধু,—তাঁহার পূর্ব্বে সচরাচর একটা ধারণা ছিল যে, উত্তর যতই ভাল হউক না কেন, সম্পূর্ণ নম্বর কিছুতেই দেওয়া যায় না। তিনি বলিতেন—"যদি লেখা নির্দ্দোষ হইয়া থাকে, তবে তাহার নম্বর কাটিবেন কেন?—পূরা নম্বরই তাহার পাওয়ার জন্য রাখা হইয়াছে, তাহা কমাইবার অধিকার কাহারও নাই।"

এই ভাবে প্রশ্নগুলি সরল ও সহজ হইতে লাগিল। নম্বর-দানেও পরীক্ষকদের হস্তের কুণ্ঠা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল ও পাশের সংখ্যা সমধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিল।

ঘরে ডাকাত পড়িলে যেরূপ হৈ চৈ রব পড়িয়া যায়, প্রতিপক্ষগণ (তাঁহাদের মধ্যে অনেক সাহেব ছিলেন) চীৎকার করিয়া গগন-মেদিনী ফাটাইতে লাগিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রসাতলে গেল, ইহার উচ্চ আদর্শের কনক-কিরীট ভাঙ্গিয়া পড়িল,—পাশ-করা ছাত্রেরা জাতীয় শিক্ষার দৃষ্টান্তস্থল না হইয়া জাতীয় আবর্জ্জনা-স্বরূপ হইল, 'Sir Ashutosh-এর বি-এ'র গোষ্ঠী'—নিন্দা-সূচক একটা প্রবাদ বাক্যের মত দাঁড়াইল। লাটদের সঙ্গে এ বিষয়ে আশুবাবুর কথা হইলয়াছিল।

বিরোধী দলের হৈ চৈ

তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন—যদি ছেলেদের পাশ না করাইয়া অযথা ঠেকাইয়া রাখা হয়, তবে ইহারাই সরকারের শত্রু হইবে, ইহারা বেকার-সমস্যা বাড়াইবে এবং চুরি-ডাকাতি করিবে।

লাট-বেলাটদিগকে তিনি এইভাবে এ বিষয়টি বুঝাইয়া দিলেন। তিনি একদিন বলিলেন—"উচ্চ শিক্ষার প্রসার কতটা বাড়িয়াছে বলুন দেখি! যদি ছোট ছোট ছেলের পক্ষে অতি দুরূহ প্রশ্ন করিয়া তাহাদিগকে থার্ড ক্লাস হইতেই ফটক বন্ধ করিয়া বিদায় দেওয়া হয়, তবে মূর্খ হইয়া তাহারা ঘরে বসিয়া থাকিবে। কিন্তু সেই সহস্র সহস্র ছাত্র, যাহারা ইহার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের লৌহ-দ্বার ঠেলিয়া ঢুকিতে পারিত না, তাহারা এখন বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়া আসিতেছে,—যাহারা বাঙ্গলার একখানি খবরের কাগজ কষ্টে-সৃষ্টে পড়িয়া বুঝিতে পারিত না, তাহারা এখন বড় বড় ইংরাজী বই ও পত্রিকা পড়িয়া বুঝিতেছে। যদিও আমি নিজে বিশ্বাস করি না যে, প্রকৃত গুণী ও মনস্বী ছেলেদের গুণপনার কোন হানি হইয়াছে—তাহারা তো উচ্চস্থান অধিকার করিয়া এখনও পরীক্ষায় বিশিষ্ট ফললাভ করিতেছে। তথাপি যদি মানিয়া লই যে, শিক্ষার আদর্শ পূর্ব্বাপেক্ষা একটু খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে, তথাপি শিক্ষার বিস্তার যে বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে, তাহাতে কি কেহ সন্দেহ করিতে পারেন? পল্লীতে পল্লীতে, বঙ্গের দূর-দূরান্তরে আজ কত শত গ্রাজুয়েট্ পাওয়া যাইবে,—যাহারা বড় বড় ইংরাজী বই পড়িতে পারে এবং সাহিত্য, দর্শন, অর্থবিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিয়াছে। স্কুলের কয়েক ক্লাস্ পর্য্যন্ত পড়িয়া যদি নিরুৎসাহ হইয়া তাহাদিগকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইত, তবে কি বঙ্গদেশ আজকার মত শিক্ষা বিষয়ে নেতৃত্ব করিতে পারিত? ভারতের যে কোন দেশের জন-সাধারণ অপেক্ষা বঙ্গের জন-সাধারণের মধ্যে এই উপায়ে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার বেশী হইয়াছে।

আশুতোষের আত্ম-সমর্থন

কিন্তু তথাপি যে দেশে কোটী কোটী লোকের মধ্যে শতকরা ৯ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানে, সে দেশে বাধ্যতা-মূলক নিম্ন শিক্ষা-বিস্তার যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শতকরা ৯১ জন বর্ণজ্ঞান-শূন্য হইতে পারে, কিন্তু তাহারা অন্যান্য দেশের জন সাধারণের মত মূর্খ নহে।

বড় বড় সাহেবেরা এ দেশের চাষাদের কর্ম্ম-কুশলতা ও উচ্চাঙ্গের চিন্তা-শীলতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

মোট ছয় শত, কি আট শত নম্বরের মধ্যে দুই, চার, পাঁচ, এমন কি দশ নম্বরের জন্য ছাত্রের জীবন মাটি হইয়া যায়, ইহা তাঁহার নিকট ন্যায়-সঙ্গত বিচার বলিয়া মনে হইত না। কত কষ্টে বাঙ্গালী মাতাপিতা ও অভিভাবকেরা—কোন কোন সময় বাড়ীর ভিটা বন্ধক দিয়া—ছেলেদের অধ্যয়নের গুরু ব্যয়-ভার বহন করেন। ৫টি নম্বর কি ১০টি নম্বরের জন্য তাহার সংবৎসরের সমস্ত অধ্যয়ন ও বহুকষ্টে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় ব্যর্থ হইবে, ইহা তাঁহার প্রাণে লাগিত এবং ইহা তিনি কখনই সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। হয়ত ২টি নম্বর বাড়াইয়া দিলে আরও ৩০০ শত ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে পারে। ৬০০ নম্বরের মধ্যে ২টি নম্বরের মূল্যই বা কি ? এবং দৈব যে ছাত্রদের অদৃষ্ট লইয়া নিরন্তর ছিনিমিনি খেলিয়া থাকেন, তাহা আশুবাবু বিলক্ষণ জানিতেন। যখন তিনি দেখিতেন, এই ছয়শত কি আট শত নম্বরের মধ্যে মাত্র দুই-একটি নম্বরের ত্রুটিতে পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ একেবারে মাটি হইয়া যায়, তখন তাহাদের সেই অবস্থা তিনি দয়ার্দ্র চক্ষে দেখিতেন, কারণ কোন মুক্তহস্ত পরীক্ষকের নিকট কাগজ পড়িলে এই দুই-এক নম্বর পরীক্ষার্থী সহজেই পাইতে আশা করিতে পারিত।

ছয় শত নম্বরের মধ্যে ২।৪টি নম্বর

দৃঢ়মুষ্টি পরীক্ষকের হস্তে পড়িয়া কোন বালক হয়ত ১০ পাইয়াছে, মুক্তহস্তের নিকট সে ১৫ পাইত—নিয়তির এই খেলা বন্ধ করিবার উপায় নাই। আশুবাবু যদি এরূপ স্থলে কাহারও জন্য সদয় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন,—এরূপ ক্ষেত্রে দু'চারিটি নম্বর বাড়াইয়া থাকেন,—তবে তাহা শুধু কৃপা-পরবশ হইয়া নহে, মানুষের কাজের মূলে যে অদৃষ্টকৃত অবিচারের বীজ আছে, তাহা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি এই দয়াটুকুর আশ্রয় লইতেন। অবশ্য নিয়ম ও শৃঙ্খলা সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরই মানিয়া চলিতে হইবে, কিন্তু আশুবাবুর মত অতিমানবের অন্তর্দৃষ্টি ও সুবিচার-প্রসূত দয়ার প্রতি আমাদের কোন কালেই দ্বিধার ভাব মনে হয় নাই। অপর পক্ষে তিনি কোন ক্ষেত্রেই দয়াকে অত্যধিক মূল্য দিয়া সুবিচারের সীমা লঙ্ঘন করিতে দেন নাই।

ছাত্রদের প্রতি তাঁহার কৃপা কত বেশী ছিল, তাহার একটি উদাহরণ আমি পূর্ব্বেও এক প্রবন্ধে দিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব।

একটি উদাহরণ

গোল দীঘির এক পুষ্প-কুঞ্জের পাশে বসিয়া একটি দরিদ্র বালক একদিন সন্ধ্যাবসানে নীরবে কাঁদিতেছিল। এই ষোড়শ বৎসর-বয়স্ক ছেলেটি অপরের অলক্ষ্যে চক্ষুজল বারংবার মুছিতেছিল। সেখানে আর একটি তরুণ যুবকের শ্যেন-দৃষ্টি সে এড়াইতে পারে নাই। যতবার সেই বয়স্ক যুবক ঐ পুষ্প-কুঞ্জের পাশ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে, ততবারই সে সেই দুঃখী বালকের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছে। অবশেষে সে কৃপা-পরবশ হইয়া তাহাকে ডাকিয়া নিজের কাছে আনিল এবং তাহার কি দুঃখ তাহা দয়ার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

সেই সহানুভূতিপূর্ণ দয়ার স্বর ছেলেটির বুকে আসিয়া বাজিল এবং সে তাহার স্কন্ধাবলম্বী হইয়া খুব কাঁদিয়া উঠিল। বহু প্রশ্নের উত্তরে সে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার কথা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিল :—

"আমার এক অতি দুঃখিনী, বিধবা, বৃদ্ধা মা আছেন,—আর সংসারে কেহ নাই। গ্রাম্য হাই-স্কুলে বিনা বেতনে পড়িয়া থাকি এবং সেখানকার জমিদার মহাশয় বলিয়াছেন, আমি যদি ম্যাট্রিক পাশ করিতে পারি, তবে তিনি আমাকে একটি চাকুরি দিবেন। তাহা না পাইলে আমি ও আমার মা না খাইয়া মরিব। মহাশয়, দুঃখের কথা কি বলিব, ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাঙ্গলার দিন ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়া আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম। অন্য সমস্ত বিষয় ভালই লিখিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গলার পরীক্ষা দিতে পারি নাই, সুতরাং কি করিয়া পাশ করিব? আমার মা এবং আমি এবার একেবারে অনশনে মরিব।"

যুবকটি বলিল—"ইহার কি কোন উপায় নাই?"

বালক বলিল—"একটা পরীক্ষাই দিতে পারি নাই, উপায় কিরূপে হইবে?"

যুবকটিকে আশুবাবু ভাল-বাসিতেন। সে বলিল—"তোমাকে আমি আশুবাবুর নিকট লইয়া যাইব, তুমি যাইবে?"

বালক বলিল—"কোন বিষয়ে নম্বর কম পড়িলে, পরীক্ষক দয়া করিয়া কিছু বাড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু আমি পরীক্ষাই দিতে পারি নাই, আমার তিনি কি ভাবে উপকার করিবেন?" তথাপি দিন স্থির করিয়া দুইজনে আশুবাবুর নিকট গেল। বালকটি আশুবাবুর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

'আমি পরীক্ষাই দেই নাই, তিনি কি করিবেন?'

আশুবাবু যুবকটিকে বলিলেন—"তোমরা আমাকে কি মনে করিয়াছ? আমি কি সর্ব্বশক্তিমান? পরীক্ষা দিতে পারে নাই, আমি ইহাকে পাশ করাইয়া দিব কিরূপে? তুমিই একটা উপায় বলিয়া দাও না।" যুবক বলিল—"উপায় আপনি না করিলে, আমি কি করিয়া উপায় বলিয়া দিব? আপনার কাছে আসার অর্থ, যদি কোন উপায় থাকে তবে এই খানেই পাইব।"

হঠাৎ আশুবাবুর মুখে প্রসন্নতার ঔজ্জ্বল্য খেলিয়া গেল। তিনি বালকটির কাঁধে হাত দিয়া একটা মৃদু চাপড় মারিলেন এবং বলিলেন—"আচ্ছা, তোমার উপায় ঠিক হইবে। দেখ, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কিন্তু আই-এ হয় নাই, তুমি আই-এ'র বাঙ্গলা পরীক্ষা দাও। এ-পরীক্ষায়ও কোন নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক নাই। অবশ্য ম্যাট্রিক হইতে আই-এ'র বাঙ্গলা-পরীক্ষা একটু কঠিন, তাহাতে তোমার পাশের বাধা হইবে না। তুমি আজই আমার নিকট দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া যাও, তাহাতে বলো যে, জ্বরের জন্য ম্যাট্রিকের বাঙ্গলার দিন উপস্থিত হইতে পার নাই, আই-এ'র বাঙ্গলার পরীক্ষা দিবে। তুমি যখন কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে চাহিতেছ, তখন সিণ্ডিকেট্ অবশ্যই তোমার আবেদন মঞ্জুর করিবেন।"

সেই বার আমি আই-এ'র বাঙ্গলার প্রধান পরীক্ষক ছিলাম। সিণ্ডিকেট হইতে একটি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর রোল আমার নিকট আসিল, তৎসহ সিণ্ডিকেট আমায় আদেশ করিয়াছেন যে, একখানি ম্যাট্রিকের কাগজ যেন আমি আই-এ'র প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নম্বর দেই। সেই ছেলেটি দ্বিতীয় বিভাগে সেবার ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিল।

এই যে অপূর্ব্বরূপে উদ্ভাবিত উপায়ে আশুবাবু বালকটিকে উদ্ধার করিয়া দিলেন, তাহা একদিকে যেরূপ তাঁহার মস্তিষ্কের উপায়-উদ্ভাবনী-শক্তি প্রমাণ করে, অপর দিকে তাহা তাঁহার পরদুঃখ-কাতর, দয়ার্দ্র,

মহানুভবতার পরিচায়ক। এই উদ্ভাবনা যতটা তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল, ততোধিক উহা তাঁহার হৃদয় হইতে আসিয়াছিল।

আর একটি দৃষ্টান্ত

আর একটি দিনের কথা। একদিন প্রাতে আমি তাঁহার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময়ে এক জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লাঠিভর করিয়া আশুবাবুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। আশুবাবু তাঁহাকে বসিতে বলিলেন, তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আমার একটি ছেলে এবার ম্যাট্রিক দিয়াছে, অঙ্কে অল্প কয়েক নম্বরের জন্য সে ফেল করিয়াছে এইরূপ শুনিয়াছি। আপনি এই কয়েকটি বাড়াইয়া দিয়া উপকার করুন।"

আশুবাবুকে এইরূপ উৎপাত যে কত সহ্য করিতে হইত, তাহা গণিয়া সংখ্যা করা অসাধ্য। এই দুর্দ্দশাপন্ন বাঙ্গালীর মধ্যে যদি কাহারও উপকার করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তির খ্যাতি রটিয়া যায়, তবে তাঁহার আর নিস্তার নাই। শ্রাদ্ধের দিনে বড় মানুষের দ্বারে ভিক্ষুকের অবিশ্রান্ত ভিড়ের ন্যায়ই এক বিপরীত জনতা প্রতিদিন আশুবাবুর গৃহে জমিয়া যাইত। তাহার উপর আবার অবারিত দ্বার, এবং প্রবেশ, নিষ্ক্রামণ ও দেখা-সাক্ষাতের কোন বাধাই নাই। মধুচক্রের নিকট মৌমাছির ভন্‌ভনানির ন্যায় প্রার্থীদের অবিরত গুঞ্জনে গৃহখানি মুখরিত হইত। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কোন ব্যক্তিই মেজাজ ঠিক রাখিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিতে পারেন না; আশুবাবু বাঙ্গলার ব্যাঘ্র—তাঁহার প্রকৃতি মাঝে মাঝে যে উগ্র হইয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া আশুবাবু বলিলেন—"বহুদূর হইতে বোধ হয় আসিয়াছেন। আপনার আদরের দুলাল ছেলেটি সারা বৎসর ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়াইয়াছে, এখন ফেল করিয়াছে, আশু মুখুজ্জেকে এবার তাহাকে পাশ করাইয়া দিতে হইবে। আশুবাবুর হাতে যেন সকল শক্তিই আছে,—তিনি মরা বাঁচাইতে পারেন,—যান্, যান্, আমার বিস্তর কাজ আছে,—আমার সময় নষ্ট করিবেন না।"

ব্রাহ্মণ নাছোড়-বান্দা,—কিছুতেই যাইবেন না। তিনি বলিলেন—"মহাশয়! আমাকে ছলনা করিবেন না, আমি জানি আপনি সকলই

করিতে পারেন। আমি বড় দুঃখী, এই একমাত্র পুত্র, সে ফেল হইলে আমার আর গতি নাই।"—এই বলিয়া তিনি আশুবাবুর পা ধরিতে গেলেন।

আশুবাবু এইবার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন—"ও কি করিতেছেন? আপনি চলিয়া যাউন।" ব্রাহ্মণ তবু ছাড়িবেন না, পুনঃপুনঃ আশুবাবুর অসীম ক্ষমতা ও তাঁহার নিজের দুরবস্থার কথা বিতং করিয়া বলিতে লাগিলেন। আশুবাবু বিষম উগ্র হইয়া উঠিলেন—"আপনি উঠুন, যান্। আমার দ্বারা আপনার কিছুই হইবে না।"

যতই আশুবাবু তাঁহাকে বিদায় করিবার জন্য আদেশ করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণ ততই শক্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া কাকুতি-মিনতি ও স্তোকবাক্য বলিয়া আশুবাবুর মন আর্দ্র করিতে প্রয়াসী হইতেছিলেন। অবশেষে তাঁহার অসহ্য হইল, তিনি রোষ-স্ফুরিতাধরে বলিলেন—"ইহার পর যদি এরূপ অভিনয় চালান, তবে আমি দরোয়ান দিয়া এখনই আপনাকে তাড়াইয়া দিব।" বৃদ্ধ তথাপি উঠিলেন না,—আশুবাবু 'দরোয়ান', 'দরোয়ান' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ প্রস্রবণের মত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রুর প্রবাহ ছুটিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"আমি একজন পোষ্টমাষ্টার, এবার অবসর হইয়াছে, অতি অল্প পেন্সন পাইয়াছি,—তাহাতে আমার পরিবার বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। একমাত্র পুত্রটিকে আমাদের বড়-সাহেবের নিকট লইয়া যাইয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছেন,—'যদি এবার ছেলেটি ম্যাট্রিক পাশ করিতে পারে, তবে তাহাকে একটি চাকরি দিব।' নিতান্ত অন্নকষ্টে পড়িয়া আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম।

দয়ার অবতার

লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম,—আপনি দয়ার অবতার, সকলের উপকার করিয়া থাকেন; আপনার যা' দয়া, তাহা তো চোখের উপর দেখিলাম। আমি বহুদূর হইতে না খাইয়া-দাইয়া, ঈশ্বরের নাম জপ করিতে করিতে আসিয়াছিলাম,—যাহা পাইলাম, যাহা আপনি দিলেন, তাহা তো বুঝিলাম; এখন দরোয়ানের হাতে গলা-ধাক্কা খাইয়া আমাকে এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে। আপনি হয়ত সত্যই দয়াবান, তাহা না

হইলে দেশময় আপনার এ খ্যাতি রটিয়াছে কেন? দৈব আমার প্রতিকূল, নতুবা অপানাকে দয়াল বেশে না দেখিয়া এই রুদ্র-ভৈরব-রূপে দেখিব কেন? হা ভগবান্! আমার জীবন শেষ করিয়া দাও, কষ্টের চূড়ান্ত, অপমানের চূড়ান্ত হইয়াছে, আর কেন।" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রাহ্মণ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই শোকার্ত্ত মূর্ত্তি ও অজস্র অশ্রু দেখিয়া আশুবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তিনি গমনোদ্যত বৃদ্ধকে বসিতে বলিলেন এবং কহিলেন—"বসুন, বসুন, এত বিচলিত হইবেন না,—যদি ফেল-করা ছাত্রকে পাশ করার আইন থাকিত,—তবে আমি আপনার উপকার করিতাম, কিন্তু আমি কি করিব?"—এই বলিয়া চাকরকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণের জন্য খাবার আনাইলেন ও তাঁহাকে তাহা খাইতে বাধ্য করিলেন। এবার তাঁহার আর উগ্র মূর্ত্তি নাই—চোখে মুখে প্রসন্নতা ফিরিয়াছে। ব্রাহ্মণের ভোজনের মাত্রা দেখিয়া খুসী হইয়া তিনি বলিলেন—"দিন্, দিন্, আপনার ছেলের রোল-নম্বরটি দিন্, যদি কিছু করিতে পারি, চেষ্টা করিয়া দেখিব।" বৃদ্ধ হাতে স্বর্গ পাইলেন, তিনি কম্পিত হস্তে উত্তরীয়-প্রান্তের গেরো খুলিয়া ছেলের রোল-নম্বরযুক্ত এক টুকরা কাগজ আশুবাবুর হাতে দিলেন, তিনি তাহা টুকিয়া রাখিলেন।

এই দুঃস্থ সমাজের উদ্ধার কিসে হইবে?

ব্রাহ্মণ চলিয়া যাওয়ার পরে আশুবাবু বলিলেন,—"এই বৃদ্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মণের যে অবস্থা, আজকালকার বহু অভিভাবকের তাহাই। এই দুঃস্থ সমাজের উদ্ধার কিসে হইবে, জানি না।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছেলেটির সম্বন্ধে আশুবাবু কি করিয়াছিলেন, তাহা কোন খোঁজ লই নাই, তবে তাহার পাশের কোন সম্ভাবনা থাকিলে আশুবাবু নিশ্চয়ই তাহার উপকার করিয়াছেন,—ইহাই আমার বিশ্বাস।

লোকে বলে আশুবাবু তোষামুদীতে বশীভূত হইতেন। অবশ্য নিজে প্রশংসা যদি কেহ করে, তবে তাহা শুনিতে মিষ্ট শুনায়,—সকলের পক্ষে ইহা সত্য; কিন্তু আশুবাবুর গুণরাশি এত বেশী ও অনন্য-সাধারণ ছিল যে, তিনি পরের প্রশংসার কোন তোয়াক্কা রাখিতেন না। তিনি প্রশং

বা হাত-তালি পাইবার জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। যাহা নিজে ভাল বোধ করিয়াছেন, কাহারও মতামত গ্রাহ্য না করিয়া তিনি তাহাই করিয়াছেন,—এ অবস্থায় সাধারণ লোকের মত পরের নিন্দা-প্রশংসা তাঁহার জীয়ন-মরণ কাঠি হয় নাই। অথচ আমি তাঁহাকে যে

তোষামোদের বশ

২৪ বৎসর দেখিয়াছি,—এই দীর্ঘ কালের পরিচয়ে তাঁহার উপর আমার অন্যরূপ ধারণাই হইয়াছে। কেহ তাঁহার কাছে তাঁহার গুণ-গরিমা বর্ণনা করিবার সাহসই পাইত না। এমন শিক্ষিত লোক বঙ্গদেশে বিরল, যাঁহারা আশুবাবুর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ খোঁজেন নাই। বহু লোকই তাঁহার অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁহার বিশ্বস্ত ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন, অন্য সকলের সে সৌভাগ্য হয় নাই। এই দুর্ভাগার দল তাঁহারা তোষামোদ-প্রিয়তার কুৎসা প্রচার করিয়াছেন। আমি একজন অধ্যাপককে জানি, তিনি আশুবাবুর সহিত দেখা করিয়া স্বীয় বাটীতে ফিরিতেছিলেন; তাঁহার এক বন্ধু ট্রামে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দক্ষিণ মুল্লুক হইতে ফিরিতেছেন, আশুবাবুর বাটীতে গিয়াছিলেন না-কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি উষ্ণ হইয়া বলিলেন—"আমাকে কি আপনি আশুতোষের খোশামুদে ঠাওরাইয়াছেন? আমি তাঁহার বাড়ীতে কেন যাইব?" বন্ধু বলিলেন—"তাঁহার বাড়ীতে গেলেই কি তাঁহার খোশামুদে হইতে হয়?" তিনি বলিলেন—"না মহাশয়, আমি কোন খোশামোদ-প্রিয় বড়লোকের বাড়ীতে যাই না।" তারপর বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, তিনি তাঁহার কোন গুরুতর স্বার্থের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া সেই ট্রামেই আশুবাবুর বাড়ী হইতে ফিরিতেছিলেন। অধ্যাপকটি এখন পরলোকগত, কিন্তু এই ঘটনাটি উল্টাডাঙ্গার পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় অবগত আছেন।

তোষামোদ-প্রিয়তা দূরের কথা, তাঁহার দোষ ধরিয়া, গালাগালি করিয়া লোককে তাঁহার নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে আমি দেখিয়াছি। ছাত্রদের মধ্যে যাহারা কোন আবেদন-নিবেদন লইয়া গিয়াছে, তাহাদের কাকুতি-মিনতি অনেক সময়েই তিনি শোনেন নাই। কিন্তু কোন কোন তেজস্বী ছাত্র তাঁহার সঙ্গে বিরুদ্ধ তর্কে বহুক্ষণ ধরিয়া স্বীয় মনস্বিতা দেখাইয়া সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অন্য বড় লোকেরা কথা-কাটাকাটি অনেক সময় ভালবাসেন না; কিন্তু আশুবাবু ভিন্ন তন্ত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যদি বহু ক্ষণ ধরিয়া কেহ তর্ক করিত এবং তাঁহার ভুল দেখাইতে চেষ্টা করিত, তবে তিনি মনে মনে খুসী হইতেন। তিনি ছিলেন গুণজ্ঞ, গুণের পক্ষপাতী। একদিন দল বাঁধিয়া কতকগুলি ছাত্র তাঁহার নিকট তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রার্থনা লইয়া আসিল; তন্মধ্যে একটি সুদর্শন, মনস্বী ছেলে তাঁহার সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টাকাল তর্কের লড়াই চালাইল। আশুবাবু সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দিলেন এবং তাহারা চলিয়া গেলে আমাকে বলিলেন—"এই মেধাবী ছেলেটি উকিল হইলে খ্যাতি লাভ করিবে।"

গুণজ্ঞ ও গুণের পক্ষপাতী

ছাত্রদের পরম বন্ধু আশুতোষ সিনেট হলে সর্ব্বদা তাহাদিগকে সমর্থন করিতেন। বাঁকুড়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিচেল (?) সাহেব কোন সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"পূর্ব্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মর্য্যাদা ছিল, এখন আর তাহা নাই। ক্যালেণ্ডার খুঁজিয়া পাশ-ফেলের পার্সেণ্টেজের তারতম্য দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উচ্চ আদর্শ ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে। এই বিদ্যাশালার গ্রাজুয়েটদের এখন আর কোন সম্মানই নাই; নির্ব্বিচারে পাশের স্রোত চলিতেছে,—" ইত্যাদি।

পাশের সংখ্যা লইয়া কুৎসা-প্রচার

আশুবাবু গিরিশৃঙ্গের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইলেন,—সে মাথা যে সকলের অপেক্ষা উচ্চ ছিল, তাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমাদের পাশ-ফেলের সংখ্যা আলোচনা করার পূর্ব্বে বক্তা তাঁহার নিজের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাশ-ফেলের সংখ্যা একবার আলোচনা করিলে ভাল হয়। লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা আমাদের ছাত্রদের সংখ্যা হইতে শতকরা এখনও অনেক বেশী। আমি মনে করিতে পারি না যে, সেই দেশের ছেলেদের অপেক্ষা আমাদের দেশের ছেলেরা কম মেধাবী। আমি লক্ষ্য

করিয়াছি, আমাদের ছেলেদের এই সফলতায় অনেকে মনে মনে ক্ষুব্ধ; এই ক্ষোভের কারণ আমি মোটেই উপলব্ধি করিতে পারি না। বিশেষতঃ যাঁহারা কলেজের অধ্যক্ষ, ছাত্রদের শুভাশুভের সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদের এইরূপ মনোভাব আমার নিকট একেবারে দুর্ব্বোধ্য। উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে কোথায় তাঁহারা আনন্দিত হইবেন, তাহা না হইয়া যেন মুস্‌ড়িয়া পড়িতেছেন! এদেশে বাস করিয়া এদেশের ছেলেদের প্রতি এই বিদ্বিষ্টভাব তাঁহারা ত্যাগ করুন। নিজ দেশের উত্তীর্ণ ছেলেদের সম্বন্ধে তাঁহারা তো কোন দিন কিছু উচ্চবাচ্য করেন না।”

এই কথার উত্তর সেই অধ্যক্ষ মহাশয়ের মুখে আর জোগাইল না। আর একদিন এইরূপ সমালোচনার জন্য একটি প্রধান কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ মহাশয়ের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল,—দেখিয়াছিলাম আশুবাবুর প্রতিপক্ষ-দলের অনেক হোমড়া-চোমড়া সাহেব ও বাঙ্গালী পুনঃ পুনঃ আশুবাবুর ন্যায়-সঙ্গত যুক্তি ও তীক্ষ্ণ, মর্ম্মাঘাতী শরাঘাত সহ্য করিয়া শেষকালে তাঁহাকে উস্কাইয়া তুলিতে স্বতঃই ভয় পাইতেন। আশুবাবুর এই অসীম প্রতাপ সিনেট-সভায়, বোর্ডগুলির অধিবেশনে, ফ্যাকাল্‌টির সভায় সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; তখন মনে হইয়াছে তিনি এক-মুখ হইয়াও পঞ্চমুখ, দুইহস্তধারী হইলেও বহুহস্তধারী। এইরূপ অসম্ভব শক্তির বিকাশ দেখিয়াই পুরাণকারেরা দেব-দৈত্যের বহু শীর্ষ, বহু হস্ত এবং বহু চক্ষুর পরিকল্পনা করিয়াছেন।

বহু শীর্ষ, বহু হস্ত ও বহু চক্ষু

প্রতিপক্ষদিগকে অতিদর্পের সহিত প্রকাশ্য সভায় পরাভব করার এই শক্তি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছেন। কাউন্সিল-গৃহে ও সিনেট-হলে তিনি শিক্ষাবিভাগের কোন বড় সাহেবকে এরূপ নির্ভীকভাবে আঘাত দিয়াছিলেন, যাহার দাগ বহু দিন তাঁহার মন হইতে মুছিবার কথা নহে। এই সাহেবের বাঙ্গালী-সমাজে সুযশ ছিল না।

যাঁহারা এ দেশের শত্রু, ছাত্রদের হিত যাঁহারা দেখেন না, আশুবাবু তাঁহাদের বাহিরের ভদ্রবেশী মুখোসটা টানিয়া ফেলিয়া তাঁহাদের স্বরূপ চিনাইয়া দিতেন।

আশুতোষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রসঙ্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট-বিভাগ আশুতোষের প্রধান কীর্ত্তি। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি পরীক্ষাশালা মাত্র। এই প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা-সম্বন্ধে আইন-কানুন, পরীক্ষার্থীদের নাম, ধাম, সংখ্যা, কোন্ স্কুল, কলেজ হইতে কোন্ পরীক্ষা দেওয়া হয়, তাহার তালিকা, প্রশ্ন প্রস্তুত করা ও তাহা ছাপান, পাশের লিষ্ট—ইত্যাদি পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পাদিত হইত এবং সিনেট-সিণ্ডিকেট প্রধানতঃ এই সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলে বৃত্তি, পদক ও উপাধি প্রভৃতি বাৎসরিক কন্‌ভোকেশনে ভাইস্‌চ্যান্সেলর ঘোষণা করিতেন, এবং বড়লাট চ্যান্সেলর-স্বরূপ বৎসরের মধ্যে একবার কন্‌ভোকেশনে উপস্থিত হইয়া এই উৎসবের সৌষ্ঠব সাধন করিতেন। সিনেটের থামওয়ালা বড় একতলা বাড়ীটা এই সকল বিষয়ের জন্য সুপ্রচুর বলিয়া বিবেচিত হইত। সিনেটহলের সম্মুখ দিকের বামধারের গৃহে রেজিষ্ট্রার বসিতেন এবং কন্‌ভোকেশনের সময় লাটসাহেব সেই ঘরে যাইয়া তাঁহার বেশ বদলাইয়া বিদ্যায়তনের উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, সে রীতিটা অবশ্য এখনও আছে। দক্ষিণ দিকের কামরায় এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ রেজিষ্ট্রার বিরাজ করিতেন। সিনেট-হলের পশ্চিম দিকে ছোট-খাটো সভা-সমিতি হইত এবং বৎসর ভরিয়া অল্পসংখ্যক কেরাণীরা পরীক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ করিতেন।

কিন্তু নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় এক নূতন আকৃতি ধারণ করিল,—সহসা যেন স্বীয় মূর্ত্তি বদলাইয়া উহা এক বিরাট্‌রূপ ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে পঞ্চতল দ্বারভাঙ্গা-প্রাসাদ একতল সিনেট-গৃহের পশ্চাৎ আসিয়া দাঁড়াইল,—তার 'গগন-মণ্ডলে ঠেকে মাথার কিরীট।' শ্যামাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন,—১৯০৬ হইতে (যখন আশুতোষ ভাইস্‌চ্যান্সেলর হ'ন) ১৯২৪ সন—তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত, আশুবাবুর চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যাপকের সংখ্যা একটি

হইতে পঁচিশটি হইয়াছিল; পালিত সাহেব, ঘোষ সাহেব, খয়রার রাজা প্রভৃতি মহামনা ব্যক্তিদের বিরাট্ দান বিশ্ববিদ্যালয় আশুবাবুর চেষ্টায়ই পাইয়াছিলেন। তাঁহারা এই মানুষটির অমানুষী শক্তি দেখিয়া তাঁহার পূজার অর্ঘ্য-স্বরূপ এরূপ মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন। আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালবাসিতেন—মাতাকে যেরূপ শিশু ভালবাসে। শিশু যেখানে যে কাজ করে, তাহার মন পড়িয়া থাকে মায়ের দিকে। আশুবাবু অন্যান্য নানা স্থানে গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন,—এই কর্ম্মী পুরুষের কর্ম্মের অন্ত ছিল না, যেখানেই যখন কাজ করিতেন, সেইখানেই তাঁহার কর্ম্মের আদর্শ এত উচ্চ হইত যে, তিনি ছাড়া তথাকার কাজ একরূপ অচল হইত,—তথাপি তাঁহার অন্তঃকরণ পড়িয়া থাকিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে।

হয়ত বা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ও প্রকৃতিগত অনুরাগ-বশতঃ তিনি পাঠ্যাবস্থা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র ও জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্ত করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন। দেশ-বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও অপরাপর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস তাঁহার নখাগ্রে ছিল। ষ্টুডেণ্ট্‌শিপ্-পরীক্ষা দেওয়ার সময় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত পরীক্ষার প্রস্তাবিত একটা নিয়মের বিরুদ্ধে মস্ত-বড় একটা অভিমত লিখিয়া সিনেটের সদস্যদিগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই পত্রে ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি প্রথিতযশা সদস্যদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে জোরের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করিয়াছিলেন। তখনও তিনি তরুণ যুবক, পৃথিবীর কর্ম্মীদের মধ্যে তাঁহার আসন হয় নাই এবং সিনেট-সভার সঙ্গে সংশ্রব থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভাবিত ছিল না, তথাপি সমস্ত সাহেব-সদস্যের মতের প্রতিবাদটি সিনেটে গ্রাহ্য হইয়াছিল; 'তেজস্বীনাং ন বয়ঃসমীক্ষতে', অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছোট হইলেও তাহার দাহিকা-শক্তি সর্ব্বব্যাপী।

তরুণ বয়স হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে অনুরাগ

তখন প্রেমচাদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য 'আর্ট' ও 'সায়েন্স'—এই দুইটি বিষয়ে পরীক্ষা হইত। সায়েন্স-বিভাগের নিয়মাবলীর মধ্যে প্রস্তাব হইয়াছিল বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্রের বিলাতে যাইয়া তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া আসিতে হইবে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে বলা হইয়াছিল যে, ভারতে বিজ্ঞান-শিক্ষার যোগ্য কোন প্রতিষ্ঠানই নাই, শুধু পুস্তক-পড়া বিদ্যায় কোন ছাত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ

হইবে না। এদেশে লেবরেটরির এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্র প্রভৃতির একান্ত অভাব, এবং এমন কোন বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক এদেশে আসেন নাই, যাঁহার নিকট এদেশের ছাত্রগণ উন্নত শিক্ষার সুবিধা লাভ করিয়া তাহাদের পাঠ সম্পূর্ণ করিতে পারে। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার-ভোগী ছাত্রের—তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার জন্য—বিলাতে যাইয়া বড় বড় প্রতিষ্ঠানের লেবরেটরির সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যোগাযোগ এবং তথাকার খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সাঙ্গ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তিভোগীকে বিলাতে পাঠাইবার প্রস্তাব

আশুবাবু লিখিলেন,—এদেশে এখনও সামাজিক নিয়ম এত কঠোর যে, বহু মনস্বী ছাত্র বিলাতে যাওয়ার সর্ত্তে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইবে না। সামাজিক নিয়মগুলি ভাল কি মন্দ, তাহার বিচারের স্থল এ নহে, কিন্তু আমাদের হিন্দু-সমাজে এবিষয়ে সংস্কারবদ্ধ, কঠোর রীতি বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং যাঁহারা পরীক্ষা দিবেন, গুণাগুণ দেখিলে তাঁহারা তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র,—ভাল ছেলেরা এ বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ বাৎসরিক বৃত্তি মাত্র ১৬০০৲ টাকা। বিলাতে তিন বৎসর থাকিতে হইলে বৃত্তিভোগী ছাত্র সাকুল্যে ৪৮০০৲ টাকা পাইবেন। পড়াশুনা ও পুস্তকাদির খরচসহ অন্ততঃ ২৫০৲ মাসিক না পাইলে কোন ছাত্র বিলাতে যাইয়া সুবিধামত অধ্যয়ন করিতে পারিবেন না। ইহার উপর তাঁহার যাতায়াতের ব্যয় ২০০০৲ পড়িবে। সুতরাং সর্ব্বসমেত তাঁহাকে খরচ করিতে হইবে ১১০০০৲, বাকি ৬২০০৲ টাকার সংস্থান হইবে কিরূপে ?

বিলাত হইতে আসিয়া সেই ব্যক্তি এখানে লেবরেটরির অভাবে গবেষণা ও বিদ্যাচর্চ্চা করিতে পারিবেন না। যেখানেই তিনি কাজ করুন না কেন, য়ুরোপীয়দের বেতনের ⅔ অংশ মাত্র তিনি পাইবেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত অবস্থায় স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে হইবে, তাহাতে তাঁহার বিস্তর ব্যয়-বাহুল্য ও অসুবিধা—অথচ বিজ্ঞান-বিভাগ এখনও এদেশে এরূপভাবে গড়িয়া উঠে নাই যে, তিনি কোন যোগ্য পদ পাইয়া তাঁহার অধীত বিদ্যা-চর্চ্চার ক্রমোন্নতি করিতে পারিবেন।

এইরূপ ব্যক্তির অবস্থা শেষে যাহা হয়, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মিঃ এ, সি, সেনের বিষয়টির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বিলাতের সিরেণসেষ্টার কৃষি কলেজের শেষ পরীক্ষায় এত বেশী নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহা হইতে ১০০ নম্বর কম পাইলেন। পরীক্ষকেরা এক বাক্যে রিপোর্ট করিলেন যে, উক্ত কলেজের স্থাপনাবধি কোন ছাত্র এত বেশী নম্বর পান নাই এবং এরূপ গুণপনা দেখান নাই, অথচ অম্বিকাবাবু এদেশে আসিয়া কোন কাজই পাইলেন না। বোম্বাই কৃষি-কলেজে একটি কাজ ছিল, তাহা তাঁহার অপেক্ষা বহু পরিমাণে অল্প নম্বর-প্রাপ্ত সেই দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী সাহেবটিকে দেওয়া হইল এবং বহু লেখালেখির পরে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে ষ্ট্যাটুটিয়ারি সিভিলিয়ানের পদ প্রদানপূর্ব্বক শাসন বিভাগের একটি স্থানে তাঁহার জন্য জায়গা করিয়া দিয়া কোনরূপে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধন করিলেন। এই ভাবে বিলাতে ছাত্র পাঠাইয়া টাকা খরচ না করিয়া যদি কর্তৃপক্ষ বাস্তবিকই বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উন্নতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তবে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স-এসোসিয়েসনের লেবরেটরির উন্নতি করুন,—তাহা হইলে দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রকৃত বিস্তার ও পুষ্টি সাধিত হইবে।

আমি অতি সংক্ষেপে তাঁহার চিঠির মর্ম্ম সঙ্কলন করিলাম। হয়ত তাঁহার লেখাটা আজকালকার মাপ-কাঠিতে দোষ-বিবর্জ্জিত না হইতে পারে, কিন্তু সেই তরুণ বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-নিয়ম লইয়া তিনি এতটা মাথা ঘামাইতেন, ইহা কি তাঁহার চরিত্রের ও মনোভাবের একটা দিগ্‌দর্শনী নহে? উত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধি সঙ্কলন করিয়া যিনি ইহার বিধাতাপুরুষ-স্বরূপ হইয়াছিলেন, এই উদ্যম সেই প্রতিভার প্রাক্‌স্ফুরণ। সিনেটের অধিবেশনের পূর্ব্বে এই চিঠি আশুবাবু সদস্যদিগের হাতে হাতে বিলি করিয়াছিলেন। সেই চিঠির ফল ফলিল। বিজ্ঞান-বিভাগের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-পরীক্ষার্থীর বিলাতে যাওয়ার সর্ত্ত তুলিয়া দেওয়া হইল। অবশ্য আশুবাবু যে সময়ে চিঠিখানি লেখেন, সেই সময় হইতে এখন বিলাত-যাত্রা সম্বন্ধে সামাজিক কঠোরতা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পাঠ্যাবস্থা হইতেই আশুবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি যখন হাইকোর্টের জজিয়তি গ্রহণ করেন, তখনও তিনি তাঁহার মাতৃদেবীকে বলিয়াছিলেন—"এই পদ গ্রহণ করিলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা বেশী করিয়া করিতে পারিব।"

ওকালতীতে তাঁহার পসার-প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিনরাত্রি তাঁহাকে মক্কেলের কাজ লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতে হইত, তাঁহার মন ছিল তাঁহার *Alma Mater*এর দিকে, শিশুর মন যেরূপ পড়িয়া থাকে মাতৃ-স্তন্যের দিকে।

এই অনুরাগ, বিরাট্ প্রতিভার এই অনন্যমনা সাধনা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় অপর সকলকেও অভিভূত করিয়াছিল। যাঁহারা কখনই বদান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন না,—এবং জড় সভ্যতার সমস্ত বিলাস-সম্ভারে যাঁহাদের গৃহ রাজ-প্রাসাদোপম হইয়াছিল, তাঁহারা আশুবাবুর এই জ্বলন্ত অনুরাগ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না।

সরলা দেবীর দ্বারা পরিচিত হইয়া আমি একদিন মহামনা টি, পালিত মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলাম; তিনি আমাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার গৃহের আসবাব দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার রাজোপম শয্যার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এই দেখুন, পায়ের দিকে 'স্যুইচ্',—যদি কোন গভীর রাত্রে কিছু দেখিতে হয়, তবে পায়ের অঙ্গুলী দিয়া টিপিলেই অমনি পায়ের পাশে আলো জ্বলিয়া উঠিবে। এই দেখুন, দক্ষিণ ও বাম হাতের কাছে ঐরূপ 'স্যুইচ্' আছে। এই শয্যাটির মধ্যে বিজলীবাতির এরূপ ব্যবস্থা আছে, যেন তাহা মাকড়সার জাল,—শুইয়া শুইয়া স্যুইচ্ টিপিলে, শুধু শয্যার পার্শ্বের অংশ নহে, এই গৃহের দূর-দূরান্তর পর্য্যন্ত দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।" যখন তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন, তখন হইতে প্রায় ৩০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে এবং তখন ঘরে ঘরে বিজলীবাতির এইরূপ ছড়াছড়ি ছিল না। যিনি স্বয়ং মহাধনী ছিলেন এবং সেই মহাধনীর যোগ্য আসবাব ও দ্রব্যসমূহ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। আশুবাবুর যতির ন্যায় বিলাসশূন্য কঠোর আদর্শ ও প্রকৃত প্রেমিকের ন্যায় বিশ্বপ্লাবী

'এই দেখুন পায়ের দিকে স্যুইচ্'

অনুরাগ দেখিয়া এই প্রকার সম্পদশালী ব্যক্তি ও তাঁহার বহু-কষ্টার্জ্জিত লক্ষ লক্ষ টাকার তোড়া এবং সেই বিলাসের মন্দির দান করিয়া ফেলিলেন, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের জয় নহে, আশুবাবুর অনুরাগের জয়।

আশুতোষের প্রতিভা ও অনুরাগের জয়

তিনি যখন তাঁহার প্রিয়তম বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলিতে থাকিতেন, তখন তিনি যেন তাঁহার জ্বলন্ত অনুরাগের স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া যাইতেন,— জড় কাঠের মধ্যেও যেন সে আগুন ধরিয়া যাইত।

আশুবাবুর সুমহতী কীর্ত্তি—বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা। এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই তিনটি কেরাণী লইয়া রেজিষ্ট্রার সাহেব কাজ করিতেন। ১৯০৪ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িয়া ১৫০-এ দাঁড়াইল, একজন অধ্যাপকের স্থলে এই সময়ের মধ্যে ২৫ জন হইলেন। বন্যার জলস্রোতের মত অজস্র দান বিভিন্ন দিক্ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে লাগিল। পালিত ও ঘোষ যাহা দিলেন, সেরূপ মুক্তহস্ত বদান্যতা ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এ পর্য্যন্ত পাইবার সৌভাগ্য হয় নাই। খয়রার রাজার সাড়ে পাঁচ লক্ষ, নির্ম্মলেন্দু ঘোষের স্মৃতি-রক্ষার্থ গিরিশবাবুর বিপুল অর্থ, খনি-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বহু মূল্য সম্পত্তি-দান, ভোলানাথ বড়ুয়ার দশহাজার টাকা,—এইরূপ ছোটবড় দানের তোড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণে আসিয়া ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। দিনাজপুরের বাবু তারকনাথ চৌধুরী মৈথিলীর

পোষ্টগ্রাজুয়েটের ব্যাপক গঠন

অধ্যাপকের পদের ব্যয়ভার বহন করিতেছেন,—এ বিষয়ে গবেষণার জন্য অর্থ দিতেছেন রাজা কীর্ত্তানন্দ সিংহ; মৈমনসিংহ-সেরপুরের জমিদার গোপালদাস চৌধুরী বাঙ্গলার জন্য প্রচুর অর্থ দিয়াছেন; শোণপুরের মহারাজা উড়িয়ার অধ্যাপকের পদের ব্যয় বহন করিতেছেন। এইরূপে বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অকুণ্ঠিত দানে উচ্চ শিক্ষা-বিস্তারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। যাদুকরের মন্ত্রপূত কাঠি দিয়া আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে ছিল আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা-বিভাগের দরজা যে কত দিক্ দিয়া খোলা হইল, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই; সেই দ্বার নিত্য নূতন জ্ঞানের পথে বঙ্গদেশীয় তরুণদিগকে আহ্বান করিল। তিনি একথা সহ্য করিতে পারিতেন না যে, ভারতীয় লোক তাঁহাদের নিজেদের

ইতিহাস-সম্বন্ধে, তাঁহাদের সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও প্রাদেশিক ভাষার বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মুখাপেক্ষী হইয়া সমুদ্রের ওপারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইবেন। আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে পথের পরিচয় লইয়া অন্ততঃ আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হইব, ইহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য, এবং স্বাভাবিক ইচ্ছা। মনস্বিতায় আমরা কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন নহি। তিনি পোষ্টগ্রাজুয়েটের সংস্কৃত বিভাগটিকে যথাসম্ভব পূর্ণ রূপ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বেদ, সাহিত্য, স্মৃতি, ভাষ্যের রীতি, উপনিষৎ, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় (প্রাচীন), বৈশেষিক, দর্শন, প্রাকৃত এবং লিপি-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের অনেকাংশ পালি ভাষায় বিরচিত; এই পালি-শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইল, পালি শিক্ষার চারিটি বিভাগ হইল,—সাহিত্য, দর্শন, লিপিতত্ত্ব ও মহাযান-মত।

ইস্‌লামের জন্যও তিনি শিক্ষার সু-উচ্চ তোরণের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া গিয়াছেন; মুস্লিম ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র, কাব্যাদর্শ, ব্যাকরণ এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি পৃথক পৃথক বিষয়ে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এসিয়ার লোক তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য কেন সপ্ত সিন্ধু অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দেশে যাইবেন? তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার ঐকান্তিকী সাধনার পথ ধরিয়া এমন দিন আসিবে, যেদিন কলিকাতার বাজারে যেরূপ নানা দেশীয় লোক বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকে, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের এই মহাবিপণিতেও তেমনই সমগ্র জগতের না হোক, অন্ততঃপক্ষে সমস্ত এসিয়ার লোক বহুমূল্য রত্নের আশায় মিলিত হইবে। তাঁহার বিশাল মস্তিষ্ক এই উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল এবং এই সঙ্কল্প কর্ম্মক্ষেত্রে ফলপ্রসূ করিবার যোগ্য দুর্জ্জয় সাহস এবং অটল উদ্যম-পরিপূর্ণ হৃদয় এবং দুর্ব্বার শক্তিশালী বাহু তাঁহার ছিল।

বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ সহস্র-সহস্র সংস্কৃত-গ্রন্থ লইয়া এক সময়ে এ দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন; তিব্বতীয় ভাষায় তাঁহারা ভারতীয় অনেক পুরাতত্ত্ব লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আশুতোষ বিখ্যাত তিব্বতীয় পণ্ডিত গেসি লোব্রাং টারজিকে বহু চেষ্টায় আনয়ন করিয়া তিব্বতীয় ভাষাতে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহযোগে সেই ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া-

ছিলেন। গেসি স্বদেশে চলিয়া গেলে তিনি আর দুইজন লামার সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের পুত্র তাঁহার পিতার বহু-মূল্য তিব্বতীয় গ্রন্থের সংগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপহার করিয়াছিলেন। এখন আমাদের পুঁথি-শালায় বহু তিব্বতীয় গ্রন্থ রক্ষিত আছে; শুধু শরৎবাবুর গ্রন্থগুলিই ৪০ হাজার পৃষ্ঠা-ব্যাপী। লামার দেশের ইতিহাস, ন্যায়, ব্যাকরণ, ভিষক-শাস্ত্র, জ্যোতিষ, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অপরাপর বিষয়ক বহু গ্রন্থ এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ তাঁহাদের সুন্দর কাষ্ঠ-ফলক দ্বারা মুদ্রিত গ্রন্থগুলি। চীন এবং জাপানের ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে তিনি কিমুরা প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ, তিনি বাঙ্গলা ভিন্ন হিন্দী, মৈথিলী, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন সাহিত্য-পরিচয় সঙ্কলন করাইয়াছিলেন।

এইভাবে উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ২০টি বিভাগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিভাগের পরিকল্পনা তাঁহার মনোরাজ্যে জন্মলাভ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তিনি জানিতেন, দেশের লোকের প্রাণের সহিত যোগ না রাখিলে এই বিদ্যায়তনের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি তিনি জনসাধারণের চিত্তে প্রোথিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এ দেশের ভাষা, এ দেশের ইতিহাস যাহাতে এ দেশের জনসাধারণ অনুশীলন করিয়া জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। জ্ঞানকে রাজমুকুটের মত উর্দ্ধে স্থাপন করিয়া তাহা দুর্নিরীক্ষ্য একটা বাহ্য সম্পদ করিয়া রাখিতে তিনি চান নাই,—তাহা সর্ব্বলোক-অধিগম্য করিতে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্ব-লোকপ্রিয় করিতে তিনি চাহিয়াছিলেন। এই মহাপ্রতিষ্ঠানটি যেন সকলের সমবেত চেষ্টায় গড়িয়া উঠিতে পারে,—ইহাই তাঁহার কাম্য ছিল।

উচ্চশিক্ষার কলাবিভাগে (Arts বিভাগে) যে ২০টি বিষয়ের আলোচনা ইহার পূর্ব্বে হইয়াছে, তাহা এই—ইংরাজী, সংস্কৃত, পালি, আরবী, পারসী, ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহ, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, দর্শন,

নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্র-নীতি, বাণিজ্য-বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, শরীর-তত্ত্ব, ভূ-নিম্নতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব প্রভৃতি,—বিজ্ঞান-বিভাগে রসায়ন-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, উচ্চতর গণিত-শাস্ত্র, জড়-বিজ্ঞান প্রভৃতি। এই সমস্ত বিভাগেই তরুণগণ যে মৌলিক গবেষণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে নব্য বঙ্গের কৃতিত্ব দেশময় প্রচারিত হইতে লাগিল। আশুবাবু পরম উল্লাসের সঙ্গে তাঁহাদের সফলতার কথা কন্‌ভোকেশনের বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে,—মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে,—তিনি বলিয়াছিলেন—"য়ুরোপ এবং আমেরিকার সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে ইঁহারা সম্মান পাইতেছেন।" 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন', 'য়্যাষ্ট্রো ফিজিক্যাল জার্ণাল', 'দি ফিজিক্যাল রিভিউ', 'দি ইণ্ডিয়ান য়্যান্টিকুয়্যারি', 'দি জার্ণাল অব্ দি এসিয়াটিক সোসাইটি', 'দি বুলেটিন অব্ ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটি', 'ট্রান্‌জাক্‌শন্‌স্ অব্ টোহোকু ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটি', 'জার্ণাল অব্ য়্যামেরিকান্ কেমিকাল সোসাইটি', 'জার্ণাল অব্ লণ্ডন কেমিকাল সোসাইটি', 'প্রসিডিংস্ অব্ দি রয়াল সোসাইটি অব্ লণ্ডন', 'ট্রান্‌জাক্‌শন্‌স্ অব্ দি ফ্যারাডে সোসাইটি', 'প্রসিডিংস্ অব্ দি ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েসন্ ফর্ দি কাল্‌টিভেশন অব্ সায়েন্স' প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পত্রিকাসমূহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের উচ্চতর গবেষণামূলক, মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে,—শিক্ষা-প্রচেষ্টার এই সফলতায় যে তিনি কত গৌরব বোধ করিতেন, তাহা যিনি মহৎ কিছু গড়িয়া তোলেন, একমাত্র তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

যে ভারতবর্ষ চিরকাল জগদ্‌গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া জ্ঞান-রাজ্যে কর্তৃত্ব করিবার অধিকারের দাবী রাখিয়াছে, সেই ভারতবর্ষ এখন হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া পশ্চিমের দুয়ারে চিরকাল কাঙ্গালের বেশে শিষ্যত্ব করিয়া বেড়াইবে, এই হীনতা তাঁহার কাছে দুঃসহ বোধ হইয়াছিল। তিনি এই দেশকে আবার জ্ঞান-রাজ্যের অধীশ্বরের আসন দিবেন,—এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। জগতের চক্ষে আবার ভারতবাসী বড় হইবে, পাশ্চাত্ত্য মনস্বীদের পার্শ্বে গুরুর বেশে না হউক, অন্ততঃ সমকক্ষতা করিয়া গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইবে,—এই সঙ্কল্প লইয়া তিনি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন। এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা-কেন্দ্ররূপে—পাশ্চাত্ত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ-আসন না হউক—একাসন লাভ করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য।

যে সকল অধ্যাপক ও গুণী ব্যক্তিরা জগত জুড়িয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন,—যাঁহাদের পুস্তক পড়িয়া আমরা তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-দর্শনে বিস্মিত হই, তাঁহাদিগকে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আনাইয়া বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করিরাছিলেন। সেই সুদূর ভল্লুকের বাস, রাসিয়া হইতে ব্যবহার-শাস্ত্রের গুরু ভিনোগ্রেডফ্ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব বক্তৃতা দ্বারা বাঙ্গলার আইনের পণ্ডিতদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এ দেশের প্রবীণ ব্যবহার-জীবীদের নিকট আইন-শাস্ত্রের অনেক কূট রহস্য এবং সমস্যার সমাধান হইয়াছিল। চারু-শিল্প ও প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য-কলাবিৎ ফরাসী ফুসে (Foucher) সিনেট-হলে দাঁড়াইয়া ভারতীয় ও ভারত-মহাসাগরের দ্বীপ-সমূহের শিল্প-রীতি যে ব্যাক্‌ট্রিয়া হইতে গ্রীক্-রীতিদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে, তাহা বোর্ডের উপর ছবির সাহায্যে ও Lantern-বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন।

বিদেশীয় পণ্ডিতদের আগমন

আমরা যদিও তাঁহার মত মানিয়া লই নাই, এবং এখন অবশ্য মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, সিঙ্গানপুর প্রভৃতি স্থানের ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের শিল্প ও ভাস্কর্য্যের দ্বারা তাঁহার মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে, তথাপি এই মহাপণ্ডিত যখন মাগধী শিল্প হইতে অমরাবতী, খেজুরাহ, ভুবনেশ্বর, সিংহল, অজন্তা, কাম্বোজ, প্রম্বনম্ ও বরোবদোর পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতীয় শিল্পের ধারায় গ্রীক্-প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পাণ্ডিত্য ও আজীবন সাধনার ফল-দর্শনে শ্রোতৃবর্গের মনে বিস্ময়ের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক, এ পর্য্যন্ত নামে মাত্র পরিজ্ঞাত এবং গ্রন্থ-সূত্রে পরিচিত, সুবিখ্যাত ম্যাকৃডোনেল (Macdonell) আসিলেন এখানে বক্তৃতা করিতে। প্রাচ্যবিদ্যার অগাধ পণ্ডিত ডাঃ সিল্‌ভ্যাঁ লেভি প্যারিস্-রাজধানীর আরামপ্রদ পাঠ-কক্ষ ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে আসিলেন কলিকাতা মহানগরীতে আশুতোষের আহ্বানে। আর

আসিলেন স্যার এণ্ড্রু রাসেল ফরসিথ্ (Sir Andrew Russel Forsyth), হেন্‌রি এডোয়ার্ড আর্‌মষ্ট্রং, পণ্ডিত-প্রবর ডাঃ গিলবার্ট টমাস ওয়াকার, জার্ম্মান পণ্ডিত জেকবি,—তিনি কীটের মত ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের রহস্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং টুলো পণ্ডিতের মত ব্যবহারে ও পরিচ্ছদে একান্ত সরল এবং অনাড়ম্বর ছিলেন। ডাক্তার থিবো ভারতে আর্য্য-নিবাস-সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা আজও কানে বাজিতেছে। প্রফেসর ওল্ডেন্‌বর্গ্, উইণ্টারনিজ্, আর্থার স্যুষ্টার—ইঁহারা এক একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত; প্রাতঃকালে ইঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া অধ্যয়নে মনো-নিবেশ করিলে ছাত্রদের তপস্যা সিদ্ধ হয় ও দেবী ভারতীর কৃপালাভে বিলম্ব হয় না। কি আনন্দে তিনি দেখিলেন, জগতের পূজনীয় পণ্ডিতেরা তাঁহার আহ্বানে আন্তরিকতার সহিত সাড়া দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ তাঁহাদের পদধূলিতে পবিত্র করিতেছেন! কি আনন্দে দেখিলেন, ইঁহাদের আবির্ভাবে সমস্ত বাঙ্গালা জুড়িয়া তরুণদের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রেরণা জাগিয়াছে,—ডাঃ ষ্টেলা ক্র্যাম্‌রিশের বক্তৃতায় কলা-শিল্পের প্রতি নব-দৃষ্টি সঞ্চারিত হইতেছে, ওয়েল্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন্ ম্যাকেঞ্জীর বক্তৃতায় শিক্ষা সম্বন্ধে নানা জটিল প্রশ্ন সহজ আকার ধারণ করিয়াছে এবং নেব্রাস্কার অধ্যাপক বাকের কথায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আমেরিকার শিক্ষা-পদ্ধতি-সম্বন্ধে অবহিত হইতেছেন!

ইহা হইতেও বিপুলতর আনন্দের সহিত তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, ভারতীয় লোকেরা গবেষণার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের সমকক্ষতা করিতে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা নানা বিচিত্র বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। ভারতীয় বর্ণমালার উদ্ভব, বায়ু-স্তরের আন্দোলন, প্রাচীন ভারতে নগর-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি, স্পর্শ-বিষয়ে মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ে তাঁহারা দুই-একটি নূতন কথা বলিতেছেন এবং ডাঃ রমন্, ডাঃ গাঙ্গুলী, ডাঃ বড়ুয়া, ডাঃ মুখার্জ্জী, ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি বহু মনীষী ভারতবাসীর কৃতিত্ব সর্ব্ববাদী-সম্মত হইতেছে! স্থপতি-বিদ্যা, চিত্র-কলা, বিজ্ঞানের উচ্চস্তরের অনুশীলন প্রভৃতি কত বিষয়ে যে

তিনি এ দেশের ছাত্রদিগকে প্রেরণা দিয়াছেন, তাহা বলিবার নহে। কুমার শরৎকুমার রায়ের অর্থ-সাহায্যে ও প্রগাঢ় চেষ্টার ফলে যে পাহাড়পুরের সোমবিহার আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অগ্রসর হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা প্রদান করিয়া সেই অক্ষয়-কীর্ত্তিকে বাঙ্গলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইতিহাস-বিভাগে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র সুপ্রসারিত ছিল। নৃতত্ত্ব-বিভাগে রাওবাহাদুর অনন্তকৃষ্ণ আয়ারের পরিচালনায় তিনি মৌলিক গবেষণার ভিত্তি গড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে লিখিতে গেলে 'পুঁথি যাবে বেড়ে' ; সে স্থান ও সময় আমাদের নাই।

বিবিধ দেশবাসী, বিবিধ জাতি

জ্ঞান-পথের পান্থের জাতিভেদ নাই, বর্ণ-বিচার নাই, কোনরূপ ভেদ-বৈষম্য নাই ; ইস্‌লামের মৌলভী, বৌদ্ধের ফুঙ্গী, হিন্দুর ভট্টাচার্য্য ও খৃষ্টানের পাদ্রী,—যিনি যেখানে ছিলেন, আশুতোষের আহ্বানে ছুটিয়া আসিয়া কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে ভিড় করিয়াছেন। দীর্ঘাকৃতি, সুদর্শন, বিচিত্র বর্ণের পাগড়ী মাথায়, পক্ষীর পক্ষ-পুটের ন্যায় গুম্ফধারী, মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত, ডি, আর, ভাণ্ডারকর,—গেরুয়া রঙ্গের আলখাল্লা পরিহিত, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, সিংহলী পণ্ডিত রেভারেণ্ড সিদ্ধার্থ,—ত্রিবাঙ্কুরের নিকটবর্ত্তী কোনপুলী নিবাসী রাও অনন্তকৃষ্ণ,—হিন্দী পণ্ডিত ভাগবত সহায়,—ত্রিপুণ্ড্রক ললাটী কাশীর পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী, খর্ব্বাকৃতি, সাদা পাগড়ী মাথায়, মৈথিলী অধ্যাপক বাবুয়া মিশ্র,—সাহেবী পরিচ্ছদ-পরিহিত, প্রয়াগবাসী, অঙ্কের অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ,—দীর্ঘাকৃতি, সাদাপাগড়ী যুক্ত, কোট-প্যান্টালুন-পরিহিত মাদ্রাজী অধ্যাপক সি, ভি, রমন্,—ক্ষীণদেহ, বিপুল সাদাপাগড়ী, দীর্ঘকোট এবং ধুতি পরিহিত রাধা কৃষ্ণন্,—পার্শী জাতীয় পণ্ডিতপ্রবর তারাপুরওয়ালা,—রজতগিরিসন্নিভ, বিশাল-কায় পারস্যদেশবাসী সিরাজী,—জাপানী ও চীনা পণ্ডিত মাসুদা ও কিমুরা,—বহু প্রবীণ, অগাধ পাণ্ডিত্যশালী, ইংরাজী অধ্যাপক ষ্টিফেন,—অঙ্কের অধ্যাপক কালিস্—জার্ম্মান্ পণ্ডিত ব্রুল, প্রভৃতি কত দেশের কত পণ্ডিত যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কত লিখিব! যেমন কোন রাজাধিরাজের উৎসব-বাসরে কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, কর্ণাট, কাশ্মীর, বারাণসী নবদ্বীপ প্রভৃতি নানা দিগ্‌দেশ হইতে পণ্ডিতগণ আসিয়া

সভা উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করেন, আশুতোষ আমাদের এই বিদ্যায়তনে পণ্ডিতদের সেইরূপ এক হাট বসাইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, বাঙ্গলা-দেশকে তিনি প্রাণে প্রাণে ভালবাসিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতা ছিল না। বাঙ্গলা বাঙ্গালীর জন্য, বোম্বে বোম্বে-বাসীর জন্য, উড়িষ্যা উড়িয়ার জন্য, বিহার বিহারীর জন্য, আসাম আসামীর জন্য, এই সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতার কোন অবকাশ তিনি জ্ঞানের মন্দিরে রাখেন নাই। শিবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত কাশীর মত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অসভ্য পাহাড়িয়া জাতির লোক হইতে দেবকল্প, সুসভ্য ব্যক্তিদের অবাধ মিলনের পুণ্য-তীর্থ-স্বরূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই মহাতীর্থে সমস্ত জগৎকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের আহ্বানে প্রায় সমগ্র বিশ্বের প্রতিনিধিগণ আসিয়া সমবেত হইয়া এক মহা-মিলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কত রকমের ভাষা, কত রকমের পরিচ্ছদ, মঙ্গোলিয়ান্,—এরিয়ান, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি নানা বর্ণের, নানা উপাধির, নানা ভাষার পণ্ডিত দূর-দূরান্তর হইতে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, আশুতোষের এই বিশাল সারস্বত-কুঞ্জে শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শিক্ষা দিয়াছেন সত্য ; কিন্তু আশুবাবুর প্রাণময়ী বিদ্যাদায়িনী মূর্ত্তির পদতলে বসিয়া তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা যে শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের নিকট কম মূল্যবান্ হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত

সাম্রাজ্য-শাসনের সনন্দ

আছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন, যে ভগবান্ আশুতোষের ললাটে রাজটীকা আঁকিয়া দিয়াছিলেন,—তাঁহার মত নর-ব্যাঘ্র বা নর-শ্রেষ্ঠ জগতে সর্ব্বদা পাওয়া যায় না ;—স্যাড্‌লার সাহেব সত্যই বলিয়াছিলেন,—"কোন সাম্রাজ্য শাসন করিবার সনন্দ হাতে দিয়া ভগবান্ তাঁহাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

এখন ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের আনাগোণা হইতেছে ; কিন্তু আশুতোষ শিবের জটাবদ্ধ গঙ্গাধারার ন্যায় এই রীতি প্রাচ্যভূমে আনিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তিনিই সেই গঙ্গাপ্রবাহের পথ-প্রদর্শক ভগীরথ,—তাঁহারই অনুকরণ করিয়া পরবর্ত্তী খাল-নালা কাটা হইয়াছে।

এখানে আমি তাঁহার বিরাট্ উদ্যমের অতি সামান্য কয়েকটি বিষয়েরই আভাসে উল্লেখ করিলাম। তিনি ছাত্র-কল্যাণ-সমিতি স্থাপন করিয়া সন্ধান লইয়া দেখিলেন, বাঙ্গলার তরুণ যুবকেরা কিরূপে নীরবে ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। নীরোগ, সুস্থদেহ বাঙ্গালী ছাত্র অতি অল্প,—অধিকাংশই নিদারুণ রোগের কীটাণুদ্বারা আক্রান্ত; এই ধ্বংসের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি নানারূপ চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

ছাত্র-কল্যাণ-সমিতি

যাঁহারা বলেন,—এ জাতি বিষম অন্ন-সমস্যায় বিব্রত, এখানে উচ্চ শিক্ষার অবকাশ কোথায়? এই নিরন্ন, ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে বিদ্যার কিরীট-কুণ্ডল পরাইয়া কি লাভ হইবে? মৃত্যু-শয্যায় শয়ান ব্যক্তিকে মখ্‌মলের পরিচ্ছদের স্বপ্ন দেখাইয়া লাভ কি?—তাঁহাদের এই সকল নিরাশ এবং স্ত্রীজনোচিত কাতরোক্তি তিনি পছন্দ করিতেন না। আশুতোষ ছিলেন পুরুষকারের জ্বলন্ত বিগ্রহ। রোগ হইয়াছে বলিয়া কি তিনি রোগীকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া দেওয়ার কথা ভাবিতে পারেন? রোগী যে তাঁহার পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বদেশবাসী, অন্তরঙ্গ। শুধু পেটে ভাত খাইয়া যে বাঙ্গালী জাতি বাঁচিয়া থাকিবে, এরূপ জীবনের জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন না; যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে গৌরবের সহিত বাঁচিতে হইবে। গৌরব-চ্যুত হইলে জীবন থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। যাহার হাতে একদিন কোহিনুর-কৌস্তুভ ছিল, তাহাকে এক পয়সা রোজগারের পন্থা দেখাইয়া দিয়া তিনি নিবৃত্ত হইবেন, এরূপ অল্পে সন্তুষ্ট হইবার লোক তিনি ছিলেন না।

আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু প্রাদেশিক একটা পাঠ-শালার মত গড়িতে চাহেন নাই; রাজাধিরাজ হইতে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলে এখান হইতে সসম্মানে ভারতীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন,—এই গৌরব তিনি ইহাকে দিতে প্রয়াসী ছিলেন। আমাদের মহামান্য সম্রাট্ আসিয়া এখান হইতে নত-মস্তকে উপাধি গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। লর্ড রোলাণ্ড্সের মত লাট আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট যে উপাধি পাইয়াছেন, তাহা গৌরবের সহিত এখনও বহন করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'স্যার'-উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত 'ডক্টর'-উপাধি শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে যেরূপ অবনীন্দ্র-

নাথ, ব্রজেন্দ্র শীল 'অনারারি ডক্টর'-উপাধি পাইয়াছেন, সেইরূপ ডি, আর, ভাণ্ডারকর, কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার, রুদ্রপত্ন শ্যাম শাস্ত্রী, পুরুষোত্তম পরাঞ্জপে, সৈয়দ আমির আলি, মোক্ষগন্দম্ বিশ্বেশ্বরায়া, সি, ভি, রমন্, হেনরি ষ্টিফেন, জন্ মার্শেল, সিলভ্যাঁ লেভি, আলেক্‌জাণ্ডার ক্রেগী, জ্যাক্‌সন্ পোপ, টমাস ওয়াকার, এড্‌মাণ্ড কালিস্ প্রভৃতি বিশ্ব-গুরুগণ সেই উপাধি লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

ভারতীর প্রসাদের এই পরিবেশনের অংশ পাইবার জন্য জগতের সমস্ত দিক্ হইতে হস্ত প্রসারিত হইয়াছিল। এই মহাকার্য্য কি সম্রাটের যোগ্য নহে? হে বৃষস্কন্ধ মহাভাগ, তোমার এই গুরু ভার-বহনের জন্য বাঙ্গালী জাতি যোগ্য হউক, ইহাই প্রার্থনা করি। তুমি তপস্বীর মত সাধনা করিয়াছ, সম্রাটের ন্যায় ব্যয় করিয়াছ এবং আদেশ করিয়াছ, মজুরের মত দিবারাত্রি অভেদে খাটিয়াছ! তোমার উদ্দেশ্য ছিল, তোমার জাতিকে মহোজ্জ্বল করিবে,—ইহাদিগকে জগতের এক কোণ-ঠাসা হইয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, কেরাণী, গুদাম-সরকার এবং দোকানের মুহুরী হইয়া বাজারের ফর্দ্দ হাতে করিয়া যেন জীবন যাপন করিতে না হয়, ইহারা যেন জগতের শ্রেষ্ঠ জাতির গৌরব লাভ করে। তাহাদের প্রতিভা ও মনীষা খনি-গর্ভে মণির ন্যায় আবর্জ্জনা ও ধূলি-কর্দ্দমে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহা পুনঃ উজ্জ্বল হইবে—তাহাতে তাঁহার সন্দেহ মাত্র ছিল না; তাই তিনি দৃঢ় বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন। আশুতোষ, তুমি যে হোম-বহ্নি জ্বালাইয়া গিয়াছ, তাহার পবিত্র ধূমে যেন বৃথা আশঙ্কা ও ভীরুতার সমস্ত ম্লানিমা ঘুচিয়া যায়, যেন আমরা তোমার স্বদেশবাসী বলিয়া গৌরব করিবার যোগ্য হইতে পারি।

আশুবাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ লিখিয়াছেন,—"তিনি ছিলেন ধ্যান-শীল,—" তিনি প্রকৃত যোগীর ন্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা তাঁহার ধ্যানের মধ্যেই পাইয়াছিলেন। অন্য লোকের সঙ্গে তাঁহার এই প্রভেদ ছিল যে, যাঁহারা স্বপ্ন-দ্রষ্টা, তাঁহারা প্রায়ই কবির মত কল্পনা-বিলাসী হইয়া থাকেন, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাঁহারা কোন পরিচয় দিতে পারেন না। কিন্তু আশুবাবু মনে মনে যে বৃহৎ

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা তিনি ধ্যানের মধ্যেই পাইয়াছিলেন

ভাইস চ্যান্সেলার আশুতোষ এবং অনারারি 'ডাক্তার' উপাধি গ্রহীতাগণ

কল্পনা গড়িয়া তুলিতেন, সেই গড়নটি তিনি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ফলপ্রদ করিতে শক্তি রাখিতেন। তাঁহার বিশাল মস্তিষ্কে যাহা আদর্শরূপে গঠিত হইত, তাঁহার বিশাল বাহু তাহা কার্য্য-ক্ষেত্রে রূপ দান করিতে পারিত।

এখন বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে; এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্বেত রাজ-ছত্র আর সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের উপর বিস্তারিত নহে। এই বিদ্যায়তনকে ভগ্ন করিয়া বহু বিদ্যায়তনের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার নব প্রণালী মানিয়া লইয়া আশুবাবু ইহাতে যে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা দেশের উচ্চশিক্ষার আদর্শ-স্বরূপ চিরকাল গণ্য হইবে। তিনি মনন করিয়াছিলেন, জগতের শিক্ষার্থিগণ—অন্ততঃ এসিয়া মহাদেশ-বাসী শিক্ষার্থিগণ—আর লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, বার্লিন, প্যারিস্ বা বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবে না,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র মনে করিয়া কালিফর্ণিয়া হইতে পেরু এবং চীন হইতে 'আরব্য-কাণ্ডার' পর্য্যন্ত সকল দেশের লোক জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত এই কলিকাতা মহানগরীতে আসিবে। লর্ড রোনাল্ড্‌সে (অধুনা মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড্) বলিয়াছিলেন—"হিউয়েনসাং লিখিয়া গিয়াছেন,—নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০,০০০ ছাত্র বাস করিয়া অধ্যয়ন করিত। পৃথিবীর দূর-দূরান্তর হইতে অজস্র জল-প্রবাহের ন্যায় শিক্ষার্থীরা নালান্দায় তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে উপস্থিত হইত। বহু শিক্ষার্থী দ্বার-পণ্ডিতের নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইত। প্রতি দশ জন প্রার্থীর মধ্যে ২।৩ জন মাত্র গৃহীত হইত, অপর সকলের দাবী গ্রাহ্য হইত না। আশুবাবুর গঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নালান্দার আদর্শ লক্ষ্য করিতেছে।" যদি আশুবাবু তাঁহার কার্য্যে পুনঃ পুনঃ বাধা না পাইতেন, তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধুরা যদি প্রতিকূলতা না করিতেন, যদি শিক্ষা-বিষয়ে সরকার বাহাদুর তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া তাঁহার হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতেন, পাঠ্য-তালিকার উপর যদি কর্ত্তৃপক্ষ কাট্-ছাঁট্ বা পরিবর্ত্তনের অধিকার না রাখিতেন, সর্ব্বোপরি যদি তাঁহার অবাধ কর্ম্ম-বিভাগের প্রয়োজনীয় অর্থ-সাহায্য তিনি পাইতেন,—তবে তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহার মহাবাহু তাহা সম্পাদন করিবার যোগ্য শক্তি-

সম্পন্ন ছিল, এক কথায়,—তাহা হইলে তিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন।

তিনি পোষ্টগ্রাজুয়েট-বিভাগে উচ্চ শিক্ষার বহুমুখী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—প্রত্যেক বিভাগেরই তিনি কাণ্ডারী ছিলেন। এই বহুধা-বিভক্ত উচ্চ শিক্ষার মধ্যে চারিটি বিভাগ তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বলা যাইতে পারে,—তাহার প্রথমটি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা-সমূহের (Indian Vernaculars) বিভাগ, (সচরাচর ইহাকে বাঙ্গলা-বিভাগ বলা হইয়া থাকে)।

দ্বিতীয়—প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতি।

তৃতীয়—ইস্‌লামিক বিষয়ের জ্ঞান-বিস্তার।

চতুর্থ—পালি-ভাষার চর্চ্চা।

প্রাদেশিক ভাষা-বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়েকটি ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন :—বাঙ্গলা, আসামী, মৈথিলী, উড়িয়া, উর্দ্দু, হিন্দী, গুজরাটী, দ্রাবিড়ী, তামিল, মালায়ালম্, কেনারিজ এবং সিংহলী। ইহাদের মধ্যে যে কোনটিকে পরীক্ষার প্রধান বিষয় বলিয়া শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু অপর ভাষাগুলির মধ্যে একটিকে দ্বিতীয় বা Subsidiary ভাষা-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। এই দ্বিতীয় ভাষাটির জন্য ২০০ নম্বর নিয়োজিত হইয়াছিল। সুতরাং এম্, এ-পরীক্ষার্থীর পক্ষে তাহারও একটা বেশ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল,—কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে বিদেশীয় ভাষা অধিগম্য করা সম্ভবপর নহে। প্রধান ভাষার (অনেক স্থলে মাতৃভাষার) যতটা জ্ঞান দরকার, দ্বিতীয় ভাষার ততখানি জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থীর নিকট কখনই প্রত্যাশা করিতে পারে না। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কোন ভাষার যতটা জ্ঞান আবশ্যক, এম, এ-পরীক্ষার্থীদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষাটির ততটা জ্ঞানই যথেষ্ট। এই দ্বিতীয় ভাষাটির সম্বন্ধে আশুবাবুর যে বৃহৎ পরিকল্পনা ছিল, তাহা তাঁহারই মত মহামানবের যোগ্য। যাহাতে প্রত্যেকটি ভাষা পড়িবার মত ছাত্র পাওয়া যায়, তজ্জন্য তিনি প্রত্যেক বিষয়ে একটি করিয়া ২৫৲ টাকার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই হেতু প্রত্যেক ভাষার জন্য প্রতি বৎসর ছাত্রের অভাব হইত না।

প্রাদেশিক ভাষা-বিভাগ বা বাঙ্গলা-বিভাগ

এই ভাবে প্রাদেশিক ভাষাগুলির আহ্বানে ভারতবর্ষের বহু দেশ হইতে সাড়া পাওয়া গিয়াছে। এই কলিকাতাকে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষার একমাত্র কেন্দ্রস্থানে পরিণত করিয়া তিনি প্রত্যেক প্রদেশের সঙ্গে শিক্ষা-বিষয়ে আমাদের পরম ঐক্য বিধান করিয়াছেন; তাঁহার এই ব্যূহ অব্যর্থ এবং তাহা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের লোককে লইয়া গঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।

এতগুলি ভাষা পড়িবার দরুণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি, কৌতূহল ও সৌহার্দ্দ্য আমন্ত্রণ করিতে পারিয়াছিল। অন্য কোন প্রদেশে এম্, এ-পরীক্ষায় প্রাদেশিক ভাষা-শিক্ষার অবকাশ ছিল না; সুতরাং স্বদেশীয় ভাষার ভক্তগণকে হিমাদ্রির পাদমূল হইতে বিন্ধ্যতট, কাবেরীর জন্মস্থান, অম্বুগোদ-প্রদেশ ও সিংহল প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতায় আসিতে হইত। নানা-প্রাদেশিক ভাষাবিৎ অধ্যাপকগণের কলরবে ভারতীয় ভাষা-বিভাগ মুখরিত হইয়া উঠিল। বাঙ্গলাদেশের সঙ্গে ভারতীয় অপরাপর দেশের একটা নূতন ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হইল এবং এই বৃহৎ বিদ্যায়তনের উপর নানাদেশ হইতে লক্ষ্মীর কৃপা বর্ষিত হইতে লাগিল। ভিন্ন দেশের রাজা ও ধনাঢ্যগণ তাঁহাদের দেশীয় ভাষার উন্নতির জন্য অর্থ-সাহায্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার জন্য এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সংস্থান হইতে লাগিল।

কিন্তু জাতীয় ঐক্য ও আমাদের বিদ্যায়তনের অর্থ-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি যদিও আশুবাবুর পরম কাম্য ছিল, তথাপি এই সমস্ত ছিল তাঁহার গৌণ লক্ষ্য,—তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ শিক্ষার উন্নতি। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—"বুঝিতে পারিতেছেন না, এত গুলি ভাষা-শিক্ষার দরজা খুলিয়া দেওয়াতে আমাদের দেশে শিক্ষার কতটা উন্নতির সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। এখন জাতীয় ইতিহাসের যে চর্চ্চা হইতেছে, তাহা শুধু কয়েকখানি তাম্র-শাসন, শিলালিপি ও বিদেশীয় লোকদের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া। কিন্তু দেশের লোকের সাময়িক ঘটনা-সম্বন্ধে কি ধারণা, তাহা প্রত্যেক প্রাদেশিক প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যাইবে। প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যে এ দেশের ঐতিহাসিক উপকরণ অনেক আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সেইরূপ অপরাপর প্রদেশের ভাষার কাব্যে, গাথা-

প্রাদেশিক ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্য

সাহিত্যে ও প্রবচনে তাহাদের দেশীয় ইতিহাসের অনেক উপকরণ বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া আছে। এখন ধরুন, তেরটি প্রাদেশিক ভাষার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে বৃত্তির আকর্ষণে প্রত্যেক ভাষাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইবে। কোন কোন বিষয়ে একাধিক ছাত্রও জুটিবে ; প্রতিবৎসর যদি অন্ততঃ বার-তেরটি ছাত্র এই ভাবে বিবিধ ভাষার সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করে, তবে পনের বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ এরূপ দেড় শত এম্, এ-পাশ ছাত্র পাওয়া যাইবে, যাহারা তাহাদের নিজের ভাষা ছাড়াও অপর এগার-বারটি ভাষার মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিয়াছে। ধরুন যদি আপনি বাঙ্গলাদেশের একখানি ইতিহাস-সম্বন্ধে গবেষণা করেন, তখন আপনি এই দেশেই, এমন কি এই নগরীতে বসিয়াই বহু ভাষাভিজ্ঞ, এম্, এ-পাশ-করা ছাত্র-মণ্ডলী পাইবেন, যাহাদের সাহায্যে আপনার গবেষণা সম্পূর্ণ সফল হইতে পারিবে। এখনও যেমন, পুরাকালেও তেমনই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক নানা সূত্রে পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল,—এ পরিচয়ের চিহ্ন তাহাদের প্রাচীন সাহিত্যে অবশ্যই আছে। গবেষণাকারী তেলেগু, গুজরাটী বা বাঙ্গালী যে কেহ হউন না কেন, তিনি তাঁহাদের সহাধ্যায়ীদের সাহায্যে ভিন্ন-ভিন্ন দেশের সাহিত্যে তাঁহার উদ্দিষ্ট বিষয়ের কোন উল্লেখ বা বিবরণ আছে কি-না,—তাহা জানিতে পারিবেন। এই ভাবে প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির সঙ্গে যে পর্য্যন্ত আমরা সম্পূর্ণভাবে পরিচিত না হইব, সে পর্য্যন্ত আমাদের দেশের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ইতিহাস লিখিত হইতে পারিবে না। এই দেখুন না, বাঙ্গলার মহারাষ্ট্র-পুরাণখানি-সম্বন্ধে যদি আমরা অনবহিত থাকিতাম, তবে মহারাষ্ট্র-জাতির অভিযানের ইতিহাস-সম্বন্ধীয় একটা বড় উপকরণ হইতে আমরা বঞ্চিত থাকিতাম।”

আশুবাবু তাঁহার দৃষ্টি ভবিষ্য সম্ভাবনার চিত্র সম্মুখে রাখিয়া লক্ষ্য স্থির করিতেন ; এরূপ অব্যর্থ সন্ধানীর উদ্দেশ্য যদি কোন স্থলে কার্য্যকরী না হইয়া থাকে,—তবে তাহা ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদের সমবেত বাধার দরুণ। তিনি এমন কল্পনা করেন নাই, যাহা পৃথিবীর কঠিন, বাস্তব সত্য ডিঙ্গাইয়া শুধু স্বপ্ন-লোকেই পর্য্যবসিত হইত। তাঁহার লক্ষ্য ছিল উর্দ্ধে,—কিন্তু মেঘলোকে আবদ্ধ-দৃষ্টি এই তপস্বী সেই অজস্র বর্ষণেরই সাধনা করিতেন, যাহাতে আমাদের ধরণী ধন-ধান্য ও শস্যশালিনী হইতে পারে।

আমরা বঙ্গ-সাহিত্যের জন্য আজীবন খাটিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই দেশের ভাষা ও সাহিত্য-সম্বন্ধেও তাঁহার দৃষ্টি কতদূর যাইত, তাহা আমরা তাঁহার মত উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে এম্, এ-পরীক্ষার বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া ভার্ণাকুলারে উক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধেও তাঁহার সেই ভূয়োদর্শন ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভার্ণাকুলারে এম্, এ-পরীক্ষার সৃষ্টি হয়। তাহার প্রায় সাত আট বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমি বাঙ্গলার এম্, এ-পরীক্ষার ব্যবস্থার জন্য তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিয়া আসিয়াছি। তিনি প্রায়ই বিরক্তির সুরে বলিতেন,—"আপনাদের বাঙ্গলা-সাহিত্যে কি আছে যে, এম, এ'র ছাত্রগণ তাহা পড়িবে? মুদি-দোকানের খাতা-পত্রও তাহা হইলে এম, এ-পরীক্ষার লিষ্টিতে স্থান পাইতে পারে।" অবশ্য এ সকল কথা যে তিনি ঠাট্টার ভাবে বলিতেন, তাহা বুঝিতাম। কিন্তু যে দিন তিনি সত্য-সত্যই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাঙ্গলায় কি সেক্সপীয়র বা মিল্টনের মত কবি আছেন?"—সেদিন,—কখনও তাঁহার কথার প্রতিবাদ না করিলেও,—আমি দৃঢ়তার সহিত বলিলাম—"আছেন, কেবল অপরাপর স্বাধীন জাতির মত ঢাক, ঢোল, দামামা পিটিবার সাধ্য আমাদের নাই; যদি তাহা থাকিত, তবে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদের স্থান মুদি-দোকানে হইত না, তাঁহারাও রাজসিংহাসনের দাবী করিতেন।" আশুবাবু আমার এই অভিমত মনে মনে কতটা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানি না, হয়ত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া যে তিনি আমার প্রতি একটু খুসী হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই লোকটিকে যতটা জানিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, তিনি প্রতিবাদে বিরক্ত হইতেন না, বরং কাকুবাদ পছন্দ করিতেন না। প্রতিবাদ করিয়া যদি কেহ তাঁহাকে কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিত, তবে সে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহার সঙ্গে তিনি তর্ক করিতেন। এইভাবে বাঙ্গলায় এম্, এ-পরীক্ষার প্রস্তাব-সম্বন্ধে বারংবার দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ-পথ পাই নাই, নিরাশভাবে ফিরিয়া আসিয়াছি। বাঙ্গলার এম, এ হইল না,—মনস্তাপ মনে-মনে রহিয়া গেল—কারণ যিনি এত বড় বোদ্ধা, এত বড় যোদ্ধা, তিনি যদি না বুঝিলেন,

বাঙ্গলার এম, এ-পরীক্ষার ব্যবস্থা

সহায় না হইলেন, তবে আমাদের চেষ্টা ও সাধনায় আর কি হইবে? নিরাশভাবে একরূপ হাল ছাড়িয়া দিলাম।

১৯২০ সনে একদিন আশুবাবুর নিকট হইতে ডাক আসিল। আমি যাওয়া মাত্র তিনি বলিলেন—"এবার বাঙ্গলার এম্, এ-বিভাগ খুলিব, স্থির করিয়াছি। আপনি এণ্ডারসন্ সাহেবকে চিঠি লিখিয়া দিন, তিনি একটা খসড়া ও সিলেবাস্ ঠিক করিয়া পাঠান।"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম—"এতকাল অরণ্যে রোদন করিয়া যাহা পাওয়া যায় নাই, আজ কোন্ সৌভাগ্যে হঠাৎ বঙ্গভাষার সেই ফল-লাভ হইল?"

তিনি বলিলেন—"আপনারা যত দিন ধরিয়া চীৎকার করিয়া আসিয়াছেন, আমি তাহারও পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালায় এম্, এ-বিভাগের সৃষ্টি করিতে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শুধু খেম্‌চির জোরে কিছু হয় না। বাঙ্গলায় এম্, এ-পরীক্ষা হইবে, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কোথায়? হয়ত বিদেশীরা বাঙ্গলায় এম্, এ দিতে চাহিবে—আপনার বাঙ্গলা ভাষায় রচিত ইতিহাসে তো তাহা চলিবে না। সংস্কৃত, পার্শী প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে টেক্স্‌ট্ ছাড়া, অপরাপর বিষয় ইংরাজীতে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আপনাকে 'History of Bengali Language and Literature' সম্পূর্ণ নূতনভাবে প্রণয়ন করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলাম কেন? বৈষ্ণব-ইতিহাস সম্বন্ধে 'রিডার' নিযুক্ত করিয়া আপনার দ্বারা তাহা লিখাইয়া লইয়াছি কেন? শ্রীযুক্ত জে, এন্, দাস সাহেবের দ্বারা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা-সাহিত্যে বর্ণিত বঙ্গদেশের অবস্থা লিখাইলাম কেন? বিজয় মজুমদার ভাষার ইতিহাস-রচনায় উৎসাহ পাইয়াছেন কেন? এগুলি আমার মুখ্য উদ্দেশ্যের অবতরণিকা-স্বরূপ। এখন ভিত তৈরি হইয়া গিয়াছে, মন্দির গঠন করিতে আর বিলম্ব হইবে না। আপনারা ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে ফসলের জন্য হৈ-চৈ করিয়াছেন,—তা' ও কি হয়? এইবার যান, এণ্ডারসন যেন শীঘ্র একটা খস্‌ড়া পাঠাইয়া দেন, এ জন্য চিঠি লিখুন।"

'এইবার যান, এণ্ডারসনকে চিঠি লিখুন'

এণ্ডারসন্ সাহেব (আই-সি-এস্) চট্টগ্রাম-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার ছিলেন। অবসর লইয়া তখন তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলার অধ্যাপকের কাজ করিতেছিলেন। তিনি আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন, আশুবাবু তাহা ভালরূপেই জানিতেন। আমি বাড়ী আসিয়া সেই 'মেলেই' এণ্ডারসন্ সাহেবকে চিঠি লিখিলাম। যথাকালে তাঁহার খস্‌ড়া-সহ উত্তর আসিল,—আমি তাহা আশুবাবুর হাতে দিলাম।

এই ব্যাপারে দেখা যাইবে যে, ভাষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমি তখন ৪০ বৎসরের অধিককাল যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছিলাম, সেই সু-চিরকাল-অধীত বিষয়-সম্বন্ধেও আমার ধারণা কতটা অল্প ছিল।

জগন্নাথের রথ

জগন্নাথের রথ তিনিই চালান,—আমরা চক্রের মত আবর্ত্তিত হইয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে রথ চালাইয়া লইয়া গিয়াছি,—সারথী-স্বরূপে নহে, উপলক্ষ্য-স্বরূপে।

প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি-সংগ্রহ

আমি যখন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের চৈত্র মাসে নিতান্ত পীড়িত হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসি, তখন ১৪ নং রাজাবাগান জংসন লেনের ভাড়াটিয়া বাসা-বাড়ীতে রামকুমার নামে আমার এক

রামকুমার

ভৃত্য ছিল, তাহার বাড়ী ছিল বাঁকুড়া-জেলার পাত্রসায়ের গ্রামে, এই গ্রাম সোনামুখীর নিকট। রামকুমার মাঝে মাঝে দেশে যাইত এবং তাহাকে আমি প্রাচীন বাঙ্গলা-পুঁথি কিরূপে খোঁজ করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়, তাহার সন্ধান শিখাইয়া দিতাম। এই সূত্রে সে আমাকে বহু পুঁথি আনিয়া দিয়াছিল,—ইহাতে যে পারিশ্রমিক ও মূল্য লাগিত, তাহার ব্যবস্থা করা আমার সেই সময়ের দুঃস্থ অবস্থায় সম্ভবপর হইল না। সুতরাং আমি বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুকে এই সংগ্রহগুলি দিয়া অনুরোধ করিলাম,—"আপনি রামকুমারকে প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত করুন।" তদনুসারে তিনি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। আমার নির্দ্দেশ-মত রামকুমার বিশ্বকোষ-আপিসে প্রায় তিন-চার হাজার পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গ-বিভাগের সৃষ্টি হওয়ার

পর নগেন্দ্রবাবুকে তাঁহার প্রাচীন পুঁথিশালা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বিক্রয় করিতে আমি অনুরোধ করি। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম—"এই পুঁথিগুলি রক্ষার ব্যবস্থা আপনি ভাল করিয়া করিতে পারিতেছেন না, এবং আপনার জীবনান্তে এগুলি সমস্তই নষ্ট হইবে। পুঁথিগুলি জাতীয় সম্পত্তি,—বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহারা ভালরূপেই সংরক্ষিত হইবে।" আমি আশুবাবুকে বলা মাত্র তিনি তিন হাজার টাকা মূল্যে এই পুঁথিগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক্রয় করেন। এই ভাবে পোষ্ট্‌গ্রাজুয়েট্‌-বিভাগে বাঙ্গলা পুঁথি-শালার পত্তন হয়।

রামকুমারকে আমি অতঃপর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পুঁথি-সংগ্রহ-কার্য্যে নিয়োগ করিতে চেষ্টা করি এবং চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া তাঁহার বাড়ীতেও প্রাচীন বাঙ্গলা-পুঁথির আর একটি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

এই সংগ্রহের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে রামকুমার ও তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র অবিনাশের দ্বারা আরও অনেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ইহার অনেক পরে শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় সাব্‌ডেপুটি মহাশয় বীরভূম এবং অপরাপর স্থান হইতে অনেক পুঁথি সংগ্রহ করেন। তিনি বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের নিকট জানান যে, তাঁহার সংগ্রহ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দিতে ইচ্ছুক। এইভাবে আমরা আরও দেড় হাজার পুঁথি পাইয়াছিলাম, এইরূপে প্রাচীন বাঙ্গলা-পুঁথির সংখ্যা প্রায় নয়-দশ হাজারে দাঁড়াইল।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোর দুর্দ্দিন ; সরকারের প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করিতে আশুবাবু বিষম বেগ পাইতে লাগিলেন। অধ্যাপকদের বেতন বন্ধ, এবং আমাদের বিদ্যায়তন অর্থ-কষ্টের ঝটিকায় টলমল,—একমাত্র কাণ্ডারীর মুখের দিকে চাহিয়া আমরা বুক বাঁধিয়া ছিলাম।

এই সময় একদা আমি আশুবাবুকে বলিলাম,—"বঙ্গ-বিভাগের জন্য তিন জন রিসার্চ-স্কলার নিযুক্ত করার প্রয়োজন।" তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই বেতন পাইতেছেন না। এ সময়ে আপনার ভাল আবদার, এ কি অন্যায় প্রস্তাব!" আমি বলিলাম,—"বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা আছে কি নাই, তাহা আমি জানি না। কিন্তু যে বিভাগটি আমার

হাতে দিয়াছেন, তাহার প্রয়োজনগুলি আপনাকে না জানাইয়া কাহাকে জানাইব?" তথাপি তিনি বিরক্তির সুরে কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি ভীত হইলাম না,—আমি তাঁহাকে বলিলাম—"এই যে দশ হাজার পুঁথি বাঙ্গলা-পাঠাগারে সঞ্চিত হইয়াছে, বাঙ্গলায় যাহারা এম্, এ দিবে, তাহাদের এই পুঁথিগুলি পড়িবার কোন প্রয়োজন নাই। পাঠ্য-তালিকায় ইহাদের অনুশীলনের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা নাই, অথচ এই বইগুলিতে বাঙ্গলা-দেশের ভূগোল, সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব, এমন কি গণিত ও কৃষি-সম্বন্ধে এত তথ্য আছে যে, মৌলিক গবেষণায় ইহারা বাঙ্গলার সর্ব্ব বিষয়ে নূতন আলো প্রক্ষেপ করিবে। এই পুঁথিগুলি চর্চ্চা না করিলে বঙ্গীয় সভ্যতার কোন ইতিহাস লিখিত হইতে পারিবে না, বাঙ্গলার ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক কথা অবজ্ঞাত হইয়া থাকিবে,—লৌকিক ধর্ম্মগুলির উত্থান-পতনের কথা, বাঙ্গলার নদ-নদীর যুগে-যুগে গতি-পরিবর্ত্তনের কথা ও এদেশের পল্লী ও নগরীগুলির প্রাচীন কাহিনী, এদেশের যুগ-যুগের রাষ্ট্রনীতি, তীর্থস্থানগুলি, সাহিত্যের আদর্শ, এ দেশের লিপিতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিষয়-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এ গুলির অনেক পুঁথিই মৌলিক এবং অনেক গুলি আবার অপ্রকাশিত, কোন মুদ্রিত পুস্তকে সেই সকল তথ্য পাওয়া যাইবে না। যদি ইহাদের ব্যবহার না হয়, তবে শুধু কি আলমারী সাজাইবার জন্য ইহারা সংগৃহীত হইয়াছে? যাঁহারা পুঁথিগুলি প্রয়োজনীয় মনে করেন না, তাঁহাদের মত গ্রহণ করিলে এ গুলি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া ঘর পরিষ্কার করিলেই ভাল হয়।"

রিসার্চ-স্কলার

আমি আমার স্বাভাবিক মৃদুতা ত্যাগ করিয়া সেদিন একটু উত্তেজিত-ভাবেই কথা বলিয়াছিলাম এবং যাঁহার কাছে বলিয়াছিলাম তিনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন। তাঁহাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোন বিষয় একান্ত প্রয়োজনীয়, তবে তাহার গুরুত্ব অনুভব করা মাত্র, তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে তিনি তিলমাত্র বিলম্ব করিতেন না। অর্থকৃচ্ছ্রে তিনি ব্যথিত হইতেছিলেন সত্য, কিন্তু সেই অর্থকৃচ্ছ্র তাঁহার বিশাল বাহুর কর্ম্ম-তৎপরতা বিন্দুমাত্র শিথিল করিতে পারে নাই। আত্মশক্তির উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; তিনি মনে মনে জানিতেন, শুভেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে

তিনি যাহা করিবেন, তাঁহার কার্য্যের পশ্চাতে সেই সহস্র-বাহু, সহস্র-শীর্ষ পুরুষ আছেন, যিনি কর্ম্মীকে অবস্থা-সঙ্কটে ও প্রতিকূলতা-সম্ভূত সর্ব্ববিধ বিঘ্নের মধ্যে অভয় দিয়া থাকেন।

আমার কথাগুলির কোন উত্তর তিনি দিলেন না; কিন্তু আমি তাঁহার মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, আমার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের আবেদন তাঁহার কাছে ব্যর্থ হয় নাই। পরের দিন সিণ্ডিকেটের যে অধিবেশন হইল, তাহার কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া দেখিলাম, চারি জন রিসার্চ-স্কলার বাঙ্গলা-বিভাগে মাসিক একশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। আমি তিন জনের কথা বলিয়াছিলাম, দেখিলাম চারিজন হইয়াছে। এই কাজ পাইলেন মণীন্দ্রমোহন বসু, এম-এ, তমোনাশ দাশ, এম-এ, রমেশচন্দ্র রায়, এম-এ এবং রাখালদাস রায়, এম-এ। মণীন্দ্রবাবু সহজিয়া-সাহিত্য, তমোনাশ দাশ প্রাচীন বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস, রমেশচন্দ্র বৈষ্ণব-পদাবলী এবং রাখাল-দাস রায় বাঙ্গলার ভাষা-তত্ত্বের আলোচনায় লাগিয়া গেলেন।

এই পুঁথিগুলির সংখ্যা তাহার পর আর বাড়ে নাই। আশুবাবুর মৃত্যুর পর যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে আবার নূতন আইন খাড়া হয়, তখন শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন লিণ্ড্‌সে সাহেব। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে, তিনি যেন আমাদের প্রাচীন পুঁথিশালাটি একবার দেখিয়া যান। তিনি অনুরোধে পড়িয়া বাঙ্গলা-বিভাগের গ্রন্থশালায় ঢুকিয়াই পুঁথিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক বলিলেন—"Are not all these mere rubbish?" (এগুলি কি শুধু আবর্জ্জনা নহে?) আমি জানি আমার বন্ধুরা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা-বিভাগের অপব্যয়ের কথা জানাইয়া তাঁহার কান ভারি করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহাদের নানারূপ বিদ্বিষ্ট ও হীন মন্তব্য শুনিয়া ইহার পূর্ব্বেই আমি পুঁথি-সংগ্রহ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। লিণ্ড্‌সে সাহেবের কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব গোপন করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম—"আমার বিরুদ্ধে পূর্ব্বেই বিষ ছড়ান হইয়াছে, নতুবা আপনি না জানিয়া, না শুনিয়া সূচনাতেই এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন কেন? আমি প্রাচীন বাঙ্গলা অর্দ্ধশতাব্দী যাবত পড়িয়া আসিয়াছি, আমি মূল্যবান্ মনে করিয়া এই পুঁথিগুলি কত কষ্টে

পুঁথির সংখ্যা তার পরে আর বেশী বাড়ে নাই

সংগ্রহ করিয়াছি! কোথায় উৎসাহ পাইব, তৎপরিবর্ত্তে আপনি এই ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়াই এরূপ মন্তব্য করিবেন কেন? অথচ আপনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। আপনার এখানে না আসাই উচিত ছিল।" লিণ্ড্সে সাহেব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নানারূপ মিষ্ট কথায় আমাকে আপ্যায়িত করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর দেখিলাম, নূতন আইনের খসড়ায় প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহের জন্য বাৎসরিক ১০০০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। এই মঞ্জুরীতে লিণ্ড্সে সাহেবের কিছু হাত ছিল বলিয়াই আমার ধারণা। তারপর দুই বৎসর গেল, আমি পুঁথি-সংগ্রহের কোন চেষ্টাই করিলাম না। পোষ্টগ্রাজুয়েটের সেক্রেটারী গৌরাঙ্গবাবু একদিন আমাকে বলিলেন,—"কই ১০০০৲ টাকা মঞ্জুর করাইয়া আপনি যে একেবারে চুপ। আদত কথা পুঁথি নাই। আপনি আর সংগ্রহ করিবেন কি?" আমি বলিলাম—"পুঁথি এখনও ঢের আছে। আসল কথা, আশুবাবু নাই, আমার মনও নাই।"

অধ্যাপক-নিয়োগ ও পল্লীগীতি-সংগ্রহ

এম্, এ-ক্লাসে বাঙ্গলা পড়াইবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করার সময় বিপদে পড়া গেল। অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপক-পদ-প্রার্থীর অভাব কোন কালেই দেখা যায় নাই। সমস্ত বিষয়েই এম্, এ-পাশ প্রার্থী জোটে; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্য কেই বা পড়িয়াছেন, কেই বা পড়াইবেন? প্রাচীন বাঙ্গলায় কৃতিত্বের প্রমাণ-স্বরূপ কাহারও 'বিদ্যাভূষণ' বা 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি নাই, এম্, এ-উপাধির তো নূতন সৃষ্টি হইবে। সুতরাং অধ্যাপকের বিদ্যাবুদ্ধি কোন্ মাপ-কাঠির দ্বারা নির্ণয় করা যাইবে? আশুবাবু বলিলেন—"আপনি লোক নির্ব্বাচন করিয়া আনুন।" আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেক বাঙ্গলা বই লিখিয়াছেন এবং বাঙ্গলা-সাহিত্যে পরিচিত ব্যক্তি; অবশ্য এই গুণপনা আমাদের উদ্দিষ্ট ছিল না। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই খুঁজিতেছিলাম। চারুবাবু কবি-কঙ্কণের একটি সটীক সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছিলেন, বলিয়া জানিতাম। সুতরাং তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আশুবাবুর নিকট

বঙ্গ-বিভাগের অধ্যাপক-নির্ব্বাচন

হাজির করিয়া দিলাম। এই ভাবে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'-সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের কথাও আশুবাবুকে বলিয়াছিলাম। তিনি সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থ-শালায় কাজ করিতেছিলেন, সেখানে তাঁহার থাকার অসুবিধা হইয়াছিল। আশুবাবু তাঁহাকে আমাদের বাঙ্গলা-পুঁথি-শালার অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করিলেন। শেষটায় তিনি অধ্যাপনার ভার পাইলেন। ইঁহাদের ছাড়া শশাঙ্কমোহন সেন এবং রাজেন্দ্র শাস্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এই কয়েকটি পণ্ডিত লইয়া বাঙ্গলার অধ্যাপক-মণ্ডলী গঠিত হইল।

আমি অন্যান্য বিভাগের কথা সাক্ষাৎভাবে জানি না,—এবং তৎসম্বন্ধে বেশী কিছু আলোচনা করিতে পারিব না। বাঙ্গলাবিভাগ সম্পূর্ণরূপে নূতন; সুতরাং এই বিভাগ গঠন করিবার জন্য আশুবাবুকে অনেক নূতন সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বিস্ময়কর প্রতিভা ও সংগঠনী শক্তি সর্ব্ব বিষয়েই দেখা গিয়াছে। তিনি স্বয়ং পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন এবং সকল বিষয়েই তাঁহার অল্প-বিস্তর অধিকার ছিল,—গণিত, সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতের জ্ঞান তাঁহার যে কোন অধ্যাপকের যোগ্য ছিল। কিন্তু এমন বিষয়ও ছিল, যাহার পরিধি মাত্র তিনি স্পর্শ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও বিষয়-জ্ঞান এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, বিষয়টি বিবেচনাধীন হওয়া মাত্র তিনি তাহার প্রয়োজনীয়তা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও তাহা পরিপুষ্ট করিয়া তোলার উপায় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। বোর্ডগুলির সভায় দেখা গিয়াছে, তিনি কোন বিষয়ের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম তথ্যগুলির আলোচনা-কালে অধ্যাপকদের অপেক্ষাও তৎসম্বন্ধে দূরদৃষ্টি ও বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান করিবার শক্তি অনেক বেশী দেখাইয়াছেন। এজন্য তিনি প্রত্যেক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ এরূপ দক্ষতার সহিত করিতেন যে, বহুদর্শী ও বহুপ্রবীণ অধ্যাপকেরাও অবনতশিরে তাঁহার শাসন মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত কিছু তাঁহারা পান নাই।

এই সকল মহাগুণে বোর্ড ও ফ্যাকাল্‌টিতে তাঁহার অপ্রতিহত একাধিপত্য ও রাজ-ছত্র স্বীকৃত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সুস্থই হউক, আর দুঃস্থই হউক, এবং সেজন্য তিনি আত্মতৃপ্তি অনুভব করুন কিংবা উৎকট মনো-

বেদনা ভোগ করুন,—এই বৃহৎ বিদ্যায়তনের প্রয়োজনে কোন অনুষ্ঠান করিতে হইলে তিনি চিন্তা করিবার জন্য এক মুহূর্ত্ত সময়ও অবকাশ লইতেন না,—তখনই তাহা করিয়া ফেলিতেন।

বারংবার নিজের কথা বলিতে কুণ্ঠা হয়। কিন্তু আমি যখন এমন একটি বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম, যাহা নূতনভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং আমি যখন অপরাপর বিভাগের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত নহি, তখন আমাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই বঙ্গ-বিভাগের কথাই উত্থাপন করিতে হইবে, কারণ এইখানেই সেই বিরাট্ কর্ম্মী-পুরুষকে আমার ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ হইয়াছে।

১৯০৭খৃষ্টাব্দে আমি ময়মনসিংহ পল্লী-গীতির মাত্র ৪।৫টি ছত্র 'সৌরভ' নামক একখানি মাসিকপত্রে দেখিতে পাই, তাহা আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, আমি বহু চেষ্টা করিয়া ময়মনসিংহ জেলার কেন্দুয়ার অধীন আইথর গ্রামবাসী চন্দ্রকুমার দে নামক যুবককে খুঁজিয়া বাহির করি ও তাঁহার সাহায্যে কতকগুলি পল্লী-গীতি সংগ্রহ করি। এই গীতগুলি পড়িয়া তাহাদের রেশ আমার মনোবীণায় দিনরাত্র বাজিতে থাকে,—এ কি স্বর্গের ভাণ্ডারের অমৃত-বিন্দু পাইলাম, না নন্দন-উদ্যানের পারিজাত পাইলাম, না নারদের সুমধুর বীণা-ধ্বনি শুনিলাম? এই গীতগুলি আমার চক্ষে বঙ্গ-ভারতীর অদৃষ্টপূর্ব্ব এক মনোমোহিনী মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া দেখাইল। ইহা সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত মধুচক্র, অনাঘ্রাত পুষ্প-কলি। আমি আশুবাবুর কাছে যাইয়া বলিলাম,—"বাঙ্গলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বৈষ্ণব-কবিতা এতদিন জানিতাম; কিন্তু আমি আর এক ভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছি, যাহা বৈষ্ণব-মহাজনদের পদাবলীর প্রায় গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইতে পারে। এই গীতগুলি উদ্ধার করিতেই হইবে, আজ সরস্বতীর ভুজাশ্রয় করিয়া আমি এই কার্য্যে ব্রতী হইতে চাই।" আশুতোষ বলিলেন—"আপনি যখন এতটা প্রশংসা করিতেছেন, তখন চেষ্টা করুন, যাহা আপাততঃ দরকার, আমি মঞ্জুর করিব।" আমি চন্দ্রকুমার দে'কে দিয়া কতকগুলি পল্লী-গাথা সংগ্রহ করিলাম। আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তজ্জন্য চন্দ্রকুমারকে পারিশ্রমিক দিলেন এবং সেই গাথাগুলি ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুস্তকের কয়েকটি ফর্ম্মা ছাপা হইবার পর আমি

ময়মনসিংহের পল্লী-গীতিকা

সেই অংশটুকু বঙ্গের লাট লর্ড রোলাণ্ড্‌সে (অধুনা মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড্) মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া প্রার্থনা করিলাম যে, তিনি যদি ঐগুলি উপযুক্ত মনে করেন, তবে যেন এক ছত্র অনুকূল মন্তব্য লিখিয়া আমার পরিশ্রম সার্থক করেন। তিনি 'মহুয়া' (ইংরাজী অনুবাদ) পড়িয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন, যে প্রার্থিত এক ছত্র মন্তব্যের স্থলে পূরোপূরী একটি ভূমিকা লিখিয়া পাঠাইলেন। সকলে বুঝিলেন যে, যে পল্লী-গীতির আমি অজস্র প্রশংসা করিয়াছি তাহা নিতান্ত বাজে নহে। এই ব্যাপারে আর্থিক অসচ্ছলতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আশুবাবু বিশেষ উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন, আমার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন—"আপনি আপনার কাজ করিয়া যাউন, বিশ্ববিদ্যালয় ছাপাইবার ভার লইবে,—সে চিন্তা করিবার আপনার দরকার নাই।" হায়! তাঁহার এইরূপ দুই-একটি উক্তিতে যে আমরা দেহে মত্ত হস্তীর বল পাইয়াছি, সেরূপ আর কোথায় পাইব?

এই প্রাচীন পল্লী-গাথা-সংগ্রহে আমার কোন স্বার্থ ছিল না, বরং আমি নিজে এই কার্য্যের জন্য এতটা অতিরিক্ত কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইলাম, যাহাতে আমার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল। সরকার বাহাদুরের নিকট এই পল্লীগীতি-সংগ্রহ ও ছাপাইবার ব্যয়-ভার আংশিকরূপে পাইবার জন্য আবেদন করিলাম। আমি লিখিয়াছিলাম, শুধু ময়মনসিংহে নহে, বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ গাথা অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া আছে,—সেগুলির সংগ্রহের জন্য কয়েকটি লোক নিযুক্ত করা দরকার। বহু চেষ্টার পর সরকার বাহাদুর তিন বৎসরের জন্য অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিতে সম্মত হইলেন; প্রতি বৎসর তাঁহারা এতদর্থে তিন হাজার টাকার কিছু বেশী দিয়াছিলেন।

চন্দ্রকুমার নিযুক্ত হইলেন,—তাহা ছাড়া আরও তিন জন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ওটেন সাহেবের সঙ্গে আমার লোক-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। ভ্রমণের ব্যয়-সমেত মাসিক ৭০৲ টাকা বেতন ধার্য্য হইল। ওটেন সাহেব বিজ্ঞাপন দিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, ৭০৲ টাকায় আজকাল এম্, এ-পাশ প্রার্থী অনেক পাওয়া যাইবে। আমি বলিলাম—"এম্, এ; বি, এ-পাশ তো এ কার্য্যের কোন গুণপনা বলিয়া আমি স্বীকার করিই না, বরং ঐরূপ লোকের দাবী অগ্রাহ্য

গীতিকা-সংগ্রাহক-নিয়োগ

করা উচিত। পাশ-করা যুবকেরা চাষাদের সঙ্গে মিশিতে ঘৃণা বোধ করিবে; তাহারা পল্লীতে-পল্লীতে ঘুরিতে স্বীকৃত হয় কি-না সন্দেহ। তারপর, নিরক্ষর চাষারা যে ভাবে গানগুলি বলিবে, ঠিক সেইভাবে টুকিতে হইবে। আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা ভাষার জটিলতা ও অপপ্রয়োগ দেখিয়া, গানগুলি সংশোধন করিতে চেষ্টা পাইবেন, হাজার বার বলিয়া দিলেও তাঁহারা যেমনটি, ঠিক তেমনটি পাঠাইবেন না। অনেক স্থলে চাষা-মুসলমানদের কুঁড়ে ঘরে থাকিয়া তাঁহাদের গান-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। আমার মতে যে সকল নিরক্ষর চাষা পুরুষানুক্রমে এই সকল গান রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সম-শ্রেণীর লোক, অথবা পাড়াগাঁয়ের অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রলোক, যাহারা এই সকল গানের সমজ্‌দার, তাহারাই এই সংগ্রহ-কার্য্যের উপযুক্ত।" ওটেন সাহেব আমার কথা বুঝিলেন এবং সেইরূপ লোক নিযুক্ত করিতে রাজী হইলেন।

কোন কাজ খালি হইলে এদেশে যেরূপ হয়, এই ব্যাপারেও তাহার ত্রুটি হইল না। বহু প্রার্থী জুটিলেন,—তাঁহাদের অনেকে উপাধির বহর দেখাইলেন এবং অনেকে যে সকল পুস্তক বাঙ্গলায় লিখিয়াছেন, কবিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, কিংবা মাসিক-পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাদের বিস্তৃত বিবৃতি-সহ আবেদন প্রেরণ করিলেন। কিন্তু প্রার্থীদের নিকট কেবল একটি জিনিষ চাওয়া হইল,—আমরা যেরূপ পালা-গান ও পল্লী-গাথা ছাপাইয়াছি, সেরূপ কয়েকটি গাথা সংগ্রহ করিয়া নমুনা-স্বরূপ যিনি পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহারই দাবী অগ্রগণ্য হইবে। বহু প্রার্থীর মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, আশুতোষ চৌধুরী, জসীমউদ্দীন এবং অপর দুইজন এই পল্লী-গীতি-সংগ্রহের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রতিকূল মন্তব্যের অভাব অবশ্য হইল না। বহু লোক এ সকল গানের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া আশু-বাবুর মন ভাঙ্গাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন ডাঃ গ্রীয়ারসন্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই গানগুলির অজস্র প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন,—প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও কলাবিদ্যা-সমালোচক রদেনষ্টাইন লিখিলেন,—অজন্তা-অমরাবতীতে যে সকল রমণী-মূর্ত্তি পাথরে পাইয়াছি, বাঙ্গলা-পল্লী-সাহিত্যে সেই সকল রমণীর জীবন্তরূপ দেখিতে পাইলাম।—ডাঃ সিলভ্যাঁ লেভী লিখিলেন,—তাঁহাদের শীত-প্রধান দেশে থাকিয়া তিনি এই

পাশ্চাত্ত্যজগতে পল্লী-গীতিকার প্রশংসা

পল্লী-সাহিত্যে চিরবসন্ত-বিরাজিত বঙ্গদেশের রৌদ্রোজ্জ্বল দৃশ্য ও নরনারীর আনন্দময় চিত্র দেখিতে পাইলেন।—ডাঃ ষ্টেলা ক্রেমরিশ্ লিখিলেন,—'মহুয়া'র মত এমন সুন্দর, করুণ কাহিনী তিনি বিস্তৃত ভারতীয় সাহিত্যের কোথাও পান নাই।—ডিরেক্টর ওটেন সাহেব 'ইংলিশম্যানে' এক দীর্ঘ প্রবন্ধে বলিলেন,—সহরের 'মিলের' ধূম্র-সমাচ্ছন্ন আকাশ ও অবিরত যান-বাহনাদির কলরবে উত্যক্ত হইয়া যদি কোন পান্থ হঠাৎ পদ্মানদীর দিগন্ত-ব্যাপী আকাশ ও অবাধ হাওয়ার সংস্পর্শে আসে, তখন তাহার মনে যে স্ফূর্ত্তি হয়, কৃত্রিম সাহিত্য-পাঠনিরত যুবক এই গাথা-সাহিত্য পড়িয়া তেমনই আনন্দ অনুভব করিবেন।—আমেরিকার সমালোচক য়্যালেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধে লিখিলেন,—যদি বাঙ্গালী পাঠক এই গাথাগুলির যথাযোগ্য আদর করিতে পারে, তবেই বুঝিব তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কারণ প্রাচীন পল্লী-গানগুলির মধ্যে নব যৌবনের প্রেরণা ও স্বাধীন স্ফূর্ত্তি আছে।—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়া লিখিলেন বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী ম্যাডামছেলা হেগ,—"এই গাথাগুলি সেক্ষপীয়র ও রেসণীর পুস্তকগুলির মত য়ুরোপের ঘরে ঘরে পাঠ্য হওয়া উচিত।" মেটারলিঙ্ক্ প্রভৃতি লেখকদের মধ্যে যে সকল ত্রুটি আছে, ইহাদের মধ্যে তাহা নাই, এগুলি একেবারে নিখুঁত এবং "যুগে যুগে ভবিষদ্বংশীয়দের চক্ষে ইহাদের সৌন্দর্য্য বেশী করিয়া ফুটিবে। আমি ২০ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে যাহা কিছু পাইতেছি, তাহাই পড়িতেছি, কিন্তু সহসা এরূপ বিস্ময়কর, অভিনব সামগ্রী যে পাইব, তাহা কখনই প্রত্যাশা করি নাই।"—সুপ্রসিদ্ধ রোমঁ্যারোলঁ্যা কোন কোন গাথা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন যে, জগতের কোথাও পল্লী-প্রাণের গভীরতম রস এবং আর্টের কুশলতার সমাবেশ এরূপভাবে তিনি দেখেন নাই।—এই প্রকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাক্যে পাশ্চাত্ত্য বহু মনীষী এই গাথাগুলির অভিনবত্ব-সম্বন্ধে মুখর হইয়া উঠিলেন, তখন আমার প্রতিপক্ষীয় বন্ধুগণ আপাততঃ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন এবং এগুলির অসারতা-প্রমাণের চেষ্টা হইতে কিয়ৎকালের জন্য বিরত হইলেন।

আশুবাবুর কৃপায় এই যে আট খণ্ড পল্লী-গাথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পর পল্লী-গাথা-বিভাগের দ্বার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

জানি না কেন। আরও এ সম্বন্ধে কাজ বাকি ছিল। বিদেশে উচ্চ সমালোচনা হইলেও এদেশের লোকের প্রতিকূলতাই কি ইহার কারণ? ভগবান্ জানেন, কিন্তু এই পল্লী-গাথাগুলি আশুতোষের নামে সীলমোহরাঙ্কিত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। আমি এগুলি রচনা করি নাই,—ইহাদের প্রকাশ তাঁহারই কৃপায় হইয়াছে এবং তিনি এ গুলি আদর করিয়াছিলেন,—জাতীয় কৃতজ্ঞতার নৈবেদ্য তাঁহারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট্‌গ্রাজুয়েটের অন্যান্য বিভাগেও আশুবাবু তাঁহার অদ্ভুত শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গলা বা ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা-বিভাগ সম্পূর্ণ মৌলিক এবং এদেশের প্রকৃত হিতার্থে সংগঠিত হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি সিনেটের প্রবীণ সদস্যদের মনোভাব

দুঃখের বিষয়, এই বিভাগের গুরুত্ব এখনও শিক্ষিত সমাজে বিশেষরূপে উপলব্ধ হয় নাই। বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য যে আমাদের কতটা গৌরবের সামগ্রী, তাহা বিদেশী সাহিত্যের মোহে সংস্কারগ্রস্ত প্রাচীনপন্থীরা একেবারেই বুঝিতে পারেন না,—এজন্য আশুবাবুর সঙ্গে সিনেটে বহু প্রবীণ ইংরাজীর পণ্ডিতের খুনোখুনী লড়াই হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা চসার ও স্পেন্‌সারের ঐন্দ্রজালিক কবিত্বে মুগ্ধ, তাঁহারা মুকুন্দরাম ও মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন; যাঁহারা সারে, স্যার ফিলিপ্ সিড্‌নি ও সেক্ষপীয়রের সনেট ও গীতি-কবিতা পড়িয়া আত্মহারা, তাঁহারা বৈষ্ণব-কবিদের অমৃতোপম পদ-মাধুর্য্যের আস্বাদ পান না; যাঁহারা ট্রকেইক্, আয়েম্বিক্ প্রভৃতি ইংরাজী ছন্দের নিক্কণে তৃপ্ত, তাঁহারা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ দেখিলে বিতৃষ্ণ হইয়া উঠেন এবং যাঁহারা মিল্‌টন-কৃত কল্পনা-দেবীর আবাহন আবৃত্তি করিয়া অশেষ তৃপ্তি পান, তাঁহারা গণেশ-বন্দনা শুনিলেই ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া থাকেন। একদিন ফ্যাকাল্‌টির সভায় প্রকাশ্যভাবে এক প্রবীণ পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন "প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যে কি ছাই-ভস্ম আছে? এক রবীন্দ্রনাথের পুস্তক পড়িলেই বাঙ্গলা-সাহিত্যের সার-কবিত্ব পাওয়া যায় এবং তাহা তো আমাদের মেয়েরাও পড়িয়া বোঝে। বাঙ্গলার মুদি-দোকানের পাঠ্য কতকগুলি খাতাপত্র পড়াইবার জন্য আবার এম্,এ-ক্লাস! তাহার আবার অধ্যাপক!" আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—"মহাশয়,

প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যেই এমন সকল জিনিষ আছে, যাহা আপনি বহু চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিবেন না।” নরহরি চক্রবর্ত্তীর ‘ভক্তিরত্নাকর’ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে লেখা সুবৃহৎ গ্রন্থ, রয়েল সাইজের প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা হইবে, তাহার মধ্যে সঙ্গীত-সম্বন্ধে একটি অধ্যায় আছে ; উহাতে ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত-বিদ্যার এরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা আছে, যাহা এখনকার অনেক কলাবিৎই জানেন না। কাশী, কি দিল্লীর সঙ্গীত-শাস্ত্রের মহাপণ্ডিতগণেরও উহাতে শিখিবার যোগ্য অনেক জিনিষ আছে। ‘সহজিয়া-সাহিত্য’ ও ‘চৈতন্য-চরিতামৃত’ প্রভৃতি পুস্তকে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ-দর্শনের সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় দৃষ্ট হয় যে, সেই সেই দর্শন যাঁহারা অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের নিকট তাহা একরূপ অনধিগম্য। কাউয়েল সাহেব যে দিন কবিকঙ্কণকে চসারের সঙ্গে তুলনা করিয়া অতি-শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার রচিত চণ্ডীর ইংরাজী পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিলেন, সেই দিন কোন কোন ইংরাজীর পণ্ডিতের দৃষ্টি উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং সেদিন,—যখন মিস্ মার্‌গারেট নোবেল (ভগিনী নিবেদিতা) রামপ্রসাদের কবিত্ব ও মাতৃ-ভাবের গান হুইট্‌ম্যান, ব্লেক এবং অপরাপর ইংরাজ কবিগণের রচনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিয়া তাহার সুবিস্তৃত সমালোচনা-সম্বলিত ‘Mother Kali’ (কালীমাতা) নামক পুস্তক রচনা করিলেন,—সেদিন ইংরাজীর পণ্ডিতেরা আর একবার হাই তুলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সভায় পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে আমার অনেক কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল এবং আশুবাবু এই আলোচনা খুব উপভোগ করিয়া আমাকে সায় দিয়াছিলেন। মোট কথা—ভক্তি ও প্রেমের তত্ত্ব বৈষ্ণবেরা এতটা বিকাশ করিয়া-ছিলেন এবং মহাপ্রভুর অনুপ্রাণনায় তাহা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ ফুল্ল শতদলের মত ফুটিয়াছিল, এবং বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত স্তরে তাহার কল-স্বন ভাগীরথীর ন্যায় এরূপ নিবিড়ভাবে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল যে, জড়বাদী বিদেশী সাহিত্যের কোথায়ও সেই সুরটির আভাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। এজন্য শত-শত ত্রুটি ও আবর্জ্জনা সত্ত্বেও প্রাচীন সাহিত্যের একটি স্বর্গীয় মোহিনী শক্তি আছে, যাহা ভাবুক সত্যান্বেষীকে আকর্ষণ করিবে। হইতে পারে, অনেক সময় বাহিরের চাকচিক্য-বর্জ্জিত হইয়া সেগুলি কতকটা মলিন

দেখাইতেছে। সেই প্রেম ও ভক্তির সুর বাঙ্গলার নিজস্ব, ইংরাজী সাহিত্যের শত-শত উচ্চভাব ও কবিত্ব থাকিলেও তাহাতে সেই সুরটি আসিয়া পেঁছায় নাই।

বাঙ্গলা-ভাষায় আশুতোষ যাহা করিয়াছেন, অন্য কোন ভাইস্-চ্যান্সেলরের পক্ষে তাহা সাধ্যায়ত্ত হইবে কি-না সন্দেহ। সিনেট-সভায় আমি বিশটি বৎসর সদস্য-গিরি করিয়াছি। সদস্যগণের মধ্যে প্রবীণদের অধিকাংশের বাঙ্গলাভাষার প্রতি যে মনোবৃত্তি, তাহা একটু স্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় 'ঘৃণা'। বহু বৎসর পূর্ব্বে শক্তিমান আশুতোষ আর একবার বাঙ্গলাভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্যার গুরুদাস এবং অল্পসংখ্যক আর কয়েকটি সদস্য তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু সংখ্যায় বহুগুণে গরিষ্ঠ সভ্যদের সমবেত বাধায় প্রতিহত হইয়া তিনি পরাস্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি যে, সেদিন আশুতোষ দশহস্তে দশপ্রহরণ লইয়া যুঝিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মত যোদ্ধাকেও হঠিতে হইয়াছিল। সেই যুদ্ধের পর এবার ক্ষেত্র কতকটা সহজ হইয়া আসিয়াছিল। তরুণ সভ্যদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনোভাব বাঙ্গলার পক্ষে অনুকূল হইয়াছিল; তথাপি যেরূপ ভীষণভাবে প্রবীণ যোদ্ধারা লাঠি ঘুরাইয়াছিলেন, তাহাতে আমার 'রায়-বেঁশে'দের তাণ্ডব-নৃত্যই মনে পড়িয়াছিল। 'বাঙ্গলা যদি শিক্ষার বাহন হয়, তবে তো ইংরাজী গেল'। এই 'গেল', 'গেল'-রবে সিনেট-গৃহ একদা মুখরিত হইয়াছিল,—যেন ইংরাজীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ, ব্যাকরণ ও 'ইডিয়মের' পূর্ণজ্ঞান-লাভই বাঙ্গালী-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, বাঙ্গলা-ভাষায় ঐরাবত-মূর্খতা তাঁহাদের পাণ্ডিত্যেরই লক্ষণ।

বাঙ্গলাভাষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটনের পূর্ব্বতন প্রচেষ্টা

এই ঘোর যুদ্ধে আশুতোষের জয়-পতাকা উড়িল,—তৎপুত্র শ্যামাপ্রসাদ এখন পিতৃদত্ত সেই মহাপ্রসাদ পরিবেশনের ভার লইয়াছেন। বাঙ্গলা-ভাষা ও সাহিত্যের বিরোধী লোক কেবল বাহিরেই যে আছেন তাহা নহে, ঘরের মধ্যেই প্রতিকূলতা যথেষ্ট জোরে চলিতেছে। যাহা হোক, সেই সকল অপ্রিয় সত্য এখানে উদ্‌ঘাটন করার

রোমান্-লিপি-প্রচলন

প্রয়োজন নাই। আজকাল বাঙ্গলা-অক্ষর উঠাইয়া দিয়া রোমান্-লিপি-প্রবর্ত্তনের চেষ্টাও চলিতেছে। এই দল অতি প্রবল, বিশ্ব-জগৎ ইঁহাদের ক্ষেত্র এবং ভাণ্ডার অপ্রমেয়। এই কলিকাতায় বসিয়া প্রাচীন ও নূতন, বহুসংখ্যক বাঙ্গলা-গ্রন্থ কয়েকজন পণ্ডিত রোমান্-হরফে পরিবর্ত্তিত করিয়া এক পুঞ্জীভূত স্তূপ প্রস্তুত করিতেছেন। বাঙ্গলায় রোমান্-লিপি প্রবর্ত্তিত হইলে এই উপকরণ তখন কাজে লাগিবে, এজন্য পাশ্চাত্ত্য রোমান্-লিপি-প্রচার-সংসদ এ বিষয়ে বিশেষরূপ সচেষ্ট। যদিও কেহ কেহ সত্য-সত্যই এই ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিকভাবে সমীচীন মনে করিতেছেন, তথাপি আমি ইহাতে সায় দিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহি; আমার সমস্ত হৃদয় এবম্বিধ কার্য্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং আমি ইহা মায়ের বুকে ছুরি-মারার মতই অন্যায় মনে করি। এ সম্বন্ধে আমি কোন তর্ক করিতে চাই না; সংস্কৃত ও বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষায় কতকগুলি মন্ত্র আছে, তাহা রোমান্-অক্ষরে লিখিলে বিশ্বাসীদের নিকট উহার মন্ত্র-শক্তি থাকিবে না,—ঐরূপ করিলে তান্ত্রিক হিন্দুদের ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এ সম্বন্ধে 'প্রবর্ত্তকে' একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই যে সহস্র সহস্র প্রাচীন পুঁথি, তাম্রশাসন, শিলা-লিপি প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় ছড়াইয়া আছে, রোমান্-অক্ষর চলিলে সেই প্রাচীন সাহিত্য এবং সভ্যতার নিদর্শনের সঙ্গে দেশবাসীর নাড়ীচ্ছেদ হইয়া যাইবে; প্রাচীন পুঁথিগুলি যাদুঘরে পশুর কঙ্কালের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে, কেহ আর ছুঁইবে না।

তারপর সকল জাতিই স্বীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া থাকেন। সাহারার মরুভূমির পাশ্চাত্ত্য পথিক তো গরম কোট্, প্যাণ্টালুন ছাড়িয়া মস্‌লিন পরেন না। এ দেশের চাদর ও পাত্‌লা ধুতি গরম কালে কত আরামপ্রদ। কিন্তু সাহেবরা তো কিছুতেই তাহা পরিবেন না; গ্রীষ্মকালে সার্জ্জ্ ও ফ্লানেলের জামা পরিয়া ক্রমাগত ঘামিবেন ও কপাল রুমাল দিয়া মুছিবেন, তথাপি স্বীয় দেশের পোষাক ছাড়িবেন না। তবু পূর্ব্বকালে দুই-একজন সাহেব ঢাকাই ধুতি পরিতেন, পান খাইতেন ও আল্‌বোলায় তামাক টানিতেন; এখন সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা জাতীয় ভাব আরও জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। তুর্কিস্থানে কি হইতেছে, জাপানে কি হইতেছে, সে সকল দৃষ্টান্ত আমাদের

কুড়াইবার দরকার নাই। তাঁহারা স্বাধীন জাতি; আজ খেয়ালমত একটা রীতি ধরিবেন, কাল তাহা ছাড়িবেন। কিন্তু আমরা যদি একটা প্রথা অবলম্বন করি, তবে তাহা আমাদের পা লৌহ-নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিবে। আমার নিকট আমার মা যেমন, মাতৃভূমি তেমন, মাতৃভাষা তেমন, মাতৃভাষার লিপিও তেমন,—অতি পবিত্র। অবশ্য মাতৃভূমির পরিবর্ত্তন হইতেছে; আজ যেখানে দীঘি-সরোবর, দুইশত বৎসর পরে হয়ত সেখানে শস্য-ক্ষেত্রে সোনার ফসল হাসিয়া উঠিবে। ব্রাহ্মীলিপি যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক কালে আর্য্যভূমির প্রাদেশিক অক্ষর-মালায় পরিণত হইয়াছে, তথাপি সেই সুপ্রাচীন ধারাটি আছে; শিশু কালক্রমে যুবক হয়, তবুও সংস্কারগত ও আকৃতিগত ধারাটি বজায় রাখিয়া সে বড় হয়। আমরা কাঠামো-শুদ্ধ মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া মন্দির খালি করিতে পারিব না। এই ভাবের অতিরিক্ত মাত্রায় বৈজ্ঞানিক হইয়া আমরা দেশের সমস্ত প্রাচীন সংস্কার ও চিরাগত প্রথা ত্যাগ করিয়া রিক্তহস্ত হইতে চাহি না; এরূপ করিলে বাঙ্গালী জাতিরই অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে, তাহার বৈশিষ্ট্য কিছুই থাকিবে না। অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বাঙ্গলা ও ব্রাহ্মীলিপির অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদের স্বর-বর্ণ ও ব্যাঞ্জন-বর্ণ যেরূপ বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার সহিত সাজানো, এ, বি, সি, ডি প্রভৃতি তো সে ভাবে বিন্যস্ত নহে, তাঁহারা ইহা বিশেষ করিয়া জানেন; তথাপি তাঁহারা আমাদের প্রণালী গ্রহণ করেন না কেন, তখন বিজ্ঞান কোথায় থাকে? 'দো' লিখিতে যাইয়া তাঁহারা একটি অক্ষরের জায়গায় ছয়টি অক্ষর (though) লিখেন কেন? অতি সহজেই তাঁহারা কতকগুলি অনাবশ্যক অক্ষর বাঁচাইতে পারেন; নিজেদের বৈশিষ্ট্য-রক্ষার জন্য যাঁহারা এত সাবধান, তাঁহারা পরকে তথাকথিত বিজ্ঞানের পথ দেখাইয়া নিজেদের ঘর-রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত কেন, প্রাচীন কালের আবর্জ্জনা আজ পর্য্যন্তও ছাড়িতেছেন না কেন?

আপনারা একটি ছত্র বাঙ্গলা লিখিয়া তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দেখুন,—ইংরাজী লেখাটা কত বেশী জায়গা জুড়িয়া থাকে। এই যে স্থান-সংক্ষেপ,—ইহা কি বিজ্ঞান-সঙ্গত একটা সুবিধা নহে? যাহা হোক আমরা এই প্রসঙ্গটা অহেতুকভাবে বাড়াইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু মনে হয়—ইহা একেবারে অবান্তর নহে। আশুতোষ যে সকল সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর হয়ত বাঙ্গলা-বিভাগকে আরও কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে

হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান ভাইস্‌চ্যান্সেলর বয়সে তরুণ হইলেও খুব শক্ত মাঝি; শুনিলাম, কোন অধ্যাপক রোমান্‌-অক্ষরে বাঙ্গলা-বহি ছাপাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় তাহা হইতে পারে নাই। আমি যতদূর আশুতোষকে জানিয়াছিলাম, তাহাতে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তিনি কোনক্রমেই এরূপ চেষ্টার প্রশ্রয় দিতে সম্মত হইতেন না। মুসলমান সম্রাটগণের কেহ কেহ বঙ্গীয় লিপির স্থলে আরবী অক্ষর চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা সেই প্রাচীন ইতিহাসেরই পুনরভিনয়।

ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বাঙ্গলা-বিভাগ ছাড়া আর একটি বিভাগের কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি। বেশীদিন নহে, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গদেশের তরুণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্প লোকই অশোকের নাম জানিত, তদপেক্ষাও অল্প লোক গুপ্ত ও পাল-রাজাদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিত। যাঁহাদের মেরাথন ও থার্ম্মপলির নাম শুনিলেই অঙ্গে কাঁটা দেয়, তাঁহারা নালান্দা ও বিক্রমশীলা-বিহারের নামও জানিতেন না; যাঁহারা এরেস্‌মাস ও গ্যালাহেড প্রভৃতি সাধু ও ভক্তদের নাম শুনিয়া অজ্ঞান হইতেন, তাঁহারা বাঙ্গলার দীপঙ্কর, ভদ্রশীল ও শান্তরক্ষিতের নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে য়ুরোপের প্রাচীন ও আধুনিক রাজাদের বিবরণী যাঁহাদের নখাগ্রে ছিল, তাঁহারা সমুদ্রগুপ্ত, গোপাল বা দেবপালের নাম পর্য্যন্ত জ্ঞাত ছিলেন না; যাঁহারা পোপোক্যাটিপেটেল, কামস্কাট্‌কা ও পম্পিয়াইএর সংস্থান নিমেষমাত্রে মানচিত্রে অঙ্গুলীসঙ্কেতে দেখাইতে পারিতেন, তাঁহারা রাজগৃহ ও পাটলীপুত্র কোথায়, তাহা বলিতে পারিতেন না।

আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের জাতীয় গৌরবের স্মৃতি জাগ্রত করিবার জন্য আশুবাবু দ্বারভাঙ্গা বিদ্যায়তনের দ্বার প্রথম উদ্‌ঘাটন করিলেন। তৎপূর্ব্বে ইতিহাসের এম্‌, এ-গণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের 'ক' 'খ'-এর উপর মাত্র হাত ঘুরাইতেছিলেন, কিন্তু এদেশের রাজৈশ্বর্য্যের কথা একেবারে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে লুক্কায়িত ছিল। মহামনা উইলসন্‌ সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত করিয়া যে দীপ জ্বালাইয়াছিলেন, আশুবাবু

তাহা আমাদের বিদ্যা-পীঠে আনিয়া সেই আলোকে এ দেশের শিক্ষার্থীদের মোহ-ধ্বান্ত দূর করিয়া দিলেন। তাঁহার অনুপ্রাণনায় বহু অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী এদেশের প্রাচীন ইতিহাস-উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইলেন। ডাঃ ভাণ্ডারকরকে আনিয়া তিনি এই বিভাগের ভিত স্থাপন করিলেন। এখন রমেশচন্দ্র মজুমদার, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ বসাক, প্রভৃতি পণ্ডিতেরা জাতীয় ইতিকথা-উদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন,—ইহা সেই মহামনা আশুতোষের উৎসাহের ফলে। এই বিভাগে ডাঃ ষ্টেলা ক্রেমরিশের মত প্রতিভাশালিনী মহিলা ভারতীয় শিল্প-কলা-বিদ্যার উপর যে নিত্য নূতন আলোকপাত করিতেছেন, তাহাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভারত-বিশ্রুত অবদানের ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কুমার শরৎকুমার রায় তাঁহার একান্ত নিঃস্বার্থ দানশীল, অকুণ্ঠ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে পাহাড়পুরের স্তূপ হইতে যে অমূল্য ইতিহাসের সন্ধান দিতেছেন,—আশুবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া সেই কার্য্য পূর্ণতার দিকে আনয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই বিভাগের জন্য বহু ব্যয় আবশ্যক, অনেক প্রাচীন, বহুমূল্য পুস্তক আমাদের লাইব্রেরীতে এখন সংগৃহীত হইয়াছে। নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ্রের দিনেও এই সংগ্রহের জন্য যে অর্থ আবশ্যক, তাহা ব্যয় করিতে তিনি কার্পণ্য করেন নাই। রাজভাণ্ডার তাঁহার করায়ত্ত ছিল না, কিন্তু তাঁহার হৃদয়টি ছিল রাজার মত উদার ও হস্ত ছিল রাজার মত মুক্ত। এই উদারতা না থাকিলে ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজনানুসারে সর্ব্ববিধ সুবিধা না দিলে, কখনই তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যে সফলতা দেখাইতে পারিতেন না। এইভাবে 'এন্থ্রপলজি'

নৃতত্ত্ব

নৃতত্ত্ব-বিভাগের জন্যও তিনি অকুণ্ঠিতভাবে ব্যয় করিয়াছেন। কোথায় কোন্ বিষয়ের কোন্ পণ্ডিত আছেন, তাহার সমস্ত খবর তিনি জানিতেন; যোগ্য ব্যক্তি কোন্ দেশবাসী, কোন্ মতাবলম্বী, এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার মত সঙ্কীর্ণতা তাঁহার ছিল না। অধ্যাপক-নিয়োগের সময় সে ব্যক্তি মহারাষ্ট্র কি সিন্ধিয়ার লোক, গুজরাট কি মলয়ালম্-বাসী তাহা বিচার করিতেন না, সর্ব্বত্র গুণের পূজার জন্য তাঁহার হস্ত পুষ্প কুড়াইত, কোন সম্প্রদায় বা ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত অনুরাগ বা বিরাগ ছিল না;

তিনি এই দেশকে সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য-মুক্ত, এক উন্নত জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত দেখিতে চাহিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্‌লামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি তাঁহার উদ্ভাবিত অপর একটি বৃহৎ ভবিষ্য সম্ভাবনার ক্ষেত্র। ত্রিবাঙ্কুর হইতে তিনি রাও-বাহাদুর অনন্তকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া 'এন্‌থ্রপলজি'-বিভাগের ভার অর্পণ করিলেন, এই বিষয়ে রাও বাহাদুর একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আশুবাবুর সহিত বিরোধ করিয়া মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইরূপ একটি পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছিলেন, যাহাতে সেই প্রাচীন ইতিহাসজ্ঞ মহাপণ্ডিতের সহযোগিতা হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঞ্চিত হইয়া রহিল।

এখনও মুসলমানদের কীর্ত্তি দেশময় পড়িয়া আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ-কীর্ত্তির অনেকগুলিই বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মাটির নীচে গা-ঢাকা দিয়া আছে, তাহা উদ্ধার করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু মুস্‌লিম-কীর্ত্তি এখনও পৃথিবীর উপর মাথা জাগাইয়া আছে, তাঁহাদের লিখিত বহু পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে; ইস্‌লামিক সংস্কৃতির পথ সুগম করিয়া দিয়া আশুতোষ মুসলমানদের যে সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাদ্বারা তাঁহারা অচিরে বিশেষরূপ উপকৃত হইবেন, ইহা আমরা আশা করি। তিনি মুসলমানদিগকে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহার পরিচয় আমি অনেক সময়ে পাইয়াছি। তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ও প্রীতিভাজন ভক্ত ছিলেন আব্দুল্লা সরওয়ার্দ্দী ও হাসান সরওয়ার্দ্দী। যেদিন (তখনও ইঁহারা 'স্যার' হ'ন নাই) আশুতোষ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হ'ন, সেদিন আব্দুল্লা সরওয়ার্দ্দী তাঁহার ভৃত্যগণকে অনেকগুলি টাকা বখ্‌শিশ্‌ দিয়াছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমি আব্দুল্লার পকেট হইতে অবশিষ্ট ৫০৲ টাকার নোট কাড়িয়া লইলাম এবং বলিলাম—"এ দিচ্ছি না, এই আনন্দের দিনে এ টাকা আমরা সন্দেশ খাওয়ার জন্য রাখিয়া দিব।" আব্দুল্লা সরওয়ার্দ্দী হাসিয়া বলিলেন—"বেশ, টাকা রাখুন, যদি বেশী কিছু দরকার হয়; তবে আরও দিতে পারি।" দুই-এক মিনিট পরে তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি আশুবাবুকে বলিলাম—"টাকা তো ফিরাইয়া দেই নাই, হয়ত উনি নীচে অপেক্ষা করিতেছেন, এখনই টাকার জন্য আবার আসিবেন।" উত্তরে তিনি বলিলেন—"আপনি শীঘ্র

ইস্‌লামিক সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ

যান, আপনি লোক চিনেন না; ইঁহারা যে-সে মুসলমান নহেন,—ইঁহাদের খান-দান যেমন উচ্চ, মনও তেমনই উদার; ইঁহাকে শীঘ্র পাকড় করিয়া টাকা ফিরাইয়া দিন, ইনি উহা সহজে লইতে চাহিবেন না।" প্রকৃতই শেষে সেই টাকা ফিরাইয়া দিতে আমাকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও সাহিত্যে আশুতোষের বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। ভারতীয় ইতিহাসে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের স্থান কত উচ্চে, তাহা এই বিষয়ে যাঁহারা গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন। য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু শিক্ষা-কেন্দ্রে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও ইতিহাস-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে এবং অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বৌদ্ধ-ইতিহাসে গবেষণা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ইতিহাস-শিক্ষাদানের এবং গবেষণার কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থাই ছিল না। 'মহাবোধি'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ধর্ম্মপাল এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের সহযোগিতায় আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি-বিভাগের প্রবর্ত্তন করেন। পালি-শিক্ষার উৎকর্ষের ফলে বাঙ্গলা-দেশে আজ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, দর্শন ও ইতিহাসের দিকে যে অনেকের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তাহা এই সকল বিষয়ে লিখিত বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও পুস্তক হইতেই প্রমাণিত হয়। পালি-শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার প্রচলন না করিলে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস-সম্বন্ধে বাঙ্গালীর জ্ঞান পঙ্গু ও অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিত। ভারত ও ভারতের বাহিরের বিরাট্ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সহিত আশুবাবুর জীবন্ত সম্বন্ধ ছিল। তিনি বহু বৎসর মহাবোধি-সোসাইটির সভাপতি ছিলেন এবং এই সমিতির জন্য তাঁহার প্রচেষ্টার কথা সিংহল-দেশীয় ভিক্ষু ধর্ম্মপাল ও তদীয় সহকর্ম্মিগণ কৃতজ্ঞতার সহিত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের অস্থি-প্রতিষ্ঠা

কলেজ-স্কোয়ার-স্থিত মহাবোধি-বিহারে বুদ্ধদেবের যে অস্থি সংরক্ষিত আছে, এবং যাহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর দেশ-বিদেশ হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়, তাহার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সহিত আশুতোষের স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত। এই অস্থি-চিহ্ন ভট্টিপ্রোলু হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল এবং ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গলার তদানিন্তন লাটসাহেব লর্ড রোলাণ্ড্‌সেকে এই মহাপবিত্র ও মূল্যবান্ সামগ্রী

তর্ক-পঞ্চানন, ন্যায়-সাগর, ন্যায়-পঞ্চানন প্রভৃতি ঔপাধিক পণ্ডিতগণ পাওয়া যাইত। এ দেশের যে ন্যায়-শাস্ত্র এককালে এরূপ দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল, এবং যাহার চর্চ্চা ঘরে ঘরে হইয়া বাঙ্গালীকে সর্ব্ব জাতির কাছে এতটা গরীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল,—দুঃখের বিষয়, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সেই নব্য ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন—"এই নব্য ন্যায় এতই সূক্ষ্ম যে, ব্যবহারিক জীবনে ইহার কোন সার্থকতা নাই।" কোন কোন সাহেবের মতের তিনি প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন মাত্র; এই মত ঈসপের 'আঙ্গুর ফল বড় টক'—গল্পটির নীতির প্রমাণ-স্বরূপ। মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতী তর্কতীর্থের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহার কাছে একটি ইংরাজ ছাত্র এক বৎসর এবং একটি জার্ম্মান্ ছাত্র দুই বৎসর ন্যায়-শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহা দুর্ব্বোধ্য মনে করিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া গিয়াছিলেন। মনস্তত্ত্বের এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, প্রতিটি আভিধানিক শব্দের অর্থ-বিচার নব্য ন্যায়ে যেরূপ আছে, জগতের কোথায়ও তাহার তুলনা নাই। উচ্চাঙ্গের গণিত-শাস্ত্রের এমন অনেক কথা আছে, ব্যবহারে যাহার কোন প্রয়োজন হয় না। যীশু খৃষ্টের উপদেশ—'Sermon on the Mount',—এক গালে চড় মারিলে, আর এক গাল ঐরূপ প্রহারের জন্য ফিরাইয়া রাখিবে,—যে তোমার প্যাণ্টালুন চুরি করিয়াছে, তাহাকে কোট্‌টাও ছাড়িয়া দাও,—যে তোমাকে এক মাইল বেগার খাটাইয়াছে, তাহার কাজে যাইয়া দুই মাইল বেগার খাটিয়া আইস, এবং পরমহংস-দেবের নানা উপদেশ,—এই সকলেরই বা ব্যবহারিক জীবনে কি প্রয়োজন আছে? কোহিনুর দিয়া বাজারের কোন দ্রব্য ক্রয় করা চলে না,—তাহারই বা কি মূল্য আছে? কিন্তু যদি মনোরাজ্যের উন্নতি ও চিন্তাশীলতার উৎকর্ষ-সাধন বাঞ্ছনীয় হয়, তবে তদ্ভাবে ভাবিত সূক্ষ্মদর্শী উচ্চদরের লোকদের নিকট নব্য ন্যায় অমূল্য।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত-বিভাগের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তিনি নব্য ন্যায়-অধ্যয়নে বাধা দিলেন। সুতরাং সংস্কৃত-শাস্ত্রের যে অংশটি বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান, বাঙ্গলার প্রধান বিদ্যা-পীঠে তাহার স্থান হইল না। আশুবাবুর মনোনয়নে ও চেষ্টায় যিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং যিনি সত্য সত্যই নানা দুর্লভ গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন,

এবং পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-গুণে যিনি শিক্ষিত সমাজের ভূষণ-স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারই প্রবল বাধায়, বাঙ্গলার নব্য ন্যায় বাঙ্গলার প্রধান নগরীতে—তথা ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিদ্যা-কেন্দ্রে প্রবেশের পথ পাইল না।

আশুবাবু এ কথাটি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন, যিনি সুদক্ষ ব্যক্তি, তিনি যদি কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস-ভাজন হ'ন এবং অবাধে কার্য্য করিবার সুবিধা পান, এবং প্রয়োজনোপযোগী উপকরণ সমস্ত সময়েই ইচ্ছানুসারে তাঁহার আয়ত্ত থাকে, তবে তাঁহার কার্য্যের ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে। তাঁহাকে স্বাধীনতা দিলে, তিনি যতটা তাঁহার সাধ্য, ততটা কাজ করিতে উৎসাহিত হইবেন। এই কর্ম্মফল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট্‌গ্রাজুয়েট্‌-বিভাগে পাইয়াছিলেন। মোটকথা, এই বিশ্ব-প্রকৃতিতে যেরূপ অবারিত কর্ম্ম-প্রবাহ চলিতেছে, তাহার প্রেরণা কোন মূলশক্তি হইতে নিশ্চয়ই হইতেছে, অথচ সেই শক্তি সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ নহে,—সেইরূপ আশুবাবুর গড়া এই প্রতিষ্ঠানটি বহু লোকের সমবেত চেষ্টায়, কিন্তু অলক্ষিতভাবে তাঁহারই ইঙ্গিতে চলিত; কিন্তু তিনি প্রতি খুঁটি-নাটি ব্যাপারে তাঁহার সত্ত্বা বুঝাইতে ব্যগ্র ছিলেন না। যোগ্য ব্যক্তির সামর্থ্য পূর্ণরূপে উদ্বোধিত করিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া কাজ করাইয়া লইতেন। এই বিশ্বাস, এই প্রেরণা যাঁহারা দিতে পারেন, তাঁহারা মানব জাতির প্রকৃত রাজা, প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্র ছিল দূর-প্রসারিত এবং অসীম। তিনি লোকের গুণ যতটা বুঝিতেন, সেরূপ গুণ-বোদ্ধা দ্বিতীয় ব্যক্তি আমি আমার এই ৭০ বৎসর বয়সে আর একটিও দেখি নাই। যে মুহূর্ত্তে তিনি কাহারও কোন গুণ বুঝিতেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া সেই গুণের পরিপুষ্টি করিতেন। এখনও হয়ত এদেশে গুণীর অভাব নাই, কিন্তু দূর বনে যেরূপ কুসুম-কলি অতি সন্তর্পণে পাতার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া রৌদ্র-তাপে ঝরিয়া পড়ে,—বিকাশ পায় না, এদেশের গুণীরা সেইরূপ অভাবের তাড়নায় ও উৎসাহের অভাবে আড়ষ্ট হইয়া আছে;—কে তাঁহাদিগকে চিনিবে?—কে আর আশুবাবুর মত সংস্পর্শে আসা মাত্র বলিবে, এটি পারিজাত পুষ্পের কুঁড়ি, এটি গোলাপের কুঁড়ি, এটি ফজলী বা নেংড়া আমের চারা? সেই গুণ, যাহা অশোকের ছিল, যাহা সমুদ্র গুপ্তের ছিল,

যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সম্পূর্ণরূপে ভার ছাড়িয়া দেওয়া

যাহা বিক্রমাদিত্যের ও রাণী এলিজাবেথের ছিল, সেই দুর্লভ গুণটি আমাদের আশুতোষের ছিল। একান্ত সুলভ বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা তখন বুঝিতে পারি নাই, এখন প্রতি মুহূর্ত্তে সেই নর-দেবতার অভাব অনুভব করিতেছি।

তিনি নিজের সত্তা ও প্রতিভার মোহে আড়ষ্ট হইয়া পৃথিবীর অন্য সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, শুধু নিজের বীণাধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া, তাহারই প্রতিধ্বনি অপরের কণ্ঠে শুনিতে উন্মুখ হইতেন না। এই বিশ্ব-নাট্যশালার তিনি একমাত্র নট, এই বিশ্বাসে তদীয় 'তাণ্ডব' দ্বারা তাঁহার তপস্যার স্থল, তাঁহার আশ্রমটি নাচাইয়া তুলিতেন না—লোকালয়ের বহু দূরে গিরি-গুহা খুঁজিয়া কেবল স্বীয় সত্ত্বাকে ভালরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য, আত্মরমণের ব্যবস্থা করিতেন না,—তিনি এই বিশাল নগরীর কর্ম্ম-কেন্দ্রে বহুর মধ্যে নিজেকে গোপন করিয়া সকলকে দিয়া তাঁহার উদ্দিষ্ট, বিরাট্ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া লইতেন। তিনি দার্শনিককে দিয়া দর্শন, সাহিত্যিককে দিয়া সাহিত্য, গণিত ও জড় বিজ্ঞানের পণ্ডিতের দ্বারা সেই সেই বিদ্যার উন্নতি-সাধনে প্রেরণা দিয়াছেন। তিনি ছিলেন শক্তিশালী, সকলের শক্তির উদ্বোধন করিয়া তিনি আত্মশক্তি গোপন রাখিতেন, এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপর নিজ সীল-মোহর অঙ্কিত করিয়া এক ছাঁচে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি ঢালাই করিয়া লইতেন না, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেপণী-বাহিত তরীখানি, বহু সুদক্ষ ও নিপুণ ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত করিয়া স্বয়ং কেবল কাণ্ডার ধরিয়া থাকিতেন।

পোষ্টগ্রাজুয়েটের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাটি তাঁহারই দ্বারা সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত; কোন কীট যেরূপ যে পথ দিয়া চলিয়া যায়, কেবলমাত্র সেই পথের ক্ষুদ্র অংশটির জ্ঞানই তাহার হয়, সমগ্রভাবে পথ সে চিনে না, আমরাও সেই ভাবে যা'র যা'র সীমাবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-ক্ষেত্রের কর্ত্তব্য বুঝিতাম, সমগ্র ব্যাপারটি বুঝি নাই। যেরূপ সন্তরণ-শীল ব্যক্তি প্রতিটি তরঙ্গ দর্শন করিয়া যায়, সমগ্র নদী-প্রবাহটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, আমরাও সেইরূপ যা'র যা'র বিভাগের কর্ত্তব্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিতাম, সমগ্রভাবে এই বিদ্যায়তনের মহাযন্ত্র-শালাটির সম্বন্ধে আমাদের

জ্ঞান ছিল ভাসা ভাসা। এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য সর্ব্ববিধ-ক্ষমতাশালী বাহুর প্রয়োজন হইত। পোষ্ট্‌গ্রাজুয়েটের নানা বিভাগের তহবিল সব সময় ভিন্ন ভিন্ন থাকিত না, সাধারণ ভাণ্ডারের টাকা প্রয়োজনমত সমস্ত বিভাগের কাজেই ব্যয়িত হইত। এ সকল ব্যাপারে পরস্পরের স্বার্থের সংঘর্ষ হওয়া আশ্চর্য্য নহে,—সকলেই যা'র যা'র বিভাগের স্বার্থ বড় করিয়া দেখায় একটা কাড়াকাড়ি হয়ত হইতে পারিত। কিন্তু আশুবাবু প্রত্যেক বিভাগের অভাব-অভিযোগ, এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিতেন এবং যে বিভাগের জন্য যত টাকার প্রয়োজন এবং যাহা ভাণ্ডারের অবস্থা-দৃষ্টে সংকুলন করা সাধ্যে কুলাইবে—তাহা এত পরিষ্কার-ভাবে বুঝিতেন যে, তিনি পোষ্ট্‌গ্রাজুয়েটের সমস্ত কার্য্য একাই নিয়ন্ত্রণ করিতেন; আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার বিশাল ভুজাশ্রয়ের মধ্যে যেন কতকটা সুপ্ত হইয়া থাকিতাম এবং সকলেই জানিতাম, যে বিভাগের জন্য যাহা কিছু দরকার, তাহার ব্যবস্থা তিনিই উৎকৃষ্টভাবে করিবেন; এ সকল বিষয়ে চিন্তা করিবার ভার আদৌ আমাদের ছিল না, স্বীয় স্বীয় বিভাগে কাজ করিয়া যাইতাম,—এই পর্য্যন্ত। যদি অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের জন্য কোন অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হইত, তাহা যত বেশীই হউক না কেন, তাহার উপকারিতা ও আবশ্যকতা আশুবাবু হৃদয়ঙ্গম করিলে তাহার ব্যবস্থা করিতে তিনি একটুও পশ্চাৎপদ হইতেন না। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন তাঁহার সময়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইত; কারণ সভার কর্ম্ম-তালিকা এবং প্রতিটি বিষয়ে কি করিতে হইবে, তাহার সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি বিভাগের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আগেই করিয়া রাখিতেন এবং আমরা সভায় উপস্থিত হইয়া তাহা একরূপ শুনিয়া আসিতাম মাত্র। তিনি আলোচনায় বাধা দিতেন না, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত যে, তাহাতে প্রায়ই কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। কেবল 'কোরাম' না হইয়া সভা পণ্ড না হইয়া যায়, এজন্য তিনি সদস্যদের উপস্থিতির উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন,—কেহ উপস্থিত না হইলে তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইত। যে জিনিষটা ভাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতার্থে পরিকল্পিত

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি

হইত, তাহা যত বৃহৎ ও ব্যয়সাধ্যই হোক না কেন, আশুবাবু তাহা শ্রুতি-মাত্র অঙ্গীকার করিতেন। অনেক সময় আমরা কোন বড় কাজের জন্য তাঁহাকে বলিতে যাইয়া উহা ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার মনে করিয়া তাহা অতি দ্বিধা ও আশঙ্কার সহিত তাঁহাকে জানাইয়াছি, কিন্তু তিনি হয়ত যেন না ভাবিয়া—না চিন্তিয়া তখনই তাহা স্বীকার করিয়া ফেলিতেন। আমরা এতটা আশা করি নাই; সুতরাং তাঁহার এই অবিলম্বে সম্মতি দেওয়াতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতাম। আবার অন্য দিকে যদি এমন কিছু চাহিয়াছি, যাহার ব্যয় কপর্দ্দক-মাত্র এবং তাহাতে যে সম্মতি পাইব, তৎসম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ মনে হইত না,—তাহা অপ্রয়োজনীয় মনে করিলে, এরূপ ক্ষুদ্র ব্যাপারেও তিনি ঘোর বিরক্তি জানাইয়া অস্বীকার করিয়া বসিতেন,—ক্ষুদ্র বলিয়া তিনি তাহা অনায়াসে মঞ্জুর করিয়া ফেলিতেন না। মোট-কথা, নেপোলিয়ান যেমন সমস্ত গ্লোবটি টেবিলের উপর রাখিয়া কোন্ রাজ্য-সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে,—সেই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, কলিকাতার এই মহা-বিদ্যায়তনের সমগ্র যন্ত্রটিও সেইরূপ তাঁহার চক্ষের সম্মুখে থাকিত, একটা তিল-প্রমাণ বাধা তাঁহার চক্ষু এড়াইত না এবং যাহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া মনে হইত, তাহারও গুরুত্ব তিনি উপেক্ষা করিতেন না। যদি তাহা তাঁহার কাছে অসমীচীন মনে হইত, সে বিষয় কিছুতেই তিনি অনুমোদন করিতেন না,—অথচ কোন মস্ত বড় প্রস্তাব—যাহার জন্য অর্থাদির সংস্থান তাঁহার তন্মুহূর্ত্তে আয়ত্ত থাকিত না—তাহাও সেই যন্ত্রের পরিচালনার জন্য দরকার,—একথাটি যখনই বুঝিয়াছেন, তখনই আগ্রহ-সহকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-বিভাগ, কলাবিদ্যা-বিভাগ, সঙ্গীত-বিভাগ—এইরূপ নানাবিধ নব-নব বিভাগের প্রবর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প তাঁহার ছিল। হায়! তাঁহার স্বল্পস্থায়ী জীবনে সেই বিরাট্ প্রস্তাবনা কার্য্যে পরিণত করার অবসর কুলাইল না!

আশুবাবুর স্বর্গারোহণের পর কতকদিন পর্য্যন্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভা যে কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষদর্শীদের এখনও মনে থাকিবার কথা। আশুবাবু নিজেই সমস্ত কাজ করিয়াছেন, অপরকে কিছু করিতে দেন নাই,—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার জনৈক সভাপতি স্থির

করিলেন, সকলকেই আলোচনার সুবিধা দিতে হইবে; বিশ্ববিদ্যালয়টা একার ব্যাপার নহে, সকল সদস্যই যাহাতে মত প্রকাশ করিবার সুযোগ পান, তাহাই সর্ব্বতোভাবে দেখিতে হইবে। এই অলোচনার সুবিধা দেওয়ার

তাঁহার স্বর্গারোহণের পর

ব্যপদেশে এমন কাক-কোলাহল হইতে লাগিল যে, যাহা চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইত, তাহা ৭।৮ ঘণ্টায়ও শেষ হইত না। এই বাজারের কলরব বিকাল তিনটা হইতে কখনও কখনও রাত্রি' আটটা পর্য্যন্ত কিছুতেই থামিতে চাহে নাই। সভাপতিমহাশয় লাগাম ছাড়িয়া দিতেন, কিন্তু ঘোড়-দৌড় থামিত না, তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। মোটকথা, আশুবাবু কোনদিন আলোচনায় বাধা দেন নাই, তাঁহার পুরুষোচিত, অভিজ্ঞ কণ্ঠ-স্বরের কাছে সদস্যগণের কথাবার্ত্তা শিশুদের উক্তির মত ঠেকিত; তাঁহারা তাঁহার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব ও শিক্ষা-সম্বন্ধে পরিণত বুদ্ধি মানিয়া তাঁহার শাসনাধীন হইতেন,—এখানে জোর-জবরদস্তির কিছুই ছিল না। আশুবাবুর অভাবে তহবিল লইয়া কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল। যে বিভাগ যতটা বেশী টাকা বৎসরের বাজেটে নিজেদের দিকে টানিয়া আনিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টিত হইল। যদি কোন বোর্ডের সদস্য কোন বিশেষ সভার অধিবেশনে উপস্থিত না হইতেন, তখন দেখা যাইত, ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় তাঁহার বিভাগ একেবারে উপেক্ষিত হইয়াছে। কোথায় সেই সর্ব্বদর্শী চক্ষু, যাহার দৃষ্টি প্রত্যেক বিভাগের উপর সমানভাবে পড়িত এবং সকলেই তাঁহার ব্যবস্থা নির্দ্দোষ এবং সুচিন্তিত বলিয়া মাথা নত করিয়া মানিয়া

পুরস্কার ও বৃত্তি-দানে বিভ্রাট্

লইত! বৃত্তি বা পুরস্কার-প্রার্থীর মধ্যে দশ জন দশ বিষয়ে সন্দর্ভ লিখিয়া পরীক্ষকদের নিকট প্রশংসা পাইয়াছেন,—বিষয়গুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন,—কোনটি হয়ত বা গণিত-সম্বন্ধে, কোনটি বা সাহিত্য-সমালোচনা অথবা দর্শন-সংক্রান্ত। পরীক্ষকেরা দশটির প্রত্যেকটিই উৎকৃষ্ট বলিয়া ছাপ মারিয়া দিয়াছেন,—হয়ত উহার মধ্যে চার-পাঁচ জন বা তাহা অপেক্ষাও অল্প-সংখ্যক ছাত্র বৃত্তি পাইবে। এই বিভিন্ন বিষয়ের গুণাগুণের তারতম্য করিয়া বৃত্তি দান করা কি করিয়া হইবে? সুতরাং সভায় পরীক্ষকদের মধ্যে কলরব হইতে লাগিল। যে পরীক্ষকের কণ্ঠ-স্বর

উচ্চ এবং যিনি অপরকে দমাইয়া রাখিবার মত বক্তৃতা করিতে পারিতেন, তাঁহার পরীক্ষিত কাগজেরই জয়-জয়কার। মৃদুস্বভাব পরীক্ষক মিন্‌মিন্‌ করিয়া বলিলেন—"মহাশয়গণ, আমার বিষয়ের ছেলেটি ভাল।" "কেমন ভাল?"—"খুব ভাল, অর্থাৎ খুব ভাল,—ইহা অপেক্ষা তো আমি অর্থ-পরিষ্কার করিতে পারি না।" যাঁহার কণ্ঠ-স্বর উচ্চ, তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি জিহ্বাগ্রে আনিয়া বলিলেন,—"সভাপতি মহাশয়, উনি তো উঁহার পরীক্ষিত কাগজটি বৃত্তির যোগ্য,—একথাটি বলেন নাই!" (এসময় পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষক বলিলেন,—"খুব ভাল, মানে বৃত্তির যোগ্য।")—"না, এখন বলিলে চলিবে না, পূর্ব্বে তো 'যোগ্য' এ কথাটি বলেন নাই!" সেই উচ্চকণ্ঠ পরীক্ষক বলিলেন,—"আমি যে কাগজটি ভাল বলিয়াছি, তাহা উৎকৃষ্ট, যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট, সর্ব্বতোভাবে বৃত্তির যোগ্য, আপনারা চোখ বুজিয়া আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারেন, এই ছাত্র বৃত্তি পাওয়ার সর্ব্বতোভাবে যোগ্য।" তাঁহার তীব্রস্বর কক্ষের প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই মৃদুভাবাপন্ন পরীক্ষকের কণ্ঠ ডুবাইয়া দিল; সুতরাং "মৃদুহি পরিভূয়তে।" তাঁহার পরাজয় অবশম্ভাবী হইল। আর এক পরীক্ষক বলিলেন,—"বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে রচিত, আমার পরীক্ষিত এই প্রবন্ধটি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এই প্রার্থী সর্ব্বতোভাবে বৃত্তির যোগ্য।" অপর একজন ভৈরব-কণ্ঠ পরীক্ষক চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ভাষা-সম্বন্ধে আমার এই কাগজখানিতে এমন সুন্দর প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, যাহার তুলনা নাই। এই প্রার্থী বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য।" বঙ্কিম-সমালোচনার প্রবন্ধটির পরীক্ষক বলিলেন,—"মহাশয়, দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিচার চলিবে কিরূপে? এরূপ বিচার কি সঙ্গত?" তাঁহার প্রতিবাদী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"মহাশয়, থামুন, বঙ্কিমবাবুর উপর লেখা প্রবন্ধ আর ভাষা-তত্ত্বের উপর লেখা প্রবন্ধ! উভয়ের কোন্‌টি গুরুত্বে বেশী, তা' কি বুঝিতে পারিতেছেন না?" তিনি উত্তরে বলিলেন,—"প্রতি বিষয়ই যখন আপনারা অনুমোদন করিয়াছেন, তখন সকল বিষয়েরই সমান গুরুত্ব মনে করিতে হইবে।" "কিন্তু ভাষাতত্ত্বের নিকট বঙ্কিম-সমালোচনা একেবারেই দাঁড়ায় না।" এইরূপে সন্দর্ভের উৎকর্ষ-অপকর্ষের

সুবিচার অনেক ক্ষেত্রেই হইত না,—বাগ্‌যুদ্ধে পরস্পরকে পরাজিত করিবার প্রবল প্রতিযোগিতা চলিত মাত্র।

কিন্তু আশুবাবু ভাল ছাত্রদের গুণপনা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জানিতেন। পরীক্ষায় যাঁহারা ভাল হইয়াছেন, যাঁহারা নীরব-কর্ম্মী, যাঁহারা প্রতিভাবান্, তাঁহাদিগকে তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতেন। সুতরাং যাঁহারা বৃত্তি বা পুরস্কার-প্রার্থী, তাঁহাদের সকল ছাত্রেরই গুণপনা তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। বিশেষতঃ অধিকাংশ বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তি থাকাতে তাঁহার নির্ব্বাচন অভ্রান্ত হইত। তাঁহার সময় এইজন্য বিচার-বিভ্রাট্ একেবারেই হইত না এবং এই সকল বিসংবাদিত বিষয় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুসম্পন্ন হইয়া যাইত। যেখানে এইরূপ বৃত্তি-সংক্রান্ত স্বার্থ,—সেখানে তিনি প্রকৃত গুণী ছাত্রকে বাছিয়া বাহির করিয়া উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার মত গুণের পক্ষপাতী, গুণগ্রাহী ব্যক্তি বঙ্গদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে দ্বিতীয়টি ছিলেন না।

তাঁহার অভাবে প্রথম কয়েক বৎসর শিক্ষা-সংক্রান্ত এইরূপ গোলমাল চলিয়াছিল। সিংহ-গর্জ্জন থামিয়া গেল; সুতরাং ব্যাঘ্র, ভল্লূক প্রভৃতির কলরবে কতক দিনের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

অধ্যাপক ও পরীক্ষক-নিয়োগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটের সংখ্যা আশুবাবুর নখাগ্রে ছিল এবং তিনি তরুণ ও প্রবীণ গ্রাজুয়েটদের বহুসংখ্যকের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন যে, একজনের পক্ষে এত লোকের খবর রাখা সুকঠিন। যাঁহারা ইঁহাদের মধ্যে গুণগরিষ্ঠ, তাঁহাদের সকলকেই প্রায় তিনি চিনিতেন। যাঁহারা প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন, কিংবা নীরবে কোন গুরুতর বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের সকলেই যাচিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিতেন। আশুবাবু ইঁহাদের সংসর্গ ভালবাসিতেন এবং যোগ্য ব্যক্তিকে যথাসাধ্য উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করিতেন। অনেক সময় তিনি তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতেন। একসময়ে একজন সংস্কৃতের অধ্যাপকের প্রয়োজন হইল। তিনি ক্যালেণ্ডার খুঁজিয়া অমরেশ্বর ঠাকুরের

নাম বাহির করিলেন এবং হৃষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"দেখেছ, এই লোকটি সংস্কৃতের তিন বিভাগে এম্, এ-উপাধি পাইয়াছেন। এরূপ বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতকে আমরা এতদিন উপেক্ষা করিয়াছি।" অমনই তাঁহাকে অধ্যাপকের পদ দিয়া এখানে আনা হইল। আশুতোষের তো অবসর ছিলই না; যদি কোন সময়ে একটু অবসর পাইতেন, অমনই ক্যালেণ্ডারটি ভাল করিয়া দেখিতেন। পোষ্ট্‌গ্রাজুয়েটের প্রাদেশিক ভাষা-বিভাগে অনেক ভাষার পণ্ডিতের দরকার হইয়াছিল। তিনি বোম্বাই, কলিকাতা, বেনারস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার খুঁজিয়া কৃতী ছাত্রদের নামের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়াছিলেন। যাঁহারা বিশেষ কোন গুণপণার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তিনি পত্র ব্যবহার করিতেন; এইভাবে নেপাল, তিব্বত ও রেঙ্গুন প্রভৃতি দেশের অধ্যাপকদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রেরণায় এদেশের যে সকল প্রতিভা-সম্পন্ন অধ্যাপক জগতের সমস্ত শিক্ষা-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কি আর্ট-বিভাগে, কি বিজ্ঞানে বহু অধ্যাপক অসাধারণ কর্ম্ম-ক্ষমতা, প্রতিভা ও গবেষণার মৌলিকতার দ্বারা সুযশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। ডাঃ সি, ভি, রমণ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সমগ্র বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর অলঙ্কার। বিজ্ঞান-বিভাগে স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় অনেককেই প্রেরণা দিয়াছেন; কিন্তু এই জগন্মান্য মহা-অধ্যাপককে তিনি অজস্র অর্থের ভাণ্ডার খুলিয়া পালিত ও ঘোষের বিপুল অবদান দ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি কাণ্ডারী ছিলেন বলিয়া সি, ভি, রমণ বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিভা জাগিয়া উঠিয়াছে,—নতুবা তাহা লোক-লোচনের অন্তরালে ফুলের কুঁড়ির মত ফুটিয়া ঝরিয়া যাইত, একথা একবার বলা হইয়াছে।

কিন্তু মাঝে মাঝে শত চেষ্টা সত্ত্বেও দৈব তাঁহার প্রতিকূল হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত গুণীকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আনিতে পারিলেন না। এ বিষয়ে শাস্ত্রীমহাশয় যে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাহা নহে। ইতিহাস

বিভাগে কারমাইকেল চেয়ারের জন্য তিনি প্রার্থী ছিলেন,—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ব্যাপারেও তিনি সময় সময় কাজ করিয়াছেন; তথাপি আশুবাবু তাঁহাকে পান নাই। কে দোষী, কে নির্দ্দোষ, তাহার বিচার করা আমার পক্ষে প্রগল্‌ভতা। কিন্তু আমি যতটা জানিয়াছি, হরপ্রসাদ আশুবাবুর শাসন মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। যে নবসংগঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুবাবুর এতখানি নিজের কৃত এবং যাহার পরিচালনার জন্য তিনি অহর্নিশ চিন্তা করিতেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে যিনি বাধা দিবেন বা ভিন্নরূপ গড়ন দেওয়ার চেষ্টা করিবেন, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও যাঁহার সঙ্গে মতের গড়মিল হইবে, এমন লোককে এই বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে আনা আশুবাবু নিরাপদ্ মনে করেন নাই। একটা বালুর কণিকা চোখে গেলে যেরূপ সমস্ত চোখটি পীড়িত ও দৃষ্টি-শক্তি ব্যথিত করে, ভিন্নতন্ত্রী এবং আরব্ধ কার্য্যের বিঘ্নকারী ব্যক্তি,—তিনি ক্ষুদ্রই হউন বা বৃহৎই হউন,—আশুবাবুর পংক্তিতে ঢুকিলে তাঁহার দ্বারা বিভ্রাট্ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। আশুবাবু অতি দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন, ধীমান্ ও প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিদ্বেষের দরুণ বা রাগের মাথায় কিছু করিতেন না। তাঁহার প্রত্যেক কাজই সুচিন্তিত ও স্থির-বুদ্ধি-প্রসূত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনে যে তৃণ বা খড়টির দরকার হইত, তিনি তাহাও উপেক্ষা করিতেন না, কিন্তু যদি কোন বিরাট্ লৌহ-স্তম্ভ বা 'বিম'ও এই ব্যাপারে বেমানান হইত, তবে তিনি তাহা এড়াইয়া যাইতেন। যাঁহাকে তিনি এখানে কোন বিভাগের কর্ত্তা করিয়া আনিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহার সহিত যদি সর্ব্বদা অনৈক্য ও মত-দ্বৈধের সম্ভাবনা থাকিত, তবে তাঁহার অন্যান্য সমস্ত গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে এই ভারতী-মন্দিরে আসিবার 'পাস্‌-পোর্ট' দিতে তিনি স্বতঃই কুণ্ঠিত হইতেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শাস্ত্রীমহাশয় আমার পরম সহায় ও সুহৃদ্ ছিলেন। আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর তিনি যথাসাধ্য আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিন-চারখানি প্রসিদ্ধ পত্রিকায় তিনি আমার পুস্তকখানির অতীব প্রশংসা-সূচক, সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন, এবং আমি অসুস্থ হইয়া শয্যাগত অবস্থায় কলিকাতায় আসার পর আমাদের বাড়ীতে স্বয়ং

আসিয়া আমার প্রতি অন্তরঙ্গতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমার অভাবের সময় সরকারী সাহিত্যিক বৃত্তি-প্রাপ্তি-উপলক্ষেও তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। এ হেন ব্যক্তি কি করিয়া আমার প্রতি বিরূপ হইলেন,—সেই ঘটনাটির এখানে উল্লেখ করিব।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মেয়েদের সংস্কৃতের স্থলে অতিরিক্ত বাঙ্গলা পরীক্ষা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে। আমাকে ও শাস্ত্রীমহাশয়কে একযোগে কোন বৎসর পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। শাস্ত্রীমহাশয় নিজেই প্রশ্নের একটা খসড়া প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রশ্নের মধ্যে বাঙ্গলা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করার অংশটি খুব কঠিন হইয়াছিল,—এত কঠিন যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থিনী মেয়েদের তো কথাই নাই, তাঁহাদের শিক্ষকদের অনেকেই ঐরূপ কঠিন বাঙ্গলার ইংরাজী অনুবাদ করিতে পারিতেন কি-না সন্দেহ। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার খসড়াটা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"আমার হাতের লেখাটা খারাপ হইয়াছে, তুমি প্রশ্নগুলি নকল করিয়া একটা দস্তখত করিয়া আনিও, তার পরে আমি দস্তখত করিয়া আপিসে পাঠাইব।" আমি খসড়াটি দেখিয়া বলিলাম—"যে অংশটা অনুবাদ করিতে দিয়াছেন, তাহা যে একেবারে দুর্ব্বোধ্য, ছোট ছোট মেয়েদের সাধ্য নাই যে, ইহাতে দন্তস্ফুট করে।"

শাস্ত্রী—"সে সকল কিছু তোমাকে ভাবিতে হইবে না, আমি যাহা ভাল বোধ করিয়াছি, তাহা করিয়াছি। যেমনটি আছে, তুমি তেমনটি নকল করিয়া আনিও।"

আমি আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া খসড়াটি লইয়া আসিলাম। যতই ঐ অংশটি বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ততই দেখিলাম ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থিনী মেয়েদের পক্ষে ইহা একেবারেই অনুপযোগী। ক্যালেণ্ডার খুলিয়া দেখিলাম,—পূর্ব্বে পূর্ব্বেও শাস্ত্রী মহাশয় ঐ প্রশ্ন-পত্র সেইরূপ কঠিন করিয়াছেন এবং মনে পড়িল, আশুবাবু একদিন বলিয়াছিলেন যে, যাহারা সংস্কৃত না লইয়া বাঙ্গলা লইবে, তাহাদের বাঙ্গলার প্রশ্ন একটু বেশী কড়া-ই করিতে হইবে। তাহারা যেন মনে না ভাবে, সংস্কৃত পড়ার দরকার নাই, অথবা বাঙ্গলা খুব সহজে পাশ করা যায়।

সুতরাং দুই দিকেই যুক্তি আছে। সমস্ত অনুকূল, প্রতিকূল বক্তব্য মনে ভাবিয়াও একটা খট্‌কা উপস্থিত হইয়াছিল যে, আশুবাবু তো সহজ পরীক্ষারই পক্ষপাতী হইয়াছেন। তিনি যদি এই প্রশ্ন দেখিয়া চটিয়া যান, বিশেষতঃ, কোন ব্যক্তিই এইরূপ কঠিন প্রশ্নের সমর্থন করিবেন না এবং আমিও ন্যায়তঃ-ধর্ম্মতঃ এতটুকু মেয়েদের প্রতি এরূপ কঠিন বাণ মারা ঘোর নির্ম্মমতার কাজ বলিয়া মনে করি। আমি অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, খসড়াটা (ভাইস্‌চ্যান্সেলার-স্বরূপ) আশুবাবুকে একবার দেখাইয়া লই। কিন্তু মনে উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল, এই ব্যাপার-উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয় হয়ত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। তাঁহার সহিত আশুবাবুর মনোমালিন্যের কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। দ্বিধা-কম্পিত পাদ-ক্ষেপে ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমি পরদিন প্রাতঃকালে ৭৭নং রসা রোড ভবনে উপস্থিত হইয়া আশুবাবুকে প্রশ্নের খসড়াটি দেখাইলাম। তিনি বলিলেন—"এ কি পাগলের মত প্রশ্ন হইয়াছে? বদলাইয়া দিন্। এগুলি আপনি মেয়েদের যোগ্য বলিয়া মনে করেন?"

"কখনই না।"

"তবে আর দ্বিতীয় কথাটি নাই, আপনি উহা পরিবর্ত্তন করুন।"

আমি বলিলাম—"আমি শাস্ত্রী মহাশয়কে অনেক বার বলিয়াছি, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী ন'ন।"

"যদি রাজী না হ'ন, তবে দস্তখত করিতে আপনিও রাজী হইবেন না। একথা তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিবেন যে, আপনি এইরূপ প্রশ্নের নীচে দস্তখত করিবেন না, দায়িত্ব উভয়েরই তুল্য। তারপর শাস্ত্রী মহাশয়ের খসড়া ও আপনার মন্তব্য সিণ্ডিকেটে পাঠাইয়া দিবেন, আমি তখন বুঝিয়া লইব।"

বিপদ যে ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমি তথাপি ইতঃস্তত করিতেছিলাম। আশুবাবু চটিয়া গেলেন, তীব্রকণ্ঠে আমাকে বলিলেন—"আপনি যদি আমার কথা না শুনেন, তবে আমি সিণ্ডিকেটে আপনার এই অযোগ্যতার কথা বলিব এবং ভবিষ্যতে যেন আর কোন পরীক্ষার পরীক্ষক না হইতে পারেন, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিব।"

সারারাত্রি ঘুম হইল না। আমি তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ-কর্ম্ম করিতেছি। শাস্ত্রীমহাশয় প্রবীণ পণ্ডিত এবং উপকারী মুরুব্বি ও সুহৃদ্—অপর দিকে আশুবাবু। আমি ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় উপনীত হইলাম। পরদিন সেই খসড়াটা ও অপর একখানি প্রশ্ন-পত্র, যাহাতে ঐ কঠিন অংশটি বদ্‌লাইয়া সহজ অনুবাদ দিয়াছিলাম, তাহা পকেটে লইয়া পটলডাঙ্গায় শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"খসড়াটা নকল করিয়া আনিয়াছ ?" আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম—"ওটা দস্তখত করিতে পারিব না,—বিবেকে বাধা দেয়।"

"বিবেক! তোমার বিবেক বুঝিয়াছি।"

আমি একটু দৃঢ়ভাবেই বলিলাম—"এই দেখুন, আমি ঐ অনুবাদের অংশটি বদ্‌লাইয়া খসড়ার কাপি করিয়া আনিয়াছি, আপনি যদি দস্তখত না করেন, তবে আমি প্রশ্নের নীচে সহি দিতে পারিব না,—সিণ্ডিকেটে জানাইব।" শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে চোখে ক্রোধের চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সিণ্ডিকেটে এ বিষয়টি উপস্থিত হইলে, সেখানে তাঁহার প্রতি যে সকল মন্তব্য হইবে, তাহাও তিনি বোধ হয় আদ্যন্ত অনুমান করিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন—"দাও, তোমার কাপিটাই দাও, আমি সই দিয়া দিতেছি। চলিয়া যাও, আমার সময় নষ্ট করিও না।" সেই দিন হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমার উপর বিরূপ হইলেন। তজ্জন্য আমি যে কত লাঞ্ছনা পাইয়াছি, তাহা বলিবার নহে।

দেখিতে দেখিতে সিনেট-সিণ্ডিকেটের বহু সদস্য আমার শত্রু হইলেন। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু লোক শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন, অনেকে ছিলেন তাঁহার ছাত্র। পূর্ব্ব হইতেই বহুলোক আশুবাবুর প্রতিকূল ছিলেন, নগণ্য হইলেও আমি তাঁহাদের হাতে অব্যাহতি পাইলাম না। সেইবার আমার 'রামতনু লাহিড়ী-ফেলোশিপে'র পাঁচ বৎসরের মেয়াদী সময় শেষ হইবে। এই পদের জন্য আবার নির্ব্বাচনের সময় আসিল। শুনিলাম, আমাকে সরাইয়া দিবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। কিন্তু পান্থ যেরূপ খর রৌদ্রের তাপ অগ্রাহ্য করিয়া বিরাট্ অশ্বত্থ-বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমায়, আমিও

'রামতনু লাহিড়ী-ফেলোশিপে'র নির্দ্দিষ্ট পাঁচ বৎসর অতীত হইলে

সেই বিশালবাহু পুরুষবরের আশ্রয়ে নিজের বিষয় লইয়া দুশ্চিন্তা করিবার অবকাশ পাইতাম না।

এই 'রামতনু লাহিড়ী-ফেলোশিপে'র নিয়মাবলী এরূপ ছিল যে, আমিই তজ্জন্য বিশেষরূপে যোগ্য ছিলাম,—সে সময়ে প্রাচীন বঙ্গভাষার তত্ত্বজ্ঞ লোক বাঙ্গলা দেশে বেশী মিলিত না। সুতরাং আমি ছাড়া অন্য কোন লোককে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করা প্রতিপক্ষীয়দের পক্ষে খুব সহজ হইত না, বিশেষতঃ পুরোভাগে যখন কোন শিখণ্ডী ছিল না, স্বয়ং সব্যসাচী অজেয় গাণ্ডীব হস্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

যেদিন আমার ভাগ্য-নির্ণায়ক সিনেট-সভার অধিবেশন হইবে, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে আমার জ্বর হইয়াছিল। সেই সভার এক দিন পূর্ব্বে আশুবাবু আমাকে দেখিতে আমার বেহালার বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"আপনার বন্ধুরা খুব জোট পাকাইয়াছে।" আমি বলিলাম—"আমার জ্বরটা একটু আছে, কালই ছাড়িয়া যাইবে। আমি সভায় উপস্থিত হইব কি?" তিনি বলিলেন—"যাইবেন বই কি?" কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই বলিলেন—"যাইয়া দরকার নাই,—দেখুন, এই ঝগড়াটা আপনার সঙ্গে নহে,—আপনাকে উপলক্ষ করিয়া এই ঝগড়া আমার সঙ্গে।"

আশুবাবু চলিয়া গেলেন, এবং পরদিন প্রাতে আবার বলিয়া পাঠাইলেন, আমি যেন সেদিন সিনেট-সভায় উপস্থিত না হই। আমি সিনেটের সদস্য এবং প্রায় কখনই অনুপস্থিত হইতাম না। সেদিন বিকালে সভা হইবে,—আমি বেহালায় রোগ-শয্যায় শুইয়া শুইয়া কত কি আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছি। সন্ধ্যাকালে তমোনাশবাবু (আমার জামাতা) আসিয়া বলিলেন—"আপনার পদে আপনিই বহাল হইয়াছেন, কিন্তু শুনিলাম সভায় খুব ঝড়-তুফানের মত একটা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে,—সকলই আপনাকে লইয়া।"

দুই দিন পরে আমি আশুবাবুর বাড়ীতে গেলাম। তিনি একখানি ইংরাজী পুস্তিকা আমার হাতে দিলেন,—উহা দেড় ফর্ম্মা, ডবল ক্রাউন কোয়ার্টো সাইজ্। তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম,—উহাতে আমার ইংরাজীতে-লেখা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে বহু ভুল বাহির করিবার চেষ্টা

করিলাম—"প্রবন্ধটি কি ছাপা হইবে না?" তিনি বলিলেন,—"উহা এখনও আমার টেবিলের উপর আছে, কিন্তু যখন উহা লইয়া গেলাম, তখন উহা ভাল করিয়া পড়িবার অবসর পাই নাই; তার পর পড়িয়া দেখিলাম, উহা ছাপা হইলে আমার এবং 'ঢাকা-রিভিউ'র অনেক শত্রু হইবে; আমি মহাশয়, একটু ভীত হইয়া গিয়াছি।"

আমার বিষয় লইয়া সিনেটে যে ঘোর বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল, তাহার কতকটা আভাষ সিনেটের মিনিটে ছাপা আছে। আশুবাবু শূলী শম্ভুর ন্যায় মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া প্রায় আধঘণ্টাকাল আমার সম্বন্ধে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই অমোঘসন্ধানীর সহায়তায় আমি জয়লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহায় সহায়তার উত্তর-সাধক হইয়াছিলেন ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল,—সেদিনকার তাঁহার বক্তৃতাটিও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

বস্তুতঃ তিনি যখন বুঝিতেন, প্রতিপক্ষ অন্যায়ভাবে কাহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন তাঁহার সরল অন্তঃকরণের স্পষ্টভাষা আগ্নেয়-গিরির মত সধূম অগ্নি বর্ষণ করিত। তাঁহার বহুবন্ধুকে তিনি বিপদের সময় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যখন তিনি অন্যায় বুঝিতে পারিতেন, তখন তিনি নিজের স্বার্থ একেবারে ভুলিয়া গিয়া অন্যায়-কারীকে শিক্ষা দিতে চেষ্টিত হইতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি ভালবাসিতেন,—শুধু এই কথা বলিলে এই প্রতিষ্ঠানটির উপর তাঁহার মনোবৃত্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে না। তিনি এই বিদ্যা-পীঠের পূজক ছিলেন। তিনি ইহাকে ভালবাসিয়া ইহার গৌরব বাড়াইয়াছেন, একথা কেহ বলিলে তিনি দাঁতে জিভ্ কাটিতেন। বরং ইহার সেবা করিতে যাইয়া তিনি নিজে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, ইহাই মনে করিতেন; চণ্ডীদাসের কথায় বলিতে গেলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক এইরূপ বলা যাইতে পারে—"তোমার গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমার রূপে।" তাঁহার একদিনের কথায় এই ভাবটি অতি স্পষ্ট হইয়াছিল। যখন তিনি ডুমরাওনের মোকর্দ্দমা লইয়া পাটনায় যাতায়াত করিতেছিলেন,

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা
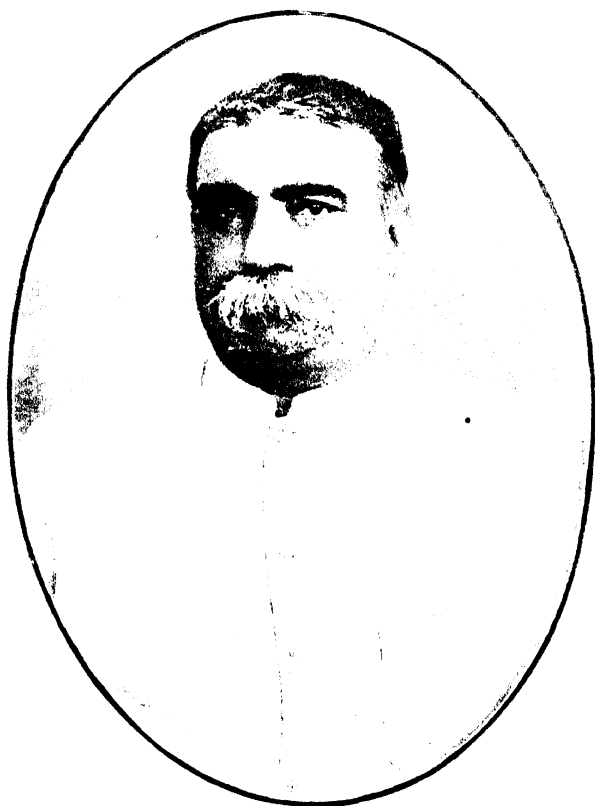
প্রৌঢ় বয়সে আশুতোষ

আছে। পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে আমার গবেষণার শক্তি ও প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকে আমি তাহার সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমি একেবারে নিঃস্ব,—পূর্ব্বে যাহা বাঙ্গলায় লিখিয়াছিলাম, ইংরাজীতে তাহাই রোমন্থন করিয়াছি এবং এক কথাই বারংবার ফেনাইয়া বড় করিয়া লিখিয়া বিলাতী পণ্ডিতদের বাহবা পাইয়াছি। মৌলিকতা-সম্বন্ধে আমার 'ফেলোশিপ'-বক্তৃতাগুলিই তো একেবারে অযোগ্য, শুধু তাহা নহে, উহা ভুলে বোঝাই বলিলেও অত্যুক্তি নহে। আশুবাবু বলিলেন—"যে সকল দোষ ধরা হইয়াছে, তাহার তো উত্তর আমি দিতে পারিব না, উহা পণ্ডিতের লেখা। কিন্তু আমি সরাসরী এই পুস্তিকা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলাম যে, বেনামা (anonymous) লেখা সিনেটের বিবেচনাধীন হইতে পারে না। আপনাকে কায়-কষ্টে এবার রাখা গিয়াছে। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধ-দল অতি প্রবল জানিবেন।"

কে সেই পুস্তিকা লিখিয়া ছাপাইয়াছেন এবং কাহারা উহা সিনেট-সভার সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বুঝিতে বাকি রহিল না, এবং আশুবাবু আমাকে বলিলেন—"আপনাকে একটি প্রতিবাদ-পুস্তিকা লিখিয়া উত্তর দিতে হইবে।" আমি বলিলাম—"তাহা হইলে এই শত্রুতা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইবে এবং প্রতিবাদী-দল আমার মত নিরীহ লোককে টানা-হেঁচ্‌ড়া করিয়া একেবারে খাইয়া ফেলিবে।" আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছি দেখিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন না, কতকটা উগ্রস্বরে বলিলেন,—"আপনাকে উত্তর লিখিতেই হইবে, নতুবা আপনাকে শুধু কাপুরুষ মনে করিব না, এ কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করিব এবং বুঝিব, আপনার পুস্তকগুলির বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই সত্য।"

ইহার উপর আর কথা চলে না; আমি দ্বিধা-কম্পিত হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলাম এবং এক দিনের মধ্যেই দুই ফর্ম্মাব্যাপী এক ইংরাজী-পুস্তিকায় আমার বিরুদ্ধে প্রচারিত পুস্তিকার অভিযোগগুলির উত্তর দিলাম। তাহা শুধু আমার প্রতি যে সকল অভিযোগ ছিল তাহার উত্তর নহে, তদ্ব্যতীত অভিযোগকারীদের মর্ম্মে আঘাত করিতে

পারে, এরূপ ব্যক্তিগত প্রচ্ছন্ন আক্রমণও তাহাতে কিছু কিছু ছিল। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বিশ্বকোষ-প্রেসে' তাহা ছাপাইয়া প্রুফের খসড়া লইয়া যথাসময়ে ভবানীপুরে উপস্থিত হইলাম। আশুবাবু পুস্তিকাটি মনোযোগের সহিত আদ্যন্ত পড়িয়া খুব খুসী হইলেন। আমি বলিলাম,—"ইহাতে আইন-গত কিছু দোষ নাই তো?" "কিছু মাত্র নাই,—"এই বলিয়া তিনি আমার লেখাটি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলেন।

পুস্তিকাখানি অবশ্য আমার নামে প্রকাশিত করা সঙ্গত হইবে না, অথচ বেনামা হইলে তাহার তাদৃশ মূল্য থাকিবে না। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আশুবাবুর সমক্ষে বলিলেন—"উহা আমার নামে ছাপা হউক, আমি ভীত হইব না।" সুতরাং তাহাই স্থির হইল। ইহার মধ্যে আমি লাট-সাহেবের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ডব্লিউ, আর, গুর্‌লে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম,—আমার সঙ্গে আর একজনও ছিলেন,—তিনি রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্র-নাথ ভদ্র। তিনি তখন 'ঢাকা-রিভিউ'-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গুরলে সাহেব আমার এই পুস্তিকা লেখার কথা সকলই শুনিয়াছিলেন, এবং আমাকে বলিলেন—"ঐরূপ পরস্পর নিন্দাপূর্ণ পুস্তিকার প্রকাশ ও প্রচার য়ুরোপে বিশিষ্ট সমাজে অত্যন্ত নিন্দিত হয়। বিদ্বান্ লোকদের মধ্যে এরূপ হওয়াটা দোষাবহ। আমি অনুরোধ করিতেছি, পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিবেন না।" আমি বলিলাম—"এবিষয় আমার হাত নাই; আশুবাবুর একান্ত ইচ্ছা আমি ইহা ছাপাই, তাহা না হইলে আমার যে সকল ঐতিহাসিক ত্রুটি ও কলঙ্ক তাঁহাদের পুস্তিকা-দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, বাহিরে সকলে তাহা বিশ্বাস করিবে।" সত্যেন্দ্র ভদ্র বলিলেন—"এই লেখাটা পুস্তিকার আকারে না ছাপাইয়া, আমাকে দিন, আমি 'ঢাকা-রিভিউ'-পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে ছাপাইব।" আমি বলিলাম—"আশু-বাবু রাজী হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।" গুরলে সাহেব আশুবাবুকে বলিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। ফলে তাহাই হইল,—সত্যেন্দ্রবাবুর অনুরোধে এবং গুরলে-সাহেবের কথায় অবশেষে আশুবাবু সম্মতি দিলেন। সত্যেন্দ্রবাবু প্রবন্ধটি আত্মসাৎ করিয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার প্রায় একবৎসর পরে আমি সত্যেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা

তখন একদিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"আপনি কলিকাতা ছাড়িয়া এখন হয়ত প্রায়ই বিদেশে যাইবেন, হাইকোর্ট হইতে অবসর লইয়াছেন, এখন পাছে আমরা আপনাকে হারাই, এই আশঙ্কা হইতেছে; আপনি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদিনও চলিবে না,—আশুতোষ ছাড়া কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় কায়াহীন ছায়া।" আশুতোষ বলিলেন,—"একথা কখনও মনে করিবেন না যে, আমি জীবিত থাকিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িব। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিবেন, আমি প্রাণপণে এই বিদ্যাপীঠের সেবা করিতেছি, তাই বলিয়া আশু মুখুজ্জ্যে ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অচল হইবে,—এরূপ ধারণা একান্ত ভ্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয় আশু মুখুজ্জ্যে হইতে ঢের বড়, আশু মুখুজ্জ্যে একদিন না একদিন মরিয়া যাইবে—কিন্তু বাঙ্গালী-জাতি যতদিন টিকিয়া থাকিবে, ততদিন এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান থাকিবে এবং যুগে যুগে আশু মুখুজ্জ্যের মতন, অথবা তাহার চেয়ে ঢের বড় বড় লোকের আবির্ভাব এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হইবে। কত বঙ্কিম, কত হেমচন্দ্র, কত নবীন সেন, কত জগদীশ বসু ও কত প্রফুল্ল রায় এই প্রতিষ্ঠানে কালে কালে আবির্ভূত হইবেন। আপনি বলিতেছেন—আশু মুখুজ্জ্যেই ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, এরূপ ধারণা গ্লানিকর।"

মহৎগুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের মত আশুবাবুও মনুষ্য-সমাজে দয়ার হরির-লুট দিয়া যাইতেন। তাঁহার প্রকৃতির বাহিরের একটা খোলস ছিল তাহা অনেক সময় কর্কশ ও কঠোর বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য ছিল না। কিন্তু যে অন্তঃসলিল প্রবাহ আমরা ফল্গুনদীতে পাই,—যাহার বাহিরটা নীরস বালুকাময়, যে অমৃতকল্প রসের প্রবাহ আমরা খর্জ্জুর বা তালবৃক্ষে পাই,—জোর করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত যাহার অজস্র মধু বাহির করিতে হয়, আশুবাবুর বাহ্য কঠোরতার অভ্যন্তরেও সেইরূপ একটা করুণা নিয়ত প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত থাকিত। বৃক্ষের পরিচয় ফল,—আশুবাবুর অন্তর্নিহিত সেই করুণার প্রস্রবণ দেশের লোকের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। যদিও তিনি আগন্তুক প্রার্থী ব্যক্তিদিগকে অনেক সময়ে অতি মিষ্ট আপ্যায়ন করিতেন না, যদিও নানারূপ আনুকূল্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি বিপদাপন্ন ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী হইতেন না, যদিও তিনি অন্তরঙ্গ সুহৃদ ব্যক্তিদের সঙ্গেও দীর্ঘকাল গল্প জুড়িয়া দিয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বুঝাইতেন না, এমন কি যদিও অনেক সময়ে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া আগন্তুককে কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিতেন,—তথাপি বৃক্ষের পরিচয় যে ফল, এই নীতি-বাক্যের আলোকে তাঁহার চিত্ত-মাধুর্য্য ধরা পড়িত। তিনি রাজা, মহারাজা কিংবা ধন-কুবের ছিলেন না, তথাপি তাঁহার নিকট শত শত বেকার যুবক কেন ঘুরিত,—তিনি আফিসের বড় সাহেব ছিলেন না, তথাপি চাকুরি-প্রার্থীরা কেন তাঁহার কাছে অবিরত যাতায়াত করিত? অনেক দিন তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, এই সকল কাজ কন্‌ট্রোলার বা রেজিষ্ট্রারের হাতে, তাঁহাদের মতামত ডিঙ্গাইয়া আমার কিছু করিবার সাধ্য নাই, কমিটি শেষ মঞ্জুরী দিয়া থাকেন আমি একজন সদস্যমাত্র,

একটি ভোট মাত্র সম্বল,—আপনারা ক্রুল সাহেবের কাছে যান,—অবিনাশ-বাবুর কাছে যান,—তাহা না করিয়া আমার কাছে ভিড় করিতেছেন কেন?

কিন্তু সে কথা কে শুনে? সাধু যেরূপ সংসারী লোকদের কাছে না ছুটিয়া শক্তির মূল কোথায়, তাহারই সন্ধান করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হ'ন, ইহারা সেই ভাবেই আশুতোষের শরণ লইত।

বিপদ-ত্রাতা বলিয়া তাঁহার নাম ছিল না,—তথাপি বিপদাপন্ন ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে আশুবাবুর কথাই স্মরণ করিত কেন? তিনি কংগ্রেসের নেতা ছিলেন না, তথাপি স্বদেশভক্তেরা কেন তাঁহার আশ্রয় খুঁজিত? তাঁহার অবারিত দ্বার আর্ত্ত, দুঃখী, দরিদ্র, বেকার,—সকলের জন্যই সর্ব্বদা মুক্ত ছিল। তিনি ইতিহাসের গবেষণা করিতেন না,—অথচ গবেষণাকারী সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সাহায্য চাহিতেন। দিবারাত্র অভেদে, নিরবধি অবারিত আগন্তুক জন-প্রবাহ তাঁহার দুয়ারে আসিত। তাহারা জানিত যে, প্রার্থিত বিষয়ের যদি কোন প্রতিকার বা সমাধান থাকে, তবে তাহা আশুবাবুর দ্বারা সিদ্ধ হওয়ার যতটা সম্ভাবনা, অন্য কাহারও দ্বারা ততটা নহে। তাঁহার প্রকৃতির বাহ্য কঠোরতা ভেদ করিয়া লোকের দৃষ্টি সেই গূঢ় দয়ার উৎসের সন্ধান নিশ্চিতরূপে পাইত। এই জন্য তীর্থদর্শন-কামী যাত্রীর ন্যায় সেখানে এত ভিড়, তাহারা জানিত পাষাণ-প্রতিমার মধ্যে এক জাগ্রত দেবতা ছিলেন, তাঁহার মহাপ্রাণতা-সম্বন্ধে দেশের লোকের তিল-মাত্র দ্বিধা বা সন্দেহের ভাব ছিল না।

আশ্চর্য্যের বিষয় নিত্যকার এই মহোৎসব, এই যাত্রীর ভিড় তিনি সামলাইতেন কিরূপে? যিনি একবার আসিতেন, অনেক সময়েই তাঁহার দ্বিতীয় বার আসিবার আবশ্যকতা হইত না। যদি তিনি বলিতেন,—"আচ্ছা যাও, দেখ্‌ব", তবেই বুঝিতে হইবে, কাজ হইয়া গিয়াছে। বৃথা আশায় বা নিশ্চিত কোন আশ্বাস দিয়া তিনি প্রার্থীদিগকে প্রলুব্ধ করিতেন না,—গণতন্ত্রের ভিত্তিতে যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত, তাহাতে এক জনের পক্ষে সেরূপ আদেশ কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। কিন্তু শুধু "দেখ্‌ব" বা "দেখ্‌ছি,—পারি কিনা"—এইরূপ দুই একটি বাক্যেও তচ্চরিত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি জানিতেন,—যাহা করিবার, তাহার সমস্তই তিনি

ভিড় সামলাইতেন কিরূপে?

করিবেন। যেরূপ নগণ্যই হউক না কেন, কোন প্রার্থীর কথা তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন হইত না। এই গুণটি এখন বাঙ্গালী-চরিত্রে প্রায় দেখা যায় না। যাহা হইবে না, যাহা হইবার নয়, তাহারও আশা আভাষে দিয়া কত বড় লোক কত বিপন্ন প্রার্থীকে বারংবার তাঁহার নিকট দরবার করার অবনতি, সময় ও অর্থ-ব্যয় করাইয়া পরিণামে বিপন্নকে আরও বিপন্ন করিয়া থাকেন,—স্পষ্ট কথা বলিবার পথে তাঁহাদের ভীরুতা, চক্ষু-লজ্জা ও অপবাদের ভয় অন্তরায় হয়। আশুবাবু পরের বিপদ সম্পূর্ণ বুঝিতেন, দুঃখীর কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইত; কিন্তু যেখানে তাঁহার দ্বারা কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, সেখানে তিনি সংক্ষেপে কথাগুলি তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন।

এত বড় ভিড় তিনি সামলাইতেন কিরূপে, আমরা কিছু পূর্ব্বে এই প্রশ্ন করিয়াছি।

নিবিড় কর্ম্ম-স্রোতের মধ্যে তাঁহার বৃথা অপব্যয় করিবার মত তিলমাত্র সময় ছিল না। অথচ প্রত্যহ প্রায় অর্দ্ধশত লোক তাঁহার বাহিরের ঘরটার বারান্দায় অপেক্ষা করিত। কোন কার্ড দিয়া কাহাকেও ঢুকিতে হইত না। ধনী, দরিদ্র, সাহেব, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি অনেকেই যাইতেন,—এই দর্শন-উৎসবে কাণা, খোঁড়া, গরীব ও সচ্ছল অবস্থার লোকের কোন ভেদ ছিল না। আশুবাবু বাহিরের ঘরটায় ঢুকিয়াই যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া লইতেন; তারপর বড় চেয়ারে বসিতেন। যাহাদের সঙ্গে একটু বেশী কথা কওয়ার দরকার, তাঁহাদিগের প্রতি প্রথমতঃ মনোযোগ দিতেন না। অতি-বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলে নিভৃতে লইয়া গিয়া আলাপের পর তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেন। কিন্তু কাহারও সঙ্গে বেশী ক্ষণ কথা কহিবার প্রয়োজন হইত না। ঠিক কাজের কথা জানিতে চাহিতেন, দীর্ঘ প্রস্তাবের সুযোগ দিতেন না। তারপর এক একটি লোককে তাঁহার বড় চেয়ারটার কাছে ডাকিয়া আনিতেন এবং দুই-এক মিনিটের মধ্যে ঠিক কাজের কথা শুনিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত ও একান্ত বাহুল্য-বর্জ্জিত উত্তর দিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন। এইভাবে এক একটি করিয়া সকলের কথা শুনিতেন এবং সকলেরই কথার জবাব দিয়া
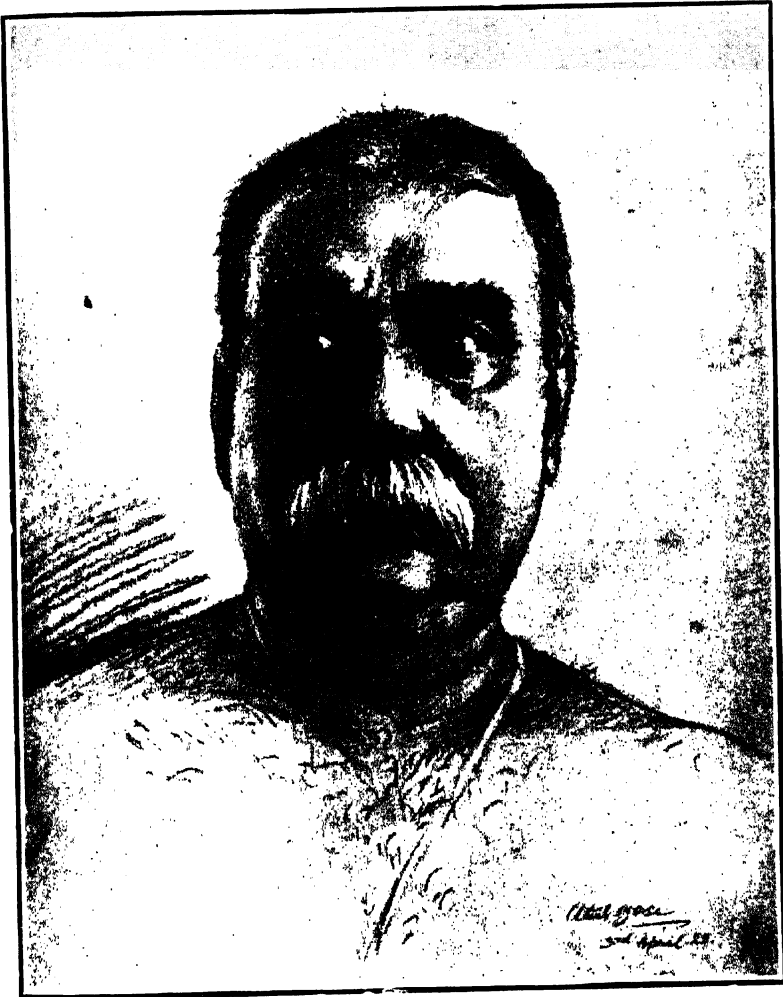
১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে চিত্রশিল্পী
অতুল বসু অঙ্কিত নর-শার্দ্দূল আশুতোষ

তাহাদের যাত্রা সার্থক করিতেন। কেহ এমন কিছু বলিবার সুবিধা পাইতেন না যে, আজ বড় ভিড়, কোন কথা পাড়িবার সুযোগ হইল না। তাঁহার গৃহটি ঠিক কর্ম্ম-ক্ষেত্র ছিল,—উহা বাজে কাজ বা বাজে কথার আড্ডা ছিল না; এইজন্য এত বড় ভিড়ের মধ্যেও কোন লোক "আমার কথা বলি, বলি, বলি, বলা হইল না"—এইরূপ অভিযোগ লইয়া ফিরিতেন না। বড় চেয়ারটার এত কাছে এবং এত মৃদুস্বরে কথা বলিতেন যে, এক জনের সঙ্গে কি কথা হইল, তাহা অপরে জানিতে পারিত না। এইভাবে এতবড় ভিড় তিনি সামলাইয়া লইতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি-শক্তির গুণে তিনি এত লোকের মধ্যে একটি লোকেরও কথা ভুলিয়া যাইতেন না, যাহাকে যাহা বলিতেন, ঠিক সময়ে ঠিক তাহা করিতেন,—তাঁহার কথা অব্যর্থ ছিল। তাঁহাকে কখনও বলিতে শুনি নাই—"মহাশয়, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আর একদিন আসিবেন।" যিনি কর্ম্মের মধ্যে একরূপ ডুবিয়াই থাকিতেন, তিনি কতই না অজুহাত দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ অজুহাত দিয়া প্রার্থীদিগকে কখনও দ্বিধার মধ্যে রাখিয়া প্রতারিত করিতেন না। মিষ্টকথা ও ছদ্মবেশী সৌজন্য অপেক্ষা এই আপাত-কঠোর অথচ প্রকৃত হিতেচ্ছা ও স্পষ্ট কথার মূল্য যে কত বেশী, তাহা ভুক্ত-ভোগীরা সহজেই বুঝিবেন।

তিনি যতক্ষণ বসিয়া এইরূপ বহু ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গকামী এবং অন্তরঙ্গ তাঁহারা ততক্ষণ সেইখানে বসিয়াই থাকিতেন, আশুবাবু অপরের সঙ্গে কথা কওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তাঁহাদের সঙ্গে দুই একটি কথা বলিতেন।

আজ 'বাঙ্গলার ব্যাঘ্র' বলিতে আশুবাবুকেই বুঝায়। এই শব্দটি একরূপ যোগরূঢ় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই শব্দটির উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহার একটা ইতিহাস আছে। ফ্রেঞ্চ-প্রিমিয়ার ক্লঁমা-সোঁর সঙ্গে আশুতোষের আকৃতি ও প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য ছিল। এই ফরাসী পুরুষবরেরও দুর্জ্জয় উদ্যম ও ব্যাঘ্রবৎ আরণ্য তেজ ছিল,—ইনিও পোষাক-পরিচ্ছদ-সম্বন্ধে উদাসীন, সভা-স্থলে দুর্দ্দমনীয়, স্পষ্টবক্তা এবং দেশহিত-ব্রতে সম্যক্ আত্ম-সমর্পিত, সাধু পুরুষ ছিলেন, ইনি নর-শার্দ্দূল-

'বাঙ্গলার ব্যাঘ্র'

খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' এই ফরাসী ব্যাঘ্রের সঙ্গে আশুতোষের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকে 'বাঙ্গলার ব্যাঘ্র' নামে চিহ্নিত করেন। কলিকাতা নগরী সুন্দরবনের উপান্তে, সুতরাং সুন্দরবনের 'রয়েল টাইগার' এদেশের অপরিচিত নহে; আশুতোষ যে এই নামের যোগ্য, [illegible] তাহার দেশবাসীরা সহজেই অনুমোদন করিলেন। ইহার মধ্যে কোথা হইতে এক চিত্রকর আসিয়া আশুতোষের এমন এক ছবি অঙ্কন করিলেন, যাহাতে তাঁহার স্ফীত নাসা, তীব্র হু'টি জ্বলন্ত চক্ষুর দৃষ্টি এবং পরিচ্ছদহীন, অনাড়ম্বর বিশাল বক্ষের আরণ্য মহিমা আশুতোষ-সম্বন্ধীয় উৎপ্রেক্ষাটি অতি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছিল; তদবধি 'বাঙ্গলার ব্যাঘ্র' নামটি 'চাউর' হইয়া গেল।

কিন্তু ইহার পূর্ব্ব হইতেই এই নামটি কোন কোন স্থলে কতকটা প্রচার লাভ করিয়াছিল। একদিন অতি প্রাতে আমি ও অধ্যাপক রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ট্রামে ভবানীপুরের দিকে যাইতেছিলাম। আমি বলিলাম,—"এখনও বোধ হয় আশুবাবু ময়দানে ঘুরিয়া বাড়ী ফেরেন নাই;" এই বলা মাত্রই দেখা গেল অনতিদূরে আশুতোষ দুই-একটি বন্ধুর সহিত কথা বলিতে বলিতে ময়দানে হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিদ্যাভূষণ হর্ষোজ্জ্বল চক্ষে চাহিয়া অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঐ বাঘ, ঐ বাঘ" ('the Tiger—the Tiger') আমরা আশুবাবুর বাড়ীতেই যাইতেছিলাম। তথায় গিয়া, তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বাহিরের ঘরটায় বসিয়া রহিলাম। খানিকক্ষণ পরে আশুবাবু প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ীতে ফিরিলেন এবং বৈঠকখানার ঘরটায় প্রবেশ করিলেন। বিদ্যাভূষণ তাঁহার নিজের কথা গোপন-পূর্ব্বক দোষটি আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দুষ্টুমি করিয়া বলিলেন— "দীনেশবাবু আজ আপনাকে একটা উপাধি দিয়েছেন, শুনেছেন?" তিনি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি উপাধি?" বিদ্যাভূষণ বলিলেন,— "টাইগার"—বাঘ। আমি তাঁহার এই মিথ্যা কথায় লজ্জিত ও আড়ষ্ট হইয়া পড়িলাম এবং কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম,—"বিদ্যাভূষণই আপনাকে ময়দানে হাঁটিতে দেখিয়া 'ঐ বাঘ, ঐ বাঘ' বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন, এখন আমাকে এইভাবে জব্দ করিতেছেন।"

আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম, আশুবাবু বুঝি বিরক্ত হইবেন ; কারণ, তিনি গুরুগম্ভীর প্রকৃতির লোক, বিশেষতঃ আমাদের সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বদা একটা শ্রদ্ধার সম্বন্ধ ছিল, তাঁহাকে লইয়া রহস্য করা আমাদের পক্ষে শোভন হইত না। কিন্তু সে দিন তাঁহার বিরক্তির কোন লক্ষণ দেখিলাম না, বরং মনে হইল তিনি কথাটা যেন একটু উপভোগই করিয়াছেন। ইহার পরে রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে ও যেখানে-সেখানে আশুতোষকে 'টাইগার' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে ফরাসী সচিবের সঙ্গে আশুতোষের তুলনা ও তাঁহারই উপাধিটি আশুতোষের প্রতি আরোপ করিয়া 'অমৃত-বাজারে' প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, 'বাঙ্গলার ব্যাঘ্র' নাম ধূর্জ্জটির ন্যায় দেশময় যোগরূঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইল, ইহার মধ্যেই চিত্রকরের তূলিতে সেই বিখ্যাত ছবিখানি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

এই 'ব্যাঘ্র' শব্দটার প্রয়োগের একটা সার্থকতা আছে এবং এইজন্যই ইহার প্রচলন সমধিক হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ব্যাঘ্রের তুল্য তাঁহার দুর্জ্জয় শক্তিমত্তা সিনেট-সভ্যমণ্ডলীর অবিদিত নহে। যে দিন তিনি লাট লিটনের সেই চিঠির তেজোদৃপ্ত উত্তর দিয়াছিলেন, সেদিন সিনেটের সভা-গৃহ তাহা সত্যই বুঝিয়াছিল। এ কথার আলোচনা আমরা পূর্ব্বেই বিস্তারিতভাবে করিয়াছি।

আর একদিন একাউন্টেন্ট্ জেনারেলের প্রতিকূল সমালোচনা সিনেট-সভার তালিকার অন্তর্বর্ত্তী ছিল। প্রতিপক্ষের দল,—বিশেষতঃ অনেক সাহেব সদস্য বলাবলি করিতেছিলেন—"একাউন্টেন্ট্ জেনারেল বড় সহজ ব্যক্তি নহেন, তিনি বড়লাটের খরচ-পত্রের উপরও ছাঁট দেন,—নেহাত কেউ-কেটা নহেন,—এই যে অপব্যয়গুলির সম্বন্ধে তিনি কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আশুবাবু আজ কি বলিবেন ?" সে দিন আশুবাবুর কণ্ঠে যে গর্জ্জন শুনিয়াছিলাম, তাহা ব্যাঘ্র-গর্জ্জন ছাপাইয়া উঠিয়াছিল,—তাহা একেবারে সিংহ-গর্জ্জন।

আশুবাবু বলিলেন—"একাউন্টেন্ট্ জেনারেলের কি দুঃসাহস যে, গভর্ণমেণ্টে বিধিবদ্ধ এই মহা প্রতিষ্ঠান,—এই সিনেটের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সম্যক্‌রূপে আলোচিত ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্তের উপর মন্তব্য জাহির করিতে পারেন ?

সিনেট-সভা হইতে যে সকল ব্যয় মঞ্জুর করা হয়, তাহারই তিনি পরীক্ষা করিতে পারেন,—বিনা মঞ্জুরীতে কোন ব্যয় হয় কি-না, তাহাই তিনি দেখিবেন। ব্যয়ের যুক্তিযুক্ততা ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্য-প্রকাশের তাঁহার কোন অধিকার নাই। আসুন দেখি একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেল সাহেব একবার, বলুন তো—গভর্ণমেণ্টের ৪০ লক্ষ, ৬০ লক্ষ অথবা ৮০ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি পড়িয়াছে ; সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার চারিটি সদস্য, তিনটি মন্ত্রী, অথবা এত গুলি কমিশনার, অথবা জেলাকর্ত্তা বা পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ রাখিবার দরকার নাই, ইহাদের সংখ্যা কমান হোক ; তিনি আসিয়া বলুন না যে, লর্ড চেমস্‌ফোর্ড এবং মণ্টেগুর রাষ্ট্র-নীতি ভাল হয় নাই ; অথবা সামরিক বিভাগে এতগুলি কর্ম্মচারী ও এত অস্ত্রের সাজসজ্জা থাকা নিষ্প্রয়োজন ; তিনি কাটিবার ছাঁটিবার অস্ত্রটি হাতে লইয়া রেলওয়ে-বিভাগের খরচে হাত দিন দেখি ! সিনেটের শিক্ষা-বিভাগের কি দরকার, কি দরকার নয়, তাহার বিচারের জন্য যোগ্য ব্যক্তিগণ আছেন। এ সকল বিষয়ে একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেলের কথা বলিবার অধিকার আছে, একথা কেহ স্বীকার করিবেন না,—ইহা তাঁহার শুধুই গায়ের জোর।" এই বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহাদের চক্ষে এতবড় একটা রাজকর্ম্মচারী সামান্য একটা কেরাণীরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন।

মন্ত্রী বাহাদুর কতকটা টাকা মঞ্জুরী দিবার আশা দিয়া সিনেটকে কো কোন বিষয়ে সর্ত্তে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৯২২ সনের ২রা ডিসেম্ব তারিখে সিনেটের সভায় আশুতোষ যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আশুতোষের মত। অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে জ্যা দেওয়া অর্জ্জুন ভিন্ন অপরের সাধ্য নহে। সে বক্তৃতার উপসংহারটি যেন মোহানার নিকট নদীর শেষ গর্জ্জন ; তাঁহা প্রাণ-ঢালা আবেগ ও স্বাধীনতার দাবী ভুলিবার নহে,—তাহা অপরাজে যোদ্ধার অনমনীয় দার্ঢ্য ও যুযুৎসুর অভিমান-ব্যাঞ্জক।

একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেল বুঝাইয়াছিলেন,—বিশ্ববিদ্যালয় অসতর্ক, বে হিসাবী খরচের দ্বারা দেউলিয়া পড়িবার মুখে। আশুতোষ মনে করিলেন, ইহ একটি অছিলা মাত্র ; এই সূত্র ধরিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সর্ত্তগুলি মানিয়া লইলে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে

অর্থ-সঙ্কট ঘুচিয়া যাইত। কিন্তু আশুতোষের সিনেট দাসত্বের বেড়ী পরিতে একেবারে গররাজী। তিনি বলিলেন—"আজ বড় সৌভাগ্য যে, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত নাই। আজ তিনি থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে যেরূপ লাঞ্ছিত হইতেছে, তাহার প্রতিবাদে এই গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত। তিনি ছিলেন বিনয়-নম্র, ধীর-প্রকৃতি; কিন্তু তাঁহার আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান এবং নির্ভীকতা দেশ-বিশ্রুত। তিনি এই ব্যবহার কিছুতেই সহ্য করিতেন না। সৌভাগ্যের বিষয় আজ ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষও স্বর্গীয় হইয়াছেন এবং আনন্দমোহন বসু ও কালীচরণ-বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লোকেরাও জীবিত নাই, তাহা না হইলে কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবহারে রোষ-ব্যাঞ্জক প্রতিবাদ সিনেট-গৃহের সর্ব্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।

"কিন্তু আপনারা আমার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করুন, যে পর্য্যন্ত আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবমাননার সহযোগিতা করিব না। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলাম তৈরি করিবার যন্ত্র-শালায় পরিণত হইতে দিব না। আমরণ সত্যের প্রতি অনুরাগ দেখাইব, স্বাধীন মনোবৃত্তি শিক্ষা দিব। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যাহাতে উচ্চভাব ও উচ্চ আদর্শের প্রেরণা লাভ করিতে পারে, আমরা সেইরূপ শিক্ষা দিব; কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়কে সেক্রেটারীদের দপ্তরের আত্মসাৎ হইতে দিব না। আপনারা এ কথাটি মনে রাখিবেন যে, টাকাটা আমাদের দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা কোন স্থায়ী দান নহে, এমন কি একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বাৎসরিক দানও নহে,—সাকুল্যে মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা; ইহারই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। মন্ত্রী মহাশয় আইনের তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। আচ্ছা বলুন তো, আজ এখানে যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের কি অধিকার আছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরন্তন স্বাধীনতা এবং অধিকারগুলি লইয়া এরূপ ছিনিমিনি খেলিতে পারেন? এরূপ করিলে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি আমাদিগকে কি বলিবে? সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট আমরা কি কৈফিয়ৎ দিব? পোষ্ট্-গ্রাজুয়েটের শিক্ষকগণই বা কি বলিবেন? তাঁহারা কালই কাজে ইস্তাফা দিবেন। এইরূপ সর্ত্তে টাকা গ্রহণ করা অপেক্ষা বরঞ্চ তাঁহারা নির্ব্বাসন-দণ্ড

গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন। আমরা যদি আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বিক্রয় করি, তবে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কি আমাদিগকে ধিক্কার দিবেন না?······················যদি আমার এক হস্তে অর্থ এবং অপর হস্তে দাসত্ব দেওয়া হয়, তবে আমি সেই অর্থ ঘৃণা করিব। আমরা এইরূপ টাকা লইব না। বরঞ্চ আমরা আমাদের খরচ কমাইয়া যাহাতে টিকিয়া থাকিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিব; বরঞ্চ দেশের লোকের দুয়ারে, দুয়ারে ভিক্ষা করিব ও দেশে যে আত্মশক্তি-বোধ নিদ্রিত হইয়া আছে, তাহা জাগাইয়া দেশবাসীর বর্ত্তমান সময়ে দায়িত্ব কি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ···········আমাদের পোষ্ট্‌গ্রাজুয়েটের শিক্ষকগণ বরং উপবাস করিয়া শুকাইয়া মরিবেন, তথাপি তাঁহারা স্বাধীনতা ছাড়িবেন না। বন্ধুগণ, আপনারা জানিবেন, সকলের উপরে বিধাতা-পুরুষ আছেন, যিনি জগতের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করেন।”

কথাগুলি তর্জ্জমা করিয়া দিলাম। কিন্তু সেই আবেগ ও জ্বালাময়ী ভাষার মর্ম্মান্তিক সুরটি বুঝাইব কিরূপে?

যেখানে যেখানে আশুতোষ সরকারী নীতি-সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রায় প্রত্যেক স্থলেই লাট বা বড়লাট তাঁহার উদ্দিষ্ট ছিলেন না, যে সকল স্বদেশীয় উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী রাজ-প্রতিনিধিদিগকে মন্ত্রণা দিতেন, তাঁহারাই মূলতঃ তাঁহার লক্ষ্য ছিলেন।

তাঁহার কথাগুলি কেহ কেহ বিদ্রোহীর কথার মত মনে করিয়াছেন। কিন্তু আমি বিশ বৎসর কাল সিনেটের সদস্য ছিলাম, আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি, যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধতা করিয়া আপাততঃ সরকারের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই আশুতোষের মত ব্রিটিশ-রাজের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন না। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া নূতন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়িতে পারিতেন; অসহযোগ-আন্দোলনের সময় নানা দিক্ হইতে সেই চেষ্টা হইয়াছিল এবং আশুতোষকে সেই দলে টানিবার যে চেষ্টা না হইয়াছিল, এমন নহে, দলে-দলে, শত-শত ছাত্র স্কুল কলেজ-পরিত্যাগ করিয়াছিল। ক্লাসগুলি ছাত্রশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। ছেলেরা দুর্দ্দান্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনগুলির উপর বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিল। দেশের

অনেক প্রভাবশালী লোক এই অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। সেই দিন আশুতোষ যদি একবার অঙ্গুলী হেলন করিতেন, তবে কোথায় থাকিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল-কলেজসমূহ? সেদিন ছাত্রেরা অভিভাবকগণের প্রতি ভ্রূকুটি করিয়া অকূলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিয়াছিল। একমাত্র আশুতোষ বিদ্যায়তনগুলির দ্বার আগ্‌লাইয়া তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধ ভাষায় "তিষ্ঠ"-শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক এই পিপীলিকা-শ্রেণীর মত বালক-যুবকদের উন্মত্ত, বিক্ষুব্ধ প্রবাহ থামাইয়া দিয়াছিলেন। শত-সহস্র বালক তাই সেদিন রক্ষা পাইয়াছিল এবং গভর্ণমেণ্টের এক মহা উৎকণ্ঠার নিশি একমাত্র আশুতোষের চেষ্টায় সুখ-শয়নে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বশক্তিমান্ সেক্রেটারীগণ, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর, এমন কি দুর্দ্দান্ত-পুলিশ-অফিসারেরা যে ক্ষেত্রে হিম্‌সিম্ খাইয়া গিয়াছিলেন, সে ক্ষেত্রে এই বিনা-পয়সার মজুর,—গভর্ণমেণ্ট, ছাত্র ও দেশের প্রতি তুল্য অনুরাগী,—একান্ত নিঃস্বার্থ পুরুষবর এই বাঙ্গলাদেশকে এক মহাসঙ্কটের অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এ হেন দরদী ব্যক্তির শুভেচ্ছা-প্রণোদিত কর্ম্মের পথে যদি কেহ বাধা দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অভিমান হওয়া কতকটা স্বাভাবিক। এই অভিমান ও ক্ষোভ-ব্যাঞ্জক উচ্ছ্বসিত উক্তি বিদ্রোহীর ভাষা বলিয়া প্রচার করা অন্যায়,—উহা অভিমানাহত অন্তরঙ্গের মর্ম্মোচ্ছ্বাস। আর একদিনের কথা ইহার পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি,—উহা সিনেট-হলে নহে,—কন্‌ভোকেশন্‌-হলে,—স্বয়ং লর্ড হার্ডিঞ্জের তথায় উপস্থিতি-কালে তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু যিনি ভারত-বর্ষের শ্রেষ্ঠ বিচারশালার একজন প্রধান বিচারপতি, তাঁহার গর্জ্জন যত বড়ই হউক না কেন, তন্মধ্যে অবৈধ কিছু ছিল না। তাঁহার কয়েকজন ঘোর শত্রু কতকগুলি ইংরাজ-পরিচালিত পত্রিকায় এই ব্যাপার লইয়া এবং লাট লিটনের চিঠির উত্তর লইয়া একটা মস্ত-বড় হৈ চৈ বাধাইয়াছিল,—এমন কি জনৈক পত্রিকা-সম্পাদক তাঁহাকে জজিয়তি হইতে বরখাস্ত করিবার উপদেশ দিতেও ছাড়েন নাই। এতৎ সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, তাঁহার মত ভারত-সম্রাটের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বিরল ছিল। উত্তেজনার সময় তিনি বঙ্গদেশের উচ্চশিক্ষার কাণ্ডার এরূপ শক্ত করিয়া ধরিয়াছিলেন যে, তিনি

যদি সরকারের প্রতিকূল হইতেন, তবে বঙ্গদেশ অরাজক হইয়া যাইত এবং এদেশের তরুণ যুবকদের ভবিষ্যৎ একেবারে বান-চাল হইত।

যাহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব কওয়া হয়, বাঙ্গলায় যাহাকে গলাগলি ভাব বলে,—এমন বন্ধুত্ব আশুবাবুর সঙ্গে কাহারও ছিল বলিয়া জানি না। তিনি ছিলেন রাস-ভারী লোক, তাঁহার সহিত বেশী ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার পক্ষে একটা সম্ভ্রমের ভাব সর্ব্বদা বাধা দিত। তাঁহার মন ছিল সরল, তিনি কোন ভাব চাপিয়া রাখিয়া বৈষয়িকদের মত সাবধানতার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন না। সুতরাং মনে হইতে পারে, এমন লোকের সঙ্গে সমকক্ষ লোকদের 'ভাব' হওয়া খুব স্বাভাবিক।

তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু

কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি ছিল স্থির,—তাঁহার বিচক্ষণতা, পাণ্ডিত্য, দূর-দর্শন, মনুষ্য-চরিত্রের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতি গুণের দ্বারা তিনি সর্ব্বত্র মান্য-গণ্য, সমাদৃত হইতেন। আকাশে যেমন ক্ষণে রৌদ্রের আলো, ক্ষণে মেঘের আঁধার, তাঁহার চরিত্রও ছিল তেমনই। এক সময়ে হয়ত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেন, অপর সময়ে হয়ত গম্ভীর-মূর্ত্তি হইয়া বসিয়া থাকিতেন,—তখন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও তাঁহার সহিত কথা কহিতে ভয় পাইতেন। যে গুরুদাসবাবু তাঁহাকে তরুণ যৌবনে ছেলে-মানুষের মত ব্যবহার করিতেন, যে রাসবিহারী ঘোষের কাছে তিনি আইনের 'হাতেখড়ি' লইয়াছিলেন,—সেইরূপ বহু মান্য-গণ্য, গুরুজন-কল্প লোকেরা পরে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাঁহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার সহিত ব্যবহারে, স্নেহ অপেক্ষা সম্ভ্রমের ভাবই বেশী মনে জাগিত। সিনেট-গৃহে তিনি ওজস্বীকণ্ঠে গুরুদাসবাবুর প্রতিবাদ করিতেন,—অপর সকলের কথা তো বলিবারই নহে।

শ্যামাপ্রসাদ লিখিয়াছেন,—তিনি কোন কোন সময়ে ধ্যান-লোকে থাকিতেন, তখন তাঁহার মুখে, চোখে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশ পাইত। বঙ্গদেশের উচ্চ শিক্ষার গড়ন তিনি এই ধ্যানের মধ্যে পাইতেন; এই ধ্যান-লোকের যোগী লোক-গুরু ছিলেন,—ইঁহার বন্ধু হইবে কে? যাঁহার কাছে লোকে শিক্ষা পাইবে, দীক্ষা পাইবে,—যিনি নিজে স্বীয় অসামান্য শক্তি-সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, তাঁহার বিরাট্ রূপ দেখিয়া 'গলায়-গলায় ভাব' করিতে কে সাহসী হইবে? বিরাজমোহন মজুমদার অনেক সময় তাঁহার কাছে থাকিতেন,

কিন্তু এতটা জোর কখনই করিতেন না, যাহাতে কোন গুরুতর বিষয়ে আশুবাবু তাঁহার কথা-দ্বারা পরিচালিত হইতেন। এতটা জোর তাঁহার উপর কাহারও ছিল না। তিনি অনুকম্পার সহিত জগতের দুঃখ-কষ্ট ও এ-দেশীয় লোকের দুর্দ্দশার কথা ভাবিতেন,—তাহাদিগকে তিনি আত্মীয় হইতেও আত্মীয় মনে করিতেন এবং যথাসাধ্য উপকার করিতে চাহিতেন। ঈদৃশ ব্যক্তির আত্মসম্মান-জ্ঞান ও শক্তির মর্য্যাদা তাঁহাকে চিরকালই সাধারণ মানবের ঊর্দ্ধে রাখিয়াছিল ; এই ঊর্দ্ধলোক হইতে নামিয়া তিনি কাহারও সহিত নিবিড় বন্ধুত্ব-পাশে আবদ্ধ হওয়ার অবসর পাইতেন না।

খুব বড় বড় লোকও তাঁহাকে কিরূপ ভয় করিতেন, তাহার অনেক উদাহরণ আমি দেখিয়াছি। এক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তখনকার দিনে এখনকার মত যে-সে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটী পাইতেন না। সুতরাং যে দুই-একজন ঐ পদ পাইতেন, তাঁহাদের মান ছিল খুব বেশী। ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাম অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (A. L. Mookerji)। আশুবাবু একদিন ভিতরকার বাড়ীতে তিন-তলায় ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একখানি কার্ড খুলিয়া চাকরের হাতে দিতে ইচ্ছা করিয়াও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আমি বলিলাম—"ভাব্ছেন কি? কার্ডখানি পাঠাইয়া দিন।" তিনি বলিলেন—"আপনিও দেখা করিতে আসিয়াছেন, আপনার কার্ডখানি পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে আমার কার্ড পাঠাইবার দরকার হইবে না।"

ভয়ানাং ভয়ং

আমি বলিলাম—"মহাশয়, আমি কখনও কার্ড লইয়া এ বাড়ীতে আসি না। আমার সঙ্গে কার্ড-ফার্ড নাই।" তিনি না-ছোড়-বান্দা, টেবিল হইতে একটুকরা কাগজ ও একটি কলম লইয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন,—"আপনি আপনার নামটি ইহাতে লিখিয়া দিন।" আমি তাঁহাকে তাঁহার তৈরী কার্ডখানি ব্যবহার করিতে বলিতে লাগিলাম্ ; তিনি শেষে বলিলেন—"কার্ড পাঠাইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আমার ভয় হয়।" এই ভয়ের কোনই কারণ ছিল না, কারণ সকল সময়ে, সকল অবস্থায় অতি নগণ্য ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া লোকে কচিৎ নিরাশ হইয়া গিয়াছে।

গুণীরাই যে তাঁহাকে খুঁজিত, তাহা নহে,—তিনি গুণীদিগকে নিজে খুঁজিয়া বাহির করিতেন,—যদি কোন গুণীর সন্ধান পাইতেন, তবে তাঁহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষা হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইতেন।

এক বন্ধের দিনে, বেলা দুইটার সময়ে আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি। তখন বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে,—আশুবাবুর সামান্য একটু জ্বর হইয়াছে, এজন্য তিনি আর নীচে নামেন নাই। এই অবস্থায় আমি দোতলার ঘরটায় বসিয়া আছি। অসুস্থ অবস্থায় তাঁহাকে আর বিরক্ত করিব না, এই মনে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এমন সময় তিনি কাহারও মুখে আমার আসার কথা শুনিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন—"আপনার সঙ্গে তো অবনীবাবুর সৌহার্দ্দ্য আছে, শুনিয়াছি আপনি তাঁহাদের ওখানে প্রায়ই যাতায়াত করিয়া থাকেন; আপনি তাঁহার নিকট একটি প্রস্তাব করিতে পারেন? আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা করি, তবে কি তিনি সেই বিভাগের ভার লইতে পারেন? ধরুন, আপাততঃ যদি তাঁহাকে মাসিক ৫০০৲ টাকা দক্ষিণা দেওয়া যায়, তবে তিনি রাজি হইবেন কি? আমার ইচ্ছা যে, আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রের পরীক্ষা ও তাহাতে ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। যদি তাঁহার আপত্তি না থাকে, তবে কাল এই সময়ে যদি তিনি আমার এখানে দয়া করিয়া আসেন, তবে সুখী হইব। আমার অসুখটা না হইলে আমি নিজেই যাইতাম।"

গুণীরা তাঁহাকে খুঁজিত, তিনিও গুণীদের খুঁজিতেন।

অবনীন্দ্রবাবুকে বলা মাত্র তিনি স্বীকার করিলেন এবং যথাসময়ে পর দিন আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিলেন। অবশ্য আমি অবনীবাবুকে লইয়া গিয়াছিলাম।

তিনি অবনীবাবুকে বলিলেন,—"বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নাই, নতুবা আপনাকে এই সামান্য দক্ষিণা দেওয়ার প্রস্তাব করিতাম না, ইহা আপনার যোগ্য নহে। তবে আপনি মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে দুই একটা বক্তৃতা করিবেন এবং যদি কেহ ডিগ্রী পাইতে চায়, তবে তাহাকে উপদেশ দিয়া ও শিখাইয়া সেই উপাধির যোগ্য করিয়া তুলিবেন; আপনার

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবার দরকার হইবে না।" অবনীন্দ্রবাবুকে তিনি সিনেটের 'ফেলো' করিলেন এবং চিত্র-বিদ্যায় অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন।

সেই সময়ে অবনীবাবু গভর্ণমেণ্ট-চিত্রশালার অধ্যক্ষের পদ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রচুর সময় ছিল। তাঁহার প্রথম দিক-কার কয়েকটি বক্তৃতা খুবই ভাল হইয়াছিল এবং তাহা 'বঙ্গবাণী' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

অবনীন্দ্রনাথ

চিত্র-বিদ্যা শিখিতে বেশী ছাত্র জুটিল না, একমাত্র বিশ্বপতি চৌধুরী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। অবনীন্দ্রবাবুর বাড়ীর দ্বার-দেশে শাস্ত্রী, সেপাই ও পাহারাওলা দাঁড়াইয়া থাকে এবং বাড়ীটাও এরূপ বহুমূল্য সরঞ্জামে সজ্জিত যে, সেই প্রাসাদোপম গৃহের দরজা ডিঙ্গাইয়া তথায় প্রবেশ করিতে বোধ হয় ছেলেরা সাহস করিত না। যদিও তাঁহাদের নিত্য-মুক্ত উদার গৃহ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং তাঁহাদের সৌজন্য সকলকে মুগ্ধ করিত, তথাপি অপরিচিত, তরুণ-বয়স্ক ছেলেরা অনাহুতভাবে সে গৃহে প্রবেশ করিতে ভয় পাইত। এইজন্য ছাত্র-সংখ্যা বেশী হইল না এবং কবিজনোচিত চাঞ্চল্য বশতঃ বিশ্বপতিও শিক্ষার শেষ পর্য্যন্ত তথায় টিকিয়া রহিলেন না। আশুবাবু স্বর্গে গমন করিবার পর অবনীন্দ্রবাবুর কাজটি উঠিয়া গেল। আশুবাবু বলিতেন—"যিনি অধুনাতন সময়ে ভারতীয় চিত্র-বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা এবং অবিসংবাদিতভাবে গুরুস্থানীয়, সেই বিশ্ববিশ্রুত-নামা, বরেণ্য অবনীবাবুর শুধু নামটি যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তবে তাহাই যে আমাদের পক্ষে পরম লাভ।"

কিন্তু এই নাম-সংশ্রবে যে প্রতিষ্ঠানের গৌরব হয়, তাহা পরবর্ত্তী কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা স্বীকার করিলেন না। যদি অবনীবাবু কাজ লওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া রীতিমত দুই চারিটি ছাত্র লইয়া একটি চিত্র-বিভাগ খুলিতেন, এবং চিত্র-বিষয়ে ডিগ্রি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, তবে আশুবাবুর সহায়তায় তিনি সুবিধা পাইতেন এবং এই বিভাগটি স্থায়ী হইত।

পূর্ব্বে দুই-একবার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলার প্রশ্ন করিয়াছেন; তখন বাঙ্গলায় এম্,এ'র সৃষ্টি হয় নাই।

বাঙ্গলায় উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ার পর আশুবাবু ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, কবিবর আমাদের সহিত সহযোগ করিয়া এই বিভাগটির উন্নতি সাধন করেন। সূচনায় তিনি এই বিভাগের শিক্ষা-বিষয়ে একটু মনোযোগী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, যাহাতে প্রাচীন বাঙ্গলার রচনার নমুনা-স্বরূপ একটা বড় রকমের সাহিত্য-চয়নিকা সঙ্কলিত হয়, তজ্জন্য তিনি আশুতোষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নূতন এম্, এ'র পাঠ্য-তালিকায় কোন জীবিত গ্রন্থকারের পুস্তক দেওয়া হইল না। রবিবাবু বাদ পড়িলেন,—দীনবন্ধু, মাইকেল প্রভৃতি লেখকেরাও প্রথমে স্থান পান নাই, একমাত্র বঙ্কিমবাবুর লেখা কিছু কিছু পাঠ্য হইয়াছিল। তিনিও জীবিত ছিলেন না। নানা লোকে নানা কথা বলিয়া কবিকে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে আমার নামে কতকগুলি মিথ্যা কথা রটিয়াছিল। আমি রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধার ত্রুটী দেখাইলে কিছুতেই আশুতোষের প্রশ্রয় পাইতাম না।

আশুবাবুর ইচ্ছায় আমি রবীন্দ্রনাথকে যাইয়া বলিলাম—"বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-বিভাগে আপনি প্রশ্নকর্ত্তা-স্বরূপ আমাদের সঙ্গে একটু সহযোগ করিলে আমরা গৌরবান্বিত হইব; আপনাকে ইহার পূর্ব্বে দুই-একবার অনুরোধ করা হইয়াছে, কিন্তু আপনি তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন, এবার আপনি দয়া করিয়া ধরা দিন।" কি ভাবিয়া কবি বলিলেন—"বেশ, কি বিষয়ে প্রশ্ন করিতে হইবে?" আমি বলিলাম—"প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের প্রশ্নগুলি আপনি এবং আমি মিলিয়া করিব। প্রত্যেক প্রশ্নের কাগজ দুইজনে একত্র হইয়া করিয়া থাকেন।" তিনি বলিলেন—"আমি তো এ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহি, আপনি বিষয়টি ভাল জানেন, আপনি প্রশ্ন করিয়া আনুন, তা'রপর আমি দেখিয়া দিব।" তদনুসারে আমি প্রশ্ন করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া গেলাম। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা-কাল প্রশ্নগুলি-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন এবং দুই-একটি প্রশ্ন তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায়, তাহা বদলাইয়া দিলেন। আমি প্রশ্ন লইয়া বাড়ীতে আসিলাম এবং তাহা নকল করিয়া আফিসে দিয়া আসিলাম। দুই-তিন দিন পরে আশুবাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমাকে তিনি বলিলেন—"প্রশ্ন কি আপনিই করিয়াছেন? রবিবাবুকে উহা দেখান নাই?"

আমি সমস্ত কথা তাঁহাকে জানাইলাম। আশুতোষ বলিলেন—"কবিবর জানাইয়াছেন যে, সে প্রশ্ন তিনি করেন নাই, এ সকল দায়িত্ব তিনি লইতে প্রস্তুত নহেন। আপনিই উহা করিয়াছেন, উহাতে তাঁহার নাম যেন দেওয়া না হয়।"

এইরূপ ভাব-পরিবর্ত্তনে আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কেন যে এই পরিবর্ত্তন হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এখনও শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের ন্যায় কারণটি রহস্যের গুহায় নিহিত আছে। হয়ত আমার কোন শুভানুধ্যায়ী কবিকে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া থাকিবেন।

যাহা হউক, প্রশ্নগুলি শুধু আমার নামেই ছাপা হইল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কবিবর 'নোবেল-প্রাইজ' পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে 'ডি,লিট্'-উপাধি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে কাগজ-পত্র সকলই আছে; তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সিণ্ডিকেট যে তারিখে এই সম্মান কবিবরকে দেওয়া স্থির করেন, তাহার পরে কলিকাতায় কবির 'নোবেল-প্রাইজ'-প্রাপ্তির সংবাদ আসে। কিন্তু সিণ্ডিকেটে এই প্রস্তাব পাশ হইবারও অনেক পূর্ব্বে আশুতোষ যাঁহাদিগকে উপাধি দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ আশুতোষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল কবিবরকে বঙ্গ-বিভাগে আনিয়া তাঁহার উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করা; কিন্তু কবিবর ধরা দিলেন না। তাঁহাকে একাধিক বার পরীক্ষক-স্বরূপে পাইবার জন্য আমরা চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছি। আমার উপর বিরক্তির জন্যই হউক, কিংবা সময়াভাবেই হউক, কবি আশুবাবুর জীবিত-কালে বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহার সেই কাম্য গৌরব দেন নাই। আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহার দেহ-রক্ষার পরে কবি সহজে ধরা দিলেন; তখন আমি অপসারিত হইয়াছিলাম; সুতরাং আমি তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে, আমার নিন্দুকেরা আমার নামে তাঁহার কাছে যে সকল কুৎসা করিয়াছে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

একদা আমি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব করিলাম যে, আমরা যদি এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি, যাহাতে প্রতি বৎসর

কলিকাতায় কীর্ত্তনের প্রতিযোগিতা হয় এবং শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়াদিগকে কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হয়,—তবে বোধ হয় বাঙ্গলাদেশের এই বিশিষ্ট সঙ্গীত-ধারাটি প্রোৎসাহিত হইতে পারে। অজ্ঞ পল্লীবাসীর মধ্যে এখন উহা আবদ্ধ আছে; অথচ মহাপ্রভু-প্রণোদিত কীর্ত্তন বঙ্গীয় সংস্কৃতির একটা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সামগ্রী। চিত্তরঞ্জন ইহার অনেক পূর্ব্বেই কীর্ত্তনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তিনি আমার কথাটা খুব আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিলেন। এইরূপ প্রস্তাব হইল যে, চার-পাঁচ জন কীর্ত্তনীয়াকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে সংগঠিত কমিটি দশটি সম্প্রদায়কে বাছিয়া নিমন্ত্রণপূর্ব্বক কলিকাতায় আহ্বান করিবেন, তন্মধ্যে চার সম্প্রদায় পুরস্কার পাইবেন। শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়ার দল যাতায়াত-খরচ এবং মানপত্র-সহ ১০০০৲ টাকা, দ্বিতীয়টি ৬০০৲ টাকা, তৃতীয়টি ৪০০৲ টাকা এবং চতুর্থটি ২৫০৲ টাকা পাইবেন; বাকি যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা শুধু যাতায়াত-খরচ পাইবেন। প্রতি বৎসর এতদর্থে ১০ হাজার টাকা খরচ হইবে। এই প্রতিযোগিতা-মূলক কীর্ত্তন-পুরস্কারের দ্বারা মনোহর-সাঁই, রেনেটি, গড়ানহাটি ও মন্দারণী এই চারি প্রকার কীর্ত্তনই নব প্রেরণা পাইয়া পুষ্টি-লাভ করিবে।

কীর্ত্তনের পুরস্কার-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব

চিত্তরঞ্জন বলিলেন—"আপনি আশুবাবুকে ধরুন, তিনি যদি আমাদের কমিটির সভাপতি হ'ন, তবে বড় ভাল হয়; টাকা আমি তুলিয়া ফেলিব, তজ্জন্য ভাবনা করিবেন না।"

আমি বলিলাম—"আশুবাবু কি কীর্ত্তন পছন্দ করিবেন? তিনি যে প্রকৃতির লোক, তাহা তো কীর্ত্তনের সঙ্গে খাপ খায় না,—আমার এবিষয়ে তাঁহাকে বলিতে ভয় করে।"

তিনি বলিলেন,—"কিসের ভয়? চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব।"

এই কথার পরে চিত্তরঞ্জন একদিন আমাকে লইয়া আশুবাবুর নিকট গেলেন এবং প্রস্তাবটি তাঁহার নিকট উত্থাপন করিলেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলাম, তিনি ঈষৎ দ্বিধার ভাবও দেখাইলেন না তখনই রাজি হইয়া এ বিষয়ে উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। তখনই একটা কমিটি গঠিত হইবার প্রস্তাব পাকা হইয়া গেল—সভাপতি স্বয়ং আশুবাবু,

ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট চিত্তরঞ্জন দাশ এবং আমি সম্পাদক। ইহা ছাড়া আরও অনেক সদস্য থাকিবেন, তাঁহাদের নাম তখন তখনই ঠিক হইল না। কিন্তু আশুবাবুর বাড়ীতে কমিটির দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল,—তখনও সদস্যদের নামের তালিকা করা হয় নাই। তবে আরও তিনজন সদস্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, অপর একজন প্রভুপাদ অতুল-কৃষ্ণ গোস্বামী, তৃতীয় জনের কথা আমার ভালরূপ মনে পড়িতেছে না,—সম্ভবতঃ তিনি প্রমথনাথ তর্কভূষণ—তবে আমি ঠিক বলিতে পারিব না। ইহার অব্যবহিত পরে আমি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলাম এবং প্রধানতঃ এই কারণে প্রস্তাবটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। আশুবাবু যে দেশে সর্ব্ববিধ সংস্কৃতি ও শিক্ষার উন্নতি-কল্পে আগ্রহশীল ছিলেন, তাহা এই ঘটনায় প্রতিপন্ন হইবে। কীর্ত্তনের পুরস্কার ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে যে একটা লুপ্ত-প্রায় বিদ্যা এখনও ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মত ধীরে ধীরে জ্বলিতেছে এবং যাহার প্রভাবও জন-সাধারণের মধ্যে নিতান্ত অল্প ছিল না, সেই কথকতার রীতিটার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলে বোধ হয় তাহা অনেকটা সহজ হইতে পারে। একটা মস্ত-বড় দল লইয়া যাতায়াত ও তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত, পাথেয় প্রভৃতি নানা সমস্যার দরুণ এই কীর্ত্তনের ব্যবস্থাটা কতকটা জটিল,—কথকতা সে তুলনায় অনায়াস-সাধ্য।

আশুবাবু যদি জীবিত থাকিতেন, তবে কত দিক্ দিয়া যে উচ্চশিক্ষার বিস্তার করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি থাকিতেই কৃষি-বিদ্যা-শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলাভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য সিনেট-হাউসে যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারও মহা-যোদ্ধা ছিলেন আশুতোষ। তিনি বুঝাইয়াছিলেন—সমস্ত বিষয়ই ইংরাজীতে পড়িতে হয়,—প্রত্যেক বিষয়োপযোগী পরিভাষা অর্জ্জন করিতে ছেলেদের অর্দ্ধেক সময় নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা বিদেশী ভাষা বুঝিতে ও আয়ত্ত করিতেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং বিষয়-সম্বন্ধে তাদৃশ মনোযোগী হইবার অবকাশ কোথায়? বিদেশী ভাষায় লিখিত বিষয়গুলি পড়িতে যাইয়া তাহারা ভাষার আদর্শ অনুসরণ করিতেই ব্যস্ত হয়। ইংরাজীতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার উর্দ্ধে কিছু লিখিত হইতে পারে, তাহা

তাহারা ধারণাই করিতে পারে না। মৌলিক অনুসন্ধানের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়,—অনুকরণের প্রচেষ্টা ছাড়া তাহাদের কাছে আর কিছু প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। সেক্সপীয়রের সমালোচনা করিতে হইলে তাহারা টেইন-ডাউডন্ যাহা বলিয়াছেন, তদূর্দ্ধে কিছু কল্পনাই করিতে পারে না। অথচ পঁচিশ বছরের ইংরেজ যুবক ব্যাস ও বাল্মীকির টিকি ধরিয়া যখন ইচ্ছা নাড়া দিতেছে,—তাহা উচিত কি অনুচিত, তাহার বিচার করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু নিজের ভাষায় পাঠ করিলে, বিষয়-সম্বন্ধে সহজেই মৌলিক চিন্তার উদ্রেক হয়, পরের ভাষার পাঠ্য-বিষয়ে কেবল অনুকরণের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। সিভিলিয়ান F. H. Skrine সাহেব এইজন্য বাঙ্গলা ভাষার প্রতি উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন :—

শিক্ষার বাহন-স্বরূপ বাঙ্গলা-ভাষা

"I cannot but regret that so little encouragement has been afforded by the State to its cultivation. If a tithe of the pain given by Bengalees to acquire a smattering of English had been devoted to their mother tongue, they would long since have ceased to merit the reproach of producing little or no original work. However, this is not their fault but misfortune. Thanks to the decision arrived at by the influence of Lord Macaulay, Bengali in common with the other vernaculars has pined in the cold shade of official disdain. He who seeks to illustrate them recieves neither recognition nor praise and he cannot look forward to the worldly success which attends a very moderate expertness in English."

—(১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে আমার নিকট লিখিত পত্রের অংশ)।

বাঙ্গলাভাষায় বিষয়গুলি পড়িলে ইংরাজী শিক্ষা-সম্বন্ধে বিঘ্ন হইবে,—এই কথার উত্তরে আশুতোষ বলিয়াছিলেন,—"এখন নানা বিষয় ইংরাজীতে লিখিতে যাইয়া সেই সেই বিষয়ের পরিভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য ছেলেরা যে অযথা বিপুল শ্রম ও সময়ের অপব্যয় করে, সেই গুরুতর শ্রম হইতে মুক্ত

হইলে তাহারা ইংরাজী পাঠ্য-পুস্তকের উপরও বেশী মনোযোগী হইতে পারিবে এবং তখন যদি ইংরাজী পাঠ্য একটু কঠিনতর করা হয়, তবে তাহারা তাহাও বেশ ভাল করিয়া শিখিবার সময় ও সুবিধা পাইবে। সুতরাং ইংরাজী শেখার বিঘ্ন না হইয়া তখন বরং ইংরাজী শেখার পথ আরও সুগম হইবে।"

এই সকল কথা ফ্যাকাল্‌টির সভায় আশুবাবু অতি সরলভাবে এবং পরিষ্কার কথায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

বিরুদ্ধপক্ষীয় কয়েকজন গুণীর কথা বলিব।

শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ-দোহা ও গান' প্রকাশিত হইবার পরে, উহা যে বাঙ্গলাভাষার পূর্ব্বরূপ নহে, বহু পণ্ডিত এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন; বরং হিন্দী ও মৈথিল ভাষার সঙ্গে সেই সকল দোহার ভাষাগত বেশী ঐক্য আছে।

বিরুদ্ধ পক্ষ

ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও আরও কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত ঐ দোহাগুলি-সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করেন। আশুবাবুর আদেশে আমি এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। আমি এই পদগুলি বাঙ্গলা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং সেই প্রবন্ধ আমি প্রকাশ্য সভায় পড়িতে কুণ্ঠিত ছিলাম, কিন্তু শেষে আমাকে তাহা পড়িতে হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় এই জন্য আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'ন; তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এক মনস্বী তরুণ যুবকও আমার প্রতি বিপক্ষতা করিতে থাকেন। দুর্ভাগ্যের কথা, কোন এক বিষয়ে আমি তাঁহার পরীক্ষক নিযুক্ত হই এবং বহু চিন্তা করিয়াও তাঁহাকে পাশ করান' বিবেক-সম্মত কাজ বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। আমি আশুবাবুকে বলিয়াছিলাম,—"আর কোন প্রবীণতর পরীক্ষককে এই কাগজ-পরীক্ষার ভার দিন। এই তরুণ যুবক প্রতিভাশালী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা ছাত্র; ইঁহার কাগজ অগ্রাহ্য করিলে আমি চিরতরে তাঁহার শত্রু হইয়া থাকিব।" তিনি আমাকে রেহাই দিলেন না, তবে আমার নিতান্ত অনুনয়-বিনয়ে আমার সঙ্গে আর একজন পরীক্ষককে জুড়িয়া দিলেন। সেই দ্বিতীয় পরীক্ষকটি ছাত্রটির সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য লিখিয়া আমার মতামতের জন্য কাগজ পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাহাতে একটি সহি মাত্র দিয়া কন্‌ট্রোলারের নিকট পাঠাইলাম।

এই কাগজখানিই সংশোধন ও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া ছাত্রটি বিলাতে উপাধির জন্য দাখিল করিলেন এবং বিলাত হইতে উপাধি পাইয়া আসিলেন। তদবধি তিনি আমার উপর অপ্রসন্ন হইয়া আছেন।

এদিকে আশুতোষ গভর্ণমেণ্টের অসন্তোষ-ভাজন হইয়াছেন শুনিয়া বহু লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিয়া গভর্ণমেণ্টের মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্য প্রয়াসী হইলেন। সহসা যতুনাথ সরকার মহাশয় আশুবাবুর বিরুদ্ধে মস্ত একটা প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। হয়ত গভর্ণমেণ্টের তুষ্টি-সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি হয়ত স্পষ্ট বক্তার ন্যায়ই বীর-বিক্রমে সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্যই আশুবাবুর বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি অব্যবহিত পরেই ভাইস্‌চ্যান্সেলর নিযুক্ত হওয়াতে দুষ্ট লোকে নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিল। আশুতোষের প্রতি প্রতিকূলতার জন্য তিনি ছাত্রদের মধ্যে এতটা অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন যে, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা-কল্পে আহুত এক সভায় সরকার মহাশয় কিছু বলিতে উঠিলে ছাত্রগণ মিলিতকণ্ঠে কলরব তুলিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে নানরূপ অপ্রিয় মন্তব্য করিতে লাগিল। বাস্তবিকই যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার এবং তীক্ষ্ণমেধা ও পাণ্ডিত্যের জন্য যাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র প্রচারিত, এ হেন সর্ব্বজন-মান্য ব্যক্তির প্রতি এরূপ ব্যবহার ছাত্রদিগের পক্ষে অতি গর্হিত হইয়াছিল।

স্যার যতুনাথ, চারু বিশ্বাস ও হরিনাথ

যে দিন আমি সদ্য কলেজ-নিষ্ক্রান্ত প্রতিভাবান্ চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়কে দেখিয়াছিলাম,—তিনি দ্বারভাঙ্গা-বিল্ডিংএর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ক্রুল্ সাহেবের সঙ্গে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছিলেন,—সেই দিনই তাঁহার সুদর্শন তরুণ মূর্ত্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তা'রপর দেখিলাম তিনি আশুবাবুর পুত্র-প্রতিম হইয়া পড়িয়াছেন। গুণগ্রাহী আশুতোষ তরুণ চারুবাবুর গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যাঁহার মধ্যে তিনি কোন অনন্যসাধারণ গুণ আবিষ্কার করিতেন, তাঁহাকে তাঁহার কিছুই অদেয় থাকিত না। ভোলানাথের সেই মহাপ্রাণের স্নিগ্ধ আপ্যায়ন ও স্নেহোক্তি যিনি শুনিয়াছেন, তিনি কি তাহা ভুলিতে পারেন? কিন্তু চারুবাবু যে কি কারণে তাঁহার পূর্ব্বতন নেতাকে, যাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনি এক সময়ে ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতেন, ত্যাগ করিয়া তাঁহার সমস্ত

কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, তাহা জানি না। আমার সঙ্গে তাঁহার কোনই বিরোধ ছিল না; তথাপি যখন দেখিতাম, তাঁহার সেই চিরাভ্যস্ত প্রসন্ন মূর্ত্তিতে আমার উপর বিরক্তির ভাব সুস্পষ্ট, তখন দুঃখিত হইতাম। কিন্তু কিসে যে কি হইল, অমৃত-সিন্ধু মন্থন করিতে করিতে, হঠাৎ কি করিয়া গরল উঠিল, তাহা এখনও আমার নিকট প্রহেলিকা হইয়া আছে।

কিন্তু আর একজন-সম্বন্ধে এই রূপ রহস্যের কতকটা সমাধান হইয়াছিল। হরিনাথ দে যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার বহু ভাষার উপর বিস্ময়কর অধিকার এবং অদ্ভুত পাণ্ডিত্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এইরূপ গুণী ব্যক্তিকে পাইয়া আশুবাবুর আনন্দের অবধি ছিল না। সর্ব্ব বিষয়ে তিনি হরিনাথকে স্মরণ করিতেন; অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার পদোন্নতি করিয়া দিয়া তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিলেন। হরিনাথের সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিত, আশুবাবু তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি শুধু দেখিতেন হরিনাথের প্রতিভা, তাঁহার ল্যাটিন্, গ্রীক্ প্রভৃতি ভাষায় আশ্চর্য্য দখল। তাঁহার ল্যাটিনে লেখা কবিতা লইয়া তিনি গৌরব করিতেন,—ল্যাটিনের মত শক্ত বিদেশী, প্রাচীন ভাষায় কবিতা লিখিয়া হরিনাথ য়ুরোপে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শকুন্তলার এমন সুন্দর ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার সহাধ্যায়ী ইংরাজ পণ্ডিতদেরও লেখা দুঃসাধ্য। কালিদাসের সময় এবং সমুদ্রগুপ্ত ও কুমার গুপ্তের সম্বন্ধে তাঁহার কাব্যের ইঙ্গিত ইত্যাদি নানা মৌলিক তত্ত্বের উপর হরিনাথের প্রতিভা রশ্মিপাত করিয়াছিল। এই গুণে আশুতোষ হরিনাথকে ভালবাসিতেন, তাঁহার জীবনের সার কথা তো এইগুলি। যাহা অসার ও ক্ষণ-বিধ্বংসী, জীবন-কথার সেই সকল অংশের উপর তিনি কোন জোর দেন নাই,—তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

তবুও কেন প্রীতির এই সুবর্ণ-বন্ধন ভাঙ্গিয়া গেল?

এই দুর্ঘটনার আভাষ আমি পাইলাম একদিন সন্ধ্যাকালে, তখন এস্‌প্ল্যানেড্ জংসনে হরিনাথ পায়চারি করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তিনি কাঁধ ধরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিতা আমার

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র বিশেষ প্রশংসা করিতেন, এজন্য পুত্রের কাছেও আমার খুব খাতির ছিল।

তিনি সেইদিন আমার কাঁধ ধরিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন,—কত যে গোলা-গুলি ও বোমা আশুবাবুর বিরুদ্ধে বর্ষিত হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সমস্ত ব্যক্তিগত আক্রমণ, সেগুলি ঝুটো কথা,—কিন্তু যেন ইট-পাট্‌কেলে তাঁহার থলিয়াটি পূর্ণ ছিল। প্রত্যেক কথার শেষে আমাকে সায় দিতে বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—"আপনার মতিভ্রম হইয়াছে। আপনার মহোপকারী এতাদৃশ বন্ধুর বিরুদ্ধে আপনি এই প্রকাশ্য পথে তারস্বরে কি বকিয়া যাইতেছেন? এগুলি কি বিশ্বাস্য,—এগুলি কি আপনার মত লোকের বলা যোগ্য?" আমার কথায় তিনি বিরক্ত হইয়া আমার কাঁধে একটা ঝাঁকি দিয়া দ্রুত বেগে চলিয়া গেলেন,—এমন জোরে ঝাঁকি দিয়াছিলেন যেন আমার মনে হইয়াছিল যে, কাঁধে sprain হইয়াছে।

সেই দিনই বুঝিলাম, এই ঘটনাটি একটি আসন্ন ঝড়ের চিহ্ন; কথাটা ভাল নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কাহাকেও বিন্দুমাত্র কোন কথা বলি নাই। পনের দিন পরে জানিলাম, আশুবাবু হরিনাথের উপর অগ্নি-মূর্ত্তি হইয়াছেন। যাঁহাকে তিনি অত্যাদরে প্রশ্রিত করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা শুনিলে তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠেন। ঠিক কি ভাবে কি হইল, জানি না। কিন্তু হরিনাথ আমার কাছে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিশ্চয়ই আর কয়েক জনের কাছে না বলিয়া ক্ষান্ত হ'ন নাই,—কারণ তাঁহার চরিত্র ছিল সরল এবং সংযম-হীন। তিনি কটূক্তিগুলি পথে পথে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পরে হরিনাথের যে অবস্থা দাঁড়াইল, তাহা প্রকৃতই শোচনীয়। তিনি কর্ত্তব্যে ত্রুটী বশতঃ তাঁহার উচ্চপদচ্যুত হইলেন এবং অল্প পরেই টাইফয়েড্ জ্বরে কয়েকদিন ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আশুতোষ তাঁহার পুত্রগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই একান্ত মহামনা পুরুষবরের গুণমুগ্ধ অনেকে ছিলেন, যাঁহারা চিরকাল তাঁহার প্রতি অচ্ছেদ্য অনুরাগ ও বন্ধুত্ব দেখাইয়াছেন। ওকেনালী, গ্রিভ্‌স্, মন্মথ মুখুজ্জে প্রভৃতি হাই-কোর্টের জজ্‌গণ—কারমাইকেল,

আশুতোষ-যৌবনে

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রোল্যাণ্ড্সে প্রভৃতি লাটগণ, উকীল মহেন্দ্র রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার, আর্কুহার্ট, জে, ডি, এণ্ডার্সন, ডাঃ সিলভ্যাঁ লেভি, ডি, আর, ভাণ্ডারকর এবং তাঁহার প্রথিতযশা পিতৃদেব প্রভৃতি বহু ব্যক্তি তাঁহার চিরানুরক্ত ও প্রতিভা-মুগ্ধ ছিলেন, অনেকেই আজীবন তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নানা কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন; ইঁহারাই ছিলেন সুখ, দুঃখে তাঁহার নিত্যবন্ধু। ইহা ছাড়া শত্রুরা যতই না কেন জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে গঠন করিবার চেষ্টা করুন,—জনসাধারণ, বিশেষতঃ পঙ্গপালের ন্যায় ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার প্রতি চিরদিন স্নেহ ও শ্রদ্ধা-পূর্ণ ছিল। দেশের লোকের, বিশেষতঃ দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য তিনি যে প্রাণপাত করিয়া খাটিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল এবং আছে।

আশুতোষের গুণ-মুগ্ধ

শত্রু-পক্ষ তাঁহাকে অনেকরূপ কষ্ট দিয়াছেন। যিনি জন-সমাজের হিতের জন্য সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, ভগবান তাঁহাকে অশেষরূপ কষ্টদায়ক অবস্থায় ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন। নিজেকে ভুলিয়া দেশের জন্য, দশের জন্য প্রাণ আহুতি দিতে যিনি সঙ্কল্প করেন, তাঁহার জীবনের প্রাণান্ত শ্রম ও পরোপকার-চেষ্টার পুরস্কার-স্বরূপ তিনি কি লাভ করেন?—নিন্দা, ঈর্ষা, বিদ্রূপ, কণ্টক-কিরীট ও ক্রুস্-বিদ্ধ মৃত্যুদণ্ড। যদি এই প্রতিকূলতা ও এইরূপ মৃত্যু বরণ করিয়াও কেহ সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ ও অকুতোভয় ত্যাগের ব্রতে সুদৃঢ় থাকিতে পারেন, তবে তাঁহার মাথার কণ্টকের মুকুট চিরোজ্জ্বল হীরক-কিরীটে পরিণত হইবে এবং তিনি দেবতা বলিয়া পূজা পাইবেন।

আশুবাবুর বিরুদ্ধে অতি তীব্র প্রতিকূলতা হইয়াছিল এবং নীলকণ্ঠের ন্যায় বিষ পান করিয়াও তিনি কর্ত্তব্য-ক্ষেত্রে শিথিল-প্রযত্ন হ'ন নাই।

আবার বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। সরকারী দান যখন একরূপ বন্ধ হইল, তখন বাহিরের দান-প্রাপ্তি-সম্বন্ধেও নানারূপ বিঘ্ন ঘটিল। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, যদি একথাটা রটিয়া যায় যে, গভর্ণমেণ্ট্ তাঁহার প্রতিকূল, তবে দেশের লোকেরা কি কোনরূপ সহায়তা করিতে সাহসী হইয়া অগ্রসর হইতে পারে? অন্য কেহ হইলে যাহাতে

ম্যাট্রিক প্রভৃতি পরীক্ষার 'ফি' বৃদ্ধি

বিরোধ মিটিয়া যায়, এই দুঃখের সময়ে সেইরূপ চেষ্টাই করিতেন। তিনি রাষ্ট্র-নেতাদের মত বাহিরে বিদ্রোহ-ঘোষণা কিংবা শাসন-কার্য্য-সম্বন্ধে সমালোচনা করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল।

যখন টাকার পথ চারিদিকে রুদ্ধ হইল, তখনও আশুবাবু হটিয়া গেলেন না, জানু পাতিয়া বসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না। এই কর্ম্মী পুরুষ হাল ছাড়িয়া দিবার লোক ছিলেন না, বিপদে ধৈর্য্য এবং উদ্ভাবনী শক্তির অভাব তাঁহার কোন দিনই হয় নাই। তিনি প্রস্তাব করিলেন, যদি ম্যাট্রিকুলেশন প্রভৃতি পরীক্ষার 'ফি' কিছু বাড়ান যায়, তবে আসন্ন বিপদ কাটিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কতকটা স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী তখন প্রায় বিশ হাজার,—পাঁচ টাকা করিয়া 'ফি' বাড়াইলে বৎসরে এক লক্ষ টাকা হয়। অপরাপর পরীক্ষার 'ফি'-ও কিছু করিয়া বাড়াইলে আরও প্রায় এক লক্ষ টাকা হইতে পারে ; এই দুই লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় হইলে গোল-দীঘির পশ্চিম পাড়টার সমস্ত সমস্যা মিটিয়া যায়,—এই প্রতিষ্ঠান নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে।

ছাত্রদের কষ্টে বিগলিত হইয়া প্রতিপক্ষীয়-দল আশুবাবুর নির্ম্মমতার কথা লইয়া ঢাক পিটিতে আরম্ভ করিলেন। কি নিষ্ঠুর এই আশুবাবু! ছেলেরা এই ঘোর দুর্দ্দিনে খাইতে পায় না,—ভিটে-মাটি বন্ধক দিয়া অভিভাবকেরা কষ্টে-সৃষ্টে এই দুর্দ্দিনের বাজারে তাহাদের পড়ার খরচ চালাইতেছেন, তাহার উপর আবার পরীক্ষার 'ফি'-বৃদ্ধি! চারিদিকে এমন একটা হৈ হৈ রব হইতে লাগিল, যে, তাহাতে কানে তালি লাগিবার কথা।

আশুবাবু তাঁহার উদ্দেশ্য অতি সরল এবং স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন,—

"একটি ছাত্র বৎসরে ৩০০৲ টাকার নীচে পড়ার সর্ব্ববিধ খরচ নির্ব্বাহ করিতে পারে না। পরীক্ষার 'ফি' বৎসরে একবার মাত্র দিতে হইবে, তাহাতে বাৎসরিক তাহার ন্যূন পক্ষে ৩০০৲ টাকা ব্যয়ের উপর যদি পাঁচটি টাকা বেশী দিতে হয়, তবে তাহা দাঁড়াইবে ৩০৫৲ টাকায়। ইহা কি তাহার দৈন্যের কষ্ট খুব বাড়াইবে?

"অথচ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রায়ই ছাত্র-বেতন বাড়াইয়া থাকেন। সেই বর্দ্ধিত হারে বেতন তাহাদের প্রতি মাসে দিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, তাহা

বৎসরের পর বৎসর ভরিয়া টানিতে হয়। একবার মাত্র সামান্য 'ফি' দেওয়া কি তাহাদের পক্ষে তদপেক্ষাও কষ্টকর?

"আমরা একটি 'ফাণ্ডে'র সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমরা নিজেরা দিতেছি। যদি নিতান্ত অক্ষম কোন ছাত্র এই অতিরিক্ত পাঁচ টাকা দিতে কষ্ট বোধ করে, তবে ভাল করিয়া তাহার অবস্থা অবগত হইয়া আমরা সেই 'ফাণ্ড্' হইতে তাহাকে সাহায্য করিব।"

আশুবাবুর এই যুক্তির উপর কথা বলিবার বেশী কিছু না থাকিলেও বন্ধুরা কথা বলিতে ছাড়িলেন না। যিনি ছাত্রদের অকপট বন্ধু, তাহাদের উপকারের জন্য সতত ব্যস্ত এবং যিনি পরীক্ষার পথ সুগম করিয়া না দিলে, শত শত ছাত্র অনেক সময়ে অন্যায় ভাবে 'ফেল' হইয়া পুনরায় বৎসর ভরিয়া পড়ার ব্যয় বহন করিতে বাধ্য হইত, সেই আশুতোষকে ছাত্রদের ঘোর অনিষ্টকারী ও শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অনেকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

তর্কের মুখে আশুবাবু একবার বলিয়াছিলেন—"অনেক ছেলেই তো সিনেমার দ্বারে এরূপ ভিড় করে যে, মনে হয়, তাহারা তাহাদের আর্থিক দুরবস্থাটাকে বেশী কিছু বলিয়া গণ্য করে না।"

এই কথায় প্রতিবাদী-দল এবার একটা বড় রকমের সুবিধা পাইলেন, এবং খবরের কাগজে ইহা লইয়া তাঁহাকে খুব টিট্‌কারী দিলেন। যাহা হউক পরীক্ষার 'ফি'-বৃদ্ধি সিনেটে পাশ হইলেও কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী পাইল না।

এই দুর্দ্দিনে আমি সাহস করিয়া বলিয়াছিলাম,—"আপনি যদি একটুকু অবনতি স্বীকার করেন, তাঁহারা তো রাজা, তাহাতে বেশী কি দোষ হয়? আপনার যে এই ঘোর দুশ্চিন্তা ও আমাদের বিপদ, তাহা তো সহজেই দূর হইতে পারে।"

তিনি সেদিন ক্রুদ্ধ হইলেন, বজ্র-স্বরে বলিলেন—"কাহার জন্য নতি স্বীকার করিব? আশু মুখুজ্জে সে শর্ম্মাই নহে। এই জগতটা রাজপুরুষদের আদেশে চলিতেছে না। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই কি হইবে? উপরওয়ালা একজন আছেন, যাঁহার হুকুমে সকল হয়। আপনারা বসুন, দেখুন না, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হইবে এবং আমরা যাহা ইচ্ছা করি, তাহা হইবে না,—এ কথা মনে করা ঠিক নহে। কাজ করিয়া যাই

শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। যাহা ভাল বুঝিব, করিব; কোন লোকের খাতিরে বা ভয়ে কিছু করিব না। আমার হাতে যে টুকু আছে, সে টুকু করিতে কোন ত্রুটি হইবে না। তা'র পরে ফল দেওয়ার যিনি কর্ত্তা, তিনি বিধান করিবেন। আমার কর্ত্তব্য আমি নির্ভয়ে করিয়া যাইব, জানিবেন। তাঁহার একটা বিধান আছে, তাহাই বড় বিধান। অন্য কাহারও বিধানের কাছে কিছুতেই মাথা হেঁট করিব না,—যদি তাহা অন্যায় বুঝি।"

ধর্ম্ম-বিশ্বাস

তিনি ১৯২২ সনের ২রা ডিসেম্বর তারিখে সিনেট-সভায় বক্তৃতা-কালেও এই কথাই বলিয়াছিলেন:—

"Do not my friends, believe for a moment that there is no Providence. If Science or Philosophy has taught you that, get rid of the blunder. If it is the desire of the Providence that high education should disappear from Bengal, let His will be carried out; but I have an unalterable faith in Providence, that has been my one sole inspiration in moments of trials and tribulations."

[বন্ধুগণ, আপনারা মনে করিবেন না যে, বিধাতা বলিয়া কেহ নাই। যদি দর্শন বা বিজ্ঞান আপনাদিগকে ইহাই শিখাইয়া থাকে, তবে সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর করুন। যদি সেই বিধাতার ইচ্ছা ইহাই হইয়া থাকে যে, বঙ্গদেশ হইতে উচ্চ শিক্ষা অন্তর্হিত হইবে, তবে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। কিন্তু আমার ভগবানের উপর অটল বিশ্বাস আছে। বিপদ ও পরীক্ষার মুহূর্ত্তে সেই বিশ্বাসই আমার চিরকালই শক্তির উৎস-স্বরূপ হইয়াছে।]

এই কথা কেবল মুখের কথা নহে, বীর-প্রকৃতি আশুবাবুর এই অটল বিশ্বাস অতি দুর্লভ গুণ। তিনি সহসা ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া কিছু করিতেন না। সর্ব্বদা লোকের উপকারী ছিলেন, কাহারও অপকার করিবার বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। তাঁহার সুচিন্তিত কর্ম্ম-ধারা বিশ্বাসের লৌহ-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা হইতে তাঁহাকে টলান কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

লোকে ভাবিত এবম্বিধ কঠোর স্বভাবের লোকের নিকট ধর্ম্মের আহ্বান আর কি সাড়া পাইবে? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অনেক ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি-

বিশিষ্ট লোক অপেক্ষা অধিকতর ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব কার্য্যের মধ্যে সর্ব্ব-নিয়ন্তার অকাট্য বিধানের উপর অটল বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসই তাঁহাকে নির্ভয় ও বলশালী করিয়াছিল। তিনি যে পথ সম্মুখে দেখিতেন, ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া, বাহ্যাড়ম্বরের ছল-চাতুরী অবলম্বন না করিয়া একেবারে যোগী, সন্ন্যাসীর মত সেই পথে চলিতেন। কখনও কখনও দুর্গা-পূজার সময়ে দেখা যাইত শুভ্র কৌষেয় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তিনি মায়ের প্রতিমার কাছে বসিয়া গীতা অথবা চণ্ডী পাঠ করিতেছেন। জজ্‌ দুর্গাপ্রসন্ন রায় একদিন দুর্গা-পূজার সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইয়া দেখিলেন, গরদের জোড় পড়িয়া ভগবতীর অনতিদূরে বসিয়া আশুবাবু চণ্ডী পাঠ করিতেছেন,—ঘণ্টার পরে ঘণ্টা চলিয়া যাইতে লাগিল,—সেই গম্ভীর কণ্ঠের আবৃত্তি থামিল না। দুর্গাপ্রসন্নবাবু বিস্মিত হইলেন, এই কি সেই আশুতোষ,—স্বয়ং সম্রাট্‌ যাঁহার সম্মান করেন; ছোটলাট, বড়লাট যাঁহার বন্ধু; হাই কোর্টের জজেরা যাঁহাকে তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন, যিনি ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতা এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হর্ত্তা-কর্ত্তা, যাঁহার গর্জ্জন লোকে ব্যাঘ্রের গর্জ্জনের মত ভয় করে; হাইকোর্টে যাঁহার বিধানগুলি চিরস্মরণীয় হইয়া ব্যবহার-শাস্ত্র উজ্জ্বল করিয়াছে; গণিত শাস্ত্রের যিনি মহাম্বুধি এবং বৌদ্ধগণের অতিপরিচিত 'সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী'! সমস্ত জগতের প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধিগুলি যাঁহার নামের সৌষ্ঠব এবং প্রদাতৃগণের গৌরব সাধন করিয়াছে,—সেই সর্ব্বজন-বন্ধু পুরুষ-প্রবর, বাঙ্গলার ব্যাঘ্রের এই পুরোহিতের বেশ, ভক্তের কণ্ঠ,—ইহা যে অভাবনীয়!

বাস্তবিক লোকে যাহা জানিত না, ধর্ম্মের সেই উৎস আশুবাবুর প্রকৃতিতে অতি নিভৃতভাবে লুক্কায়িত ছিল এবং তাহাই তাঁহার সমস্ত কার্য্যে প্রেরণা দিত। এই জন্যই তিনি কখনও নৈরাশ্য বা ক্ষোভ দেখাইতেন না।

ভবানীপুরের শোক-সভায় বিচারপতি ঘোষ বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের উপর পূর্ণ নির্ভরই আশুতোষের শক্তির প্রধান উৎস ছিল।

তিনি এরূপ চিকিৎসক ছিলেন, যিনি শেষ পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিতেন এবং ভগবানের মঙ্গলময় বিধান শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট্‌ রেজিষ্ট্রার

চন্দ্রভূষণ মৈত্রেয় মহাশয়ের জীবনের আশা ডাক্তারগণ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। নীলরতনবাবু বলিয়াছিলেন,—"ইঁহার পূর্ব্বেই মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল, শরীরের সমস্ত অংশে মৃত্যুর লক্ষণ অতি স্পষ্ট, ইনি যে কি করিয়া এতক্ষণ বাঁচিয়া আছেন, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।" আশুবাবু তাঁহাকে ঘন ঘন দেখিতে যাইতেন। আমরা শুনিলাম, তাঁহার পীড়া শিবের অসাধ্য, এখনই মৃত্যু হইবে, ডাক্তারগণ সকলে এক বাক্যে বলিতেছেন। আশুবাবু ফিরিয়া আসিলে আমি লোকটির এইভাবে মৃত্যু হইবে, এইজন্য দুই একটা পরিতাপের কথা বলিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি খুব বিরক্ত হইলেন,—বলিলেন—"লোকে মরে, বাঁচে কি ডাক্তারের ইচ্ছায়—না ভগবানের ইচ্ছায়? আপনারা এখনি মরার কান্না আরম্ভ করিয়াছেন কেন? আমি বলিতেছি এখনও অবস্থা ভাল turn নিতে পারে এবং চন্দ্র মৈত্র বাঁচিতে পারেন।" শেষ পর্য্যন্ত তিনি আশা রাখিতেন; জীবন-তরীর সুদক্ষ কাণ্ডারী কখনও হাল ছাড়িয়া দেওয়ার কল্পনাটাও সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি বস্তুতঃই শ্মশান পর্য্যন্ত বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পরিচিত এবং আশ্রিতদের মধ্যে যে মুমূর্ষু,—যে মৃত, জীবনে-মরণে তাহার মহাবন্ধু ছিলেন আশুতোষ। প্রথমতঃ তাহার চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া, তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও পরিবার-প্রতিপালনের সর্ব্ববিধ উপায় করিয়া তিনি নিরস্ত হইতেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমার পেটের নীচে একটা টিউমার পাকিয়া গিয়াছিল, সঙ্গে খুব জ্বরও ছিল। নানা কারণে চাঁদসীর ডাক্তারদের চিকিৎসার উপর আমার খুব আস্থা আছে। আমি তাঁহাদেরই একজন প্যারীচরণ দাসকে দিয়া চিকিৎসা করাইতেছিলাম। আশুবাবু শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—"হাতুড়ে আনাড়ীর হাতে মরিবে, আর আমরা দাঁড়াইয়া দেখিব?—তাহা হইবে না। আমি ডাক্তার পাঠাইতেছি,—দরকার হইলে সাহেব ডাক্তার লইয়া নিজে যাইতেছি।" কিছু পরেই ডাঃ উপেন্দ্র ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন,—"আশুবাবু চিন্তিত হইয়া আপনাকে দেখিবার জন্য আমাকে ঘন ঘন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, ব্যাপার কি বলুন তো।" আমার ক্ষত-স্থানটা তখন অনেকটা শুকাইয়া আসিয়াছে। তিনি দেখিয়া বলিলেন,—"আপনি তো প্রায় সারিয়া উঠিয়াছেন। কে চিকিৎসা করিতেছেন?" আমি বলিলাম—"চাঁদসীর ডাক্তার প্যারীমোহন

সমস্ত বিষয়ে ভালোর দিকে দৃষ্টি

দাস।" ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন—"ও কথা আমরা মানিব না, আপনাকে natureই (প্রকৃতিই) সারাইয়াছে।"

আর একবার আমার মধুপুরে ডবল নিউমোনিয়া হইয়াছিল। অবস্থা এত খারাপ দাঁড়াইয়াছিল যে, সেইখানে কলিকাতা হইতে Oxygen gas আনাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আশুবাবু ছিলেন কাশীতে,—তিনি ব্যস্ত হইয়া কত যে খবরাখবর লইয়াছেন, তাহা আর কি বলিব! আমি ছুটির জন্য উৎকণ্ঠা দেখাইলে তিনি আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, ঐ সকল বাজে কথা ভাবিয়া পীড়ার সময়ে কেন আমি ব্যস্ত হইয়াছি? যতকাল আমি বিছানায় পড়িয়া থাকিব, এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইব, সে পর্য্যন্ত আমি ছুটি পাইব। তিনি আমার পুত্র কিরণকে ১৯২০ সনের ১লা নভেম্বর তারিখে যে ছোট পত্রটুকু লিখিয়া আমার সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল:—

কল্যাণবরেষু—

তোমার পিতাঠাকুর মহাশয় কেমন আছেন জানাইলে সুখী হইব।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এই সময় আমি তাঁহার ও রমাপ্রসাদবাবুর অনেক পত্র পাইয়াছিলাম। স্বীয় পরিবারের কেহ পীড়িত হইলে লোকে যেরূপ ব্যস্ত হ'ন, এই চিঠিগুলিতে সেইরূপ উৎকণ্ঠার ভাব ছিল।

দুর্দ্দিনে অভয় দেওয়ার লোক জগতে বড় দুর্লভ। যখন প্রাণ হাঁপাইয়া পড়ে, নানারূপ আশঙ্কা বিভীষিকার আকার ধারণ করে; যখন অবস্থার বৈগুণ্য এবং শনৈশ্চরের চক্রে মানুষ চারিদিকে অন্ধকার দেখে,—শৈশব অবস্থায় সেইরূপ সময়ে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া বালক স্বর্গীয় শান্তি ও আরাম পায়, কিন্তু সাংসারিক জীবনে লোকে দুঃসময়ে সেইরূপ আশ্রয় পায় না। অনেকে স্তোক-বাক্য বলেন, কিন্তু তাহা সোলার ফুলের ন্যায় কৃত্রিম। কিন্তু এই একটি লোক দেখিলাম, যিনি প্রকৃতই বিপন্নের বন্ধু, যাঁহাকে দেখিলে মৃত্যু-মলিন,

ভয়ে আড়ষ্ট ব্যক্তিও জীবনের ভরসা ও সোয়াস্তি পাইত। হায়! আশুবাবু আর কি তোমার সেই প্রীতিফুল্ল, জীবন-প্রদ, সুধা-বর্ষী কৃপা-দৃষ্টি পাইব! যিনি বিপন্নের উদ্ধার-কর্ত্তা বন্ধু, যিনি বুক হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া পরের ব্যথা নিজে গ্রহণ করেন, সেই অলৌকিক সহৃদয়তা, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি আর কোথায় পাইব? সিনেট-গৃহের বিপুল স্তম্ভরাশি গোলদীঘির তীরে দর্শনীয়, তদপেক্ষা উচ্চ, দ্বারভাঙ্গা-গৃহের উন্নত শীর্ষ এবং আশুতোষ বিল্ডিংএর ক্রম-বিকাশমান বিরাট্ অবয়ব,—কিন্তু উহার সেই ভিত্তি আজ কোথায়—যাহা লোক-প্রাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই অসামান্য সান্ত্বনার বাণী প্রচার করিত,—যাহাতে ছাত্র, অধ্যাপক এবং কর্ম্মচারিগণের বক্ষ স্ফীত ছিল,—মস্তক উন্নত এবং হৃদয় নির্ভয় ছিল,—পারিবারিক দুঃখের সমস্যা,—অবিচারের ভয়,—উন্নতির বিঘ্ন,—নানা সঙ্কটের অবস্থায় যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া মনে হইত—"ভয় নাই, প্রকাণ্ড বিটপীতলে আছি, আশ্রয় পাইব?" আশা করি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদও কালে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই বংশগত ঔদার্য্য-গুণে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

আশুতোষের ধর্ম্ম-বিশ্বাসই তাঁহাকে এরূপ লোকের প্রতি-সহানুভূতি-পরায়ণ করিয়া লোক-রঞ্জনের শক্তি দিয়াছিল, কারণ, যিনি স্রষ্টাকে ভালবাসেন, সমস্ত সৃষ্ট বস্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ। এই বিশ্বাস হইতেই তাঁহার চরিত্রের অপূর্ব্ব সামাজিকতা বিকাশ পাইয়াছিল। যে কেহ তাঁহাকে ডাকিত, যত ক্ষুদ্র ব্যক্তিই সে হউক না কেন, যত সামান্য আয়োজন দিয়াই সে তাহার প্রাণের দেবতাকে আহ্বান করুক না কেন, আশুবাবু বিদুরের ক্ষুদের লোভেও তাহার বাড়ীতে যাইতেন। একজন সোফারের বাড়ীতে খাওয়ার পরই তাঁহার মৃত্যুরোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি নিজে লোকজনকে খাওয়াইতে ভাল বাসিতেন, অপরকে নিজের বাড়ীতে খাওয়াইয়া তৃপ্ত হইতেন। যে কেহ নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তিনি তাহার বাড়ীতে যাইয়া আসন পাতিয়া খাইতে বসিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ ছুঁৎমার্গাবলম্বী হইয়া সেই স্থানে অনাহারে বসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন, আশুবাবু তৃপ্তির সহিত খাইতে থাকিতেন। পিতা-পুত্রের প্রকৃতির এই বৈষম্য-দর্শনে বেদান্তের সেই দুইটি পাখীর কথা মনে পড়িত, যাহাদের একজন খায়

খাইয়া ও খাওয়াই সুখী

এবং অপরে শুধু চাহিয়া দেখে। ভীমনাগের সন্দেশ তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। তাঁহার দেহাবসানের পর সেই দোকানের লোকেরা দুঃখ করিলেন যে, তাঁহাদের একজন বড় খরিদ্দারের অভাব হইল। ভীমনাগের সন্দেশ শুধু তিনি নিজে কিনিয়া খাইতেন না, তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়গণও সেই সন্দেশ কিনিয়া তাঁহাকে উপহার দিতেন।

এই সূত্রে আমার নিজের সম্বন্ধে একটা ঘটনার উল্লেখ করিব। আমার তৃতীয় পুত্র বিনয়ের বিবাহে আমি কোন ঘটা করি নাই,—এমন কি বৌ-ভাত পর্য্যন্ত করি নাই। বিবাহের পরে আমি ভবানীপুরে গিয়াছি,—আশুবাবু রাগিয়া গিয়া আমাকে ধম্‌কাইতে লাগিলেন—"বৌ-ভাতটা পর্য্যন্ত করিলেন না, আমাদের নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করিলেন না!—এইরূপ ব্যবহার কোথায় শিখিলেন?" আমি বলিলাম—"আমি বিবাহে কপর্দ্দক পর্য্যন্ত নেই নাই, উপরন্তু পুত্র-বধূকে গহনা দিতে হইয়াছে এবং বিবাহের অপরাপর ব্যয় করিতে হইয়াছে। মেয়েদের বিবাহে বহু খরচ করিয়াছি, এখন উচ্চশিক্ষিত ছেলেদের বিবাহেও যদি বহু ব্যয় করিতে হয়, আমি কোথায় পাইব?"

আমি বুঝিলাম আশুবাবু সত্যই একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কয়েকদিন পরে আমি মস্ত এক ঝুড়ি ভীম নাগের সন্দেশ ও ঢাকার অমৃতি ভেট্ লইয়া তাঁহার বাড়ীতে গেলাম,—সঙ্গে আমার নূতন পুত্রবধূ এবং আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ গেলেন। এই জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ (কিরণের স্ত্রী) আশুবাবুর পরিবারে বিশেষ পরিচিতা, যেহেতু তাঁহার পিত্রালয় ছিল মধুপুরে, তথায় "গঙ্গাপ্রসাদ-গৃহে" তাঁহার সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল। তাঁহার প্রিয় খাদ্য ভেট্ পাইয়া আশুতোষের গুম্ফসহ সমস্ত মুখখানি যেন হাসিয়া উঠিল; দেখিলাম আকাশের গায়ে যে একটু কৃষ্ণ মেঘ জমিয়াছিল, তাহা একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। তিনি আমার নব-বধূমাতাকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; একটি সোনার গহনা দিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল। সম্ভবতঃ আমার পুত্রের বিবাহের কথা শুনিয়া তিনি ঐরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন, মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি বৌ-ভাত না করাতে তিনি এই জন্যই এতটা ক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন।

এই অপূর্ব্ব সামাজিকতা তাঁহার চরিত্রে মাধুর্য্য দান করিয়াছিল—এবং অন্য সকলেই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিবেন; আমি নিজের

সম্পর্কে যাহা জানি, তাহাই লিখিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কর্ম্মচারীরা তাঁহার অজস্র দয়া এবং অনুগ্রহ পাইত। কিন্তু কেহ বাস্তবিক কিছু অন্যায় করিলে তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন,—সেই লোকোত্তর পুরুষ কুসুমের মত কোমল হইয়াও বজ্রের মত কঠিন হইতে পারিতেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আমার সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা হইয়াছিল; তাহা এখানে উল্লেখ করিব।

চরিত্রের অপর একটা দিক্

সেবার আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার হেড্ এগ্জামিনার। আমার তখন তিন তলার একখানি ঘর তৈরি হইতেছে এবং সমস্ত বাড়ীটার মেরামত চলিতেছে। আমি কন্ট্রোলার অবিনাশবাবুকে যাইয়া বলিলাম,—"আমার বাড়ীতে জায়গা সঙ্কীর্ণ, বিশেষ রাজ-মজুরেরা যেখানে সেখানে, অবাধে যাতায়াত করিতেছে,—ম্যাট্রিকের এই রাশি রাশি কাগজ সেখানে রাখা অত্যন্ত অসুবিধা-জনক এবং একেবারেই নিরাপদ নহে। পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, আপনারা ২।৩ মাস হেড্এগ্জামিনারের বাড়ীতে মিছামিছি খাতাগুলি ফেলিয়া রাখেন, এবার কিন্তু আমার তাহা রাখিবার একেবারেই সাধ্য নাই।" অবিনাশ বাবু বলিলেন—"তা' ঠিকই তো, আপনি নরেনকে (নরেন্দ্রনাথ সেন, পরবর্ত্তী কন্ট্রোলার) বলুন।"

আমি নরেনবাবুকে বলিলে তিনি বলিলেন,—"সে হইতেই পারে না, আমাদের আফিসে এখন কাগজ রাখিবার জায়গা নাই। আরও ২।৩ মাস কাগজ আপনার ওখানেই থাকিবে।" আমি বলিলাম,—"যদি রাজ-মজুরের দ্বারা কাগজ নষ্ট হয়,—সব ঘরেই মেরামত চলিতেছে; আমার পরিবার লইয়াই খুব কষ্টে-স্বষ্টে বাড়ীতে থাকিতে হইয়াছে, এখন কাগজ কোথায় রাখি বলুন তো? শেষে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।" ক্রুদ্ধ-স্বরে তিনি বলিলেন—"নষ্ট হয় তো সে দায়িত্ব আপনার।"

'সে হইতেই পারে না'

এই বলিয়া নরেনবাবু অবিনাশবাবুর কাছে কি বলিয়া আসিলেন। তা'রপর আমি অবিনাশবাবুর কাছে পুনরায় যাইয়া বলিলাম,—"আপনার কথা তো নরেনবাবু রাখিলেন না, ঘোর আপত্তি করিতেছেন, আফিসে না-কি জায়গা নাই।"

অবিনাশবাবু বলিলেন—"তাই তো, আমাদের এখানে প্রকৃতই জায়গা নাই। নরেনবাবু কি করিবেন?" ইহার মধ্যে নরেনবাবু আসিয়া বলিলেন,—"বেশ তো, এত কথা কাটাকাটি করিয়া লাভ কি? আজ সিণ্ডিকেট্ আছে, আপনি তাঁহাদিগকে জানান না কেন? তাঁহারা আদেশ দিন, জায়গা দিন।"

তথাপি আমি অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলাম। কিন্তু অবিনাশবাবু বেশী কিছু না বলিলেও নরেনবাবু বারংবার আমাকে সিণ্ডিকেটে আবেদন করিতে বলিতে লাগিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, আমি সিণ্ডিকেটে আবেদন করিব না, এবং যদিও বা করি, অবিনাশবাবুর কথা ডিঙ্গাইয়া তাঁহারা আমাকে প্রশ্রয় দিবেন না।

আমি এইরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"তবে কি সত্যই আমি সিণ্ডিকেটে জানাইব? আপনারা অনুমতি দিন, আমি তাহাই করি, আর গত্যন্তর নাই।"

"হাঁ, হাঁ, তা'ই করুন, বেশী কথার দরকার নাই।"

আমি সেইখানে বসিয়াই একখানি আবেদন লিখিলাম এবং তাহা লইয়া বাহির হইয়া গেলাম। রেজিষ্ট্রারের ঘরের সম্মুখে যাইয়া ভাবিলাম—অবিনাশ-বাবুর অমতে এরূপ চিঠি লেখা ভাল নহে; সকলে এক খানে কাজ করিতেছি, বিরোধের মত কিছু হওয়া ভাল নহে। যাই, নরেনবাবুকে আবার বলিয়া দেখি।

আমি নরেনবাবুর ঘরে গেলাম; সেখানে অন্য দুই একজন কেরাণী তাঁহার কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি বলিলাম—"নরেনবাবু, কেন আমাকে কষ্ট দিতেছেন? কাগজগুলি লইয়া আমি বাস্তবিকই বিপদে পড়িয়াছি?"

নরেনবাবু নিশ্চয়ই ভাবিলেন,—আমি সেই আবেদন পেশ করিয়াছি, কিন্তু আশুবাবুর তাড়া খাইয়া পুনরায় তাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছি। তখন তিনি উত্তেজিতকণ্ঠে একটি হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—"কেন বারংবার বিরক্ত করিতেছেন? আমি বলিতেছি, সে হইবার নহে।"

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সিনেটের সদস্য। কেরাণী-খানার এই ব্যবহারে আমি বড়ই অপমানিত বোধ করিলাম। আমি বলিলাম,—"নরেন

বাবু, আমাকে ভাবিয়াছেন কি? আমি কি আপনার অধীনস্থ কেরাণী যে, এভাবে আদেশ প্রচার করিতেছেন? আমি আপনার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ তো বটে!"

নরেনবাবু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"আপনি আমার পূজনীয়, আপনি বিরক্ত হইবেন না,—যদি আমাদের সুবিধা থাকিত, কাগজগুলি আনাইতাম; কিন্তু সে সুবিধা দেখিতে পাইতেছি না।" দুই-একজন কেরাণী বলিলেন,—"নরেনবাবুর উপর আপনার বিরক্ত হওয়া ভারী অন্যায়,—উঁহার দোষ কি? বাস্তবিক একটু জায়গামাত্র নাই।"

নরেনবাবুর প্রতি বিরক্ত হওয়া অন্যায়

আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ রেজিষ্ট্রার যোগেশবাবুর ঘরে আসিলাম; সেখানে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"দীনেশবাবু, কি হইয়াছে? একটু বিমর্ষ দেখিতে পাইতেছি।" আমি সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিলাম; অপমানে আমার চক্ষু দুইটি সজল হইয়াছিল। পূর্ব্বের লিখিত আবেদন-পত্রখানি আমার হাতেই ছিল,—প্রমথবাবু তাহা দেখিয়া বলিলেন—"যান্, যান্, শ্বশুরমহাশয়ের কাছে যান, তিনি রেজিষ্ট্রারের ঘরে আছেন। ইহার পরে সিণ্ডিকেট বসিবে, তার পরে তাঁহাকে পাইবেন না।" আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া রেজিষ্ট্রারের ঘরে উঁকি মারিতে লাগিলাম। আশুবাবু আমাকে দেখিতে পাইলেন। অন্য সময় হইলে আশুবাবু আমার উপস্থিতির উপর কোন মনোযোগই দিতেন না। কিন্তু তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তিনি আমার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি আমাকে তাঁহার কাছে যাইবার জন্য হাতছানি দিলেন এবং ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলুন তো কি হইয়াছে? আপনার মুখে যেন কেউ কালি ঢালিয়া গিয়াছে।" আমি অল্প কথায় তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝাইলাম,—কেরাণীদের কাছে নরেনবাবু আমাকে অপমান করিয়াছেন, বলিলাম। তিনি বিরক্ত হইলেন, সমস্ত মুখ যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি কেবল একটিমাত্র কথা বলিয়া আমার আবেদনখানি রাখিয়া দিলেন, সে কথাটি এই—"যান্, যা' করবার আমি করিতেছি।"

ইহার খানিকপরে আমি য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ রেজিষ্ট্রারের ঘরে বসিয়া আছি। ইহার মধ্যেই একটি চাপরাশি আসিয়া বলিল—"আপনার বাড়ীর সমস্ত

কাগজ এখনই লইয়া আসিবার হুকুম হইয়াছে, এখন কার কাছে যাইয়া চাহিব ?"

আমি বলিলাম—"কাল সকালে যাইও।"

চাপরাসী বলিল—"আজ এখনই আনিবার হুকুম।" আমি পরের দিন কাগজ আনাইবার ব্যবস্থা করিলাম।

এই ঘটনাটি ১৯২৪ সনের মে, শনিবার—তাঁহার মৃত্যুর ৮ দিন পূর্ব্বে—হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান বিচারশালার বিচারপতি,—তাঁহার নিকট কোন অবিচার হইতে পারিত না,—কেহই তাহার যথাযোগ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত হইত না। সেইবার পাটনা হইতে শেষবার জীবিতাবস্থায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন,—তাঁহার সেই বিচারক-বেশের স্মৃতি আমার মনে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন,—সেই বিচারক ও তাঁহার বিচার এজীবনে ভুলিব না। সেইবারই কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার কিছু পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন—"দীনেশবাবু, আপনাকে ম্লান ও শীর্ণ দেখাইতেছে, সাবধানে থাকিবেন, আমাদের কাছে আপনার জীবনের একটা মূল্য আছে জানিবেন।"

'কাগজ এখনই আনিবার হুকুম'

এই অকিঞ্চিৎকর দুর্ভাগ্য জীবনের মূল্য! যাঁহার মূল্যে আমরা বিকাইতাম, যাঁহার জীবন এদেশের কাছে কোহিনুর-কৌস্তুভ সম মূল্যবান্ ছিল, সেই জীবন অপহরণ করিয়া কাল এই বাঙ্গলাদেশ, তথা ভারতবর্ষকে মহামূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, সেস্থান কে পূর্ণ করিবে ?

কলিকাতা ছাড়িয়া কোন স্থানে যাইতে তাঁহার বড় একটা প্রবৃত্তি হইত না। যে সকল কারণে একাধিকবার সুযোগ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিলাত যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি প্রধান এই যে, তিনি বঙ্গদেশ ছাড়িয়া অন্যত্র গেলে সোয়াস্তি বোধ করিতেন না। আমরা শুনিয়াছিলাম অতঃপর তিনি পশ্চিম অঞ্চলেই প্র্যাক্‌টিস্ করিবেন। সে দেশ বড় বড় ধনীর দেশ এবং সেখানে একবার যদি তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন, তবে অজস্র উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। এই হাইকোর্টে তিনি বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন, সুতরাং এখানে বেঞ্চ ছাড়িয়া বারে আসিতে তাঁহার একটু বাধ' বাধ'

কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র থাকা পছন্দ করিতেন না

ঠেকিবার কথা, এজন্য কার্য্যক্ষেত্র-হিসাবে সেই দেশেই সব রকমে তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইত, বোধহয় তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যেও কাহারও কাহারও এই ভাব ছিল। আমরা কিন্তু তাঁহার কলিকাতা ও এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়,—যাহা তৎকালে তাঁহারই বাহু আশ্রয় করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল,—তাঁহার এই প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া যাইবার জনশ্রুতিতে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি সেই শেষবার কলিকাতায় আসার সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আপনি কি সত্যই এদেশ ছাড়িয়া বিদেশে থাকা মনস্থ করিয়াছেন?" তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"আপনারা পাগল হইয়াছেন! কোন রাজরাজড়ার ষ্টেটের কর্ণধার হওয়ার লোভে কিংবা আর্থিক উপার্জ্জনের সম্ভাবনায় আমি কলিকাতা ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এই বিশ্ববিদ্যালয় ও মহানগরীর আওতায়ই জীবন কাটাইব।"

হয়ত তাঁহার প্রাণের মধ্যে বিদেশ-গমন-সম্বন্ধে একটা আতঙ্কের ভাব চিরকালই ছিল। বিদেশে যাইয়া যে তাঁহার এই ভয়ঙ্কর পরিণাম হইবে, যেন কাল পূর্ব্বেই তাঁহার মনে সেই ঘোর অমঙ্গলের ছায়াপাত করিয়াছিল। তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইয়া সুখ বোধ করিতেন না। এখন মনে হয়, হায় পাটনা! এই দেশের মাণিককে কয়েকটি টাকায় আকর্ষণ দিয়া লইয়া গিয়া বাঙ্গালী-জাতির কি ঘোর সর্ব্বনাশই না করিয়াছ! জাতীয় গৌরব-স্তম্ভের শীর্ষদেশ কি নিদারুণ বজ্রপাতেই না ভাঙিয়াছে!

অমঙ্গলের ছায়া

তাঁহার জামাতা ও পুত্র তাঁহার কোর্টে ওকালতি করিতেন,—এজন্য কত লোকে কত কথা বলিত! তিনি ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাঁহার আদৌ ছোঁয়াচে রোগ ছিল না। যেখানে আইনতঃ কোন বাধা নাই, সর্ব্বোচ্চ কোর্টে কাজ করিবার সনন্দধারীকে তিনি কি অপরাধে তাঁহার বিচারশালায় মোকর্দ্দমা গ্রহণ হইতে বঞ্চিত করিবেন? সেইরূপ করিলে তাঁহার পক্ষে অন্যায় হইত, নিজের বিচার-শক্তির উপর সন্দেহ জন্মিত এবং অসঙ্গত সাবধানতা-প্রসূত ভীরুতা চরিত্রে প্রকাশ পাইত। আমার নিজের একটা মোকর্দ্দমা তাঁহার আদালতে ছিল,—আমার পরাজয় হইল।

মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে হয় নাই যে, আশুবাবু আমার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও পক্ষপাত করিবেন।

তাঁহার চিন্তার স্বাধীনতা তাঁহার পুত্রদের মধ্যে এতটা সংক্রমিত হইয়াছিল যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদ সিনেটসভায় তাঁহার মুখোমুখী হইয়া কথার কাটাকাটি ও প্রতিবাদ করিতেন। এরূপ বিনয় ও সৌজন্য-ভূষিত প্রিয় পুত্রের সৎসাহস ও মতের স্বাধীনতা তিনি শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন।

পুত্রের স্বাধীন মত

লালগোলার মহারাজার নিকট হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবিভাগের জন্য একলক্ষ টাকা দান চাহিতে তিনিই আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। একবার আমি তাঁহার সঙ্গে লালগোলায় গিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে ছিলাম আমি, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেনের ভ্রাতা য়্যাড্‌ভোকেট্ হেমেন্দ্রনাথ সেন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

আমি, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং হেমেন্দ্রনাথ সেন সেই দান প্রার্থনা করিলাম। মহারাজা অনেক কথাবার্ত্তার পর কতকটা রাজি হইলেন। কিন্তু যখন আশুবাবু সব কথা শুনিলেন, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"কে আপনাদিগকে এইখানে দান চাহিতে বলিয়াছে? সুবিধা মত তাঁহার নিকট দান প্রার্থী হওরার কথা আমি অবশ্যই বলিয়াছিলাম। কিন্তু আজ আমি ইঁহার অতিথি,—বিচারালয়ে ইঁহার ষ্টেটের মামলা-মোকর্দ্দমা নিত্যই হইয়া থাকে। এখানে আসিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে দানের জন্য পীড়াপীড়ি করিবে, এটা যে কত বড় অন্যায়, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না, বিচারপতি হিসাবে আমার গৌরব যে কতটা ক্ষুণ্ণ করিলেন, তাহা আপনারা বুঝেন নাই।" তিনি আমাদিগকে সেই দানের আবেদন প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করিলেন এবং তাঁহার বিরক্তির কথা শুনিয়া মহারাজাও বিশেষরূপ লজ্জিত হইলেন।

লালগোলার মহারাজার নিকট দান-প্রার্থনা

আর একটা দোষ, যাহা পদস্থ ও অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায়, তাহা আশুবাবুর মধ্যে একেবারেই ছিল না। প্রকৃতি তাঁহাকে বিচারকের যোগ্য চরিত্র-সাম্য, একদেশ-দর্শিতা এবং পক্ষপাত শূন্য মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দুই পক্ষের কথা না শুনিয়া বিচার করিতেন না,

কান-কথা একেবারেই শুনিতেন না। দুই একজন দেশমান্য লোক আমার জানা আছে, তাঁহাদের চরিত্র ধর্ম্মজ্ঞান, সরলতা প্রভৃতি গুণ-মণ্ডিত, কিন্তু তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় পরের কথা শুনিয়া লোকের প্রতি বিচার করেন। কে পশ্চাৎ হইতে কি বলিল, অভিযুক্ত ব্যক্তির তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, অথচ তাঁহার প্রতি সেই উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির মনোভাব ঋতু-ভেদে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই দেখা যাইতেছে আকাশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, নির্ম্মল ও রৌদ্রোজ্জ্বল, পরক্ষণেই কে যেন তাহাতে কতকগুলি কালি ঢালিয়া দিয়াছে। তিনি মুখভার করিয়া বসিয়া আছেন, তাহাতে বিরক্তির ভাব অতি মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেই দুর্ভাগ্য বুঝিতে পারিল না, কি দোষে তাঁহার আশ্রয় দাতা অথবা চির-সুহৃদের মন এমন বিরূপ হইয়াছে।

পরের কথায় বিচলিত হইতেন না।

যাঁহারা স্তাবকগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, তাঁহারা আত্মপ্রশংসা শুনিয়া যেরূপ পরিতৃপ্ত হ'ন, তেমনি তাঁহাদের মুখে অপরের সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ও অনেক সময় নিতান্ত অলীক কথা শুনিয়া সেইরূপ উত্তেজিত হ'ন। সেই মণ্ডলীর লোকেরা তাঁহার প্রকৃতি কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝিয়া লয় এবং সময় ও সুবিধা অনুসারে বিষ ছড়াইতে থাকে,—তাহারা জানে যে, সে বিষের ক্রিয়া অব্যর্থ হইবে। এইরূপ বড় লোকের অব্যবস্থিত ভাব অতি ভয়ঙ্কর, তাঁহাদের প্রসন্নতার উপর কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না। "ক্ষণে রুষ্টঃ ক্ষণে তুষ্টঃ রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদঽপি ভয়ঙ্করঃ॥" এইরূপ ব্যক্তি যাঁহাদের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করেন, কর্ণভেদী অব্যর্থ বাণক্ষেপীরা তাঁহার নিন্দা যেখানে সেখানে গাইতে প্রশ্রয় পায়। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে চরিত্র হিসাবে আশুবাবুর সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান দেওয়া যায় না।

আশুবাবুর সেরূপ দোষ একেবারেই ছিল না, তাঁহার মন দৃঢ়তার বর্ম্মে আচ্ছাদিত ছিল, কর্ণভেদী বাণ সেখানে ব্যর্থ হইয়া যাইত। আমার নিজের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবহারে আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। শনৈশ্চরের কৃপায় কোন কালেই আমার শত্রুর অভাব ছিল না। তাহারা একবার বলিল, আমি মদ খাইয়া মাথার পীড়া সৃষ্টি করিয়াছিলাম। কেহ বলিতেন,—আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়া দিয়াছেন ও

ইংরাজী ইতিহাসখানি ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়া আমার নামে চালাইতে অনুমতি করিয়াছেন, কেহ বলিত—"দীনেশবাবু লেখেন অনেক, কিন্তু তাঁহার লেখা বিজ্ঞান-সঙ্গত নহে, সে গুলি সব ভুয়ো।" যাঁহাদের সংস্কৃতের জ্ঞান নাম মাত্র, তাঁহারাও আমার লেখার মধ্যে ভূরি ভূরি ব্যাকরণের ভুল আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন,—আমি তাঁহার কৃত শত উপকার পাইয়াও তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকি—ইত্যাদি কত কথাই যে তাঁহাকে শুনাইতে যাইতেন, তাহার অবধি ছিল না; পাষাণের উপর জলের রেখার ন্যায় ঐ সকল কথা তাঁহার মনের উপর কোন দাগ রাখিয়া যাইত না। যখন পরীক্ষক-নিয়োগের সময় আসিত, কিংবা পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণের দিন ঘনাইত, বৎসরের এই দুইটি সময়ে, কোন কোন সংবাদ-পত্রে আমার ব্যাকরণ ও ভাষার দোষ খুঁটিনাটি করিয়া আবিষ্কার করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত এবং পত্রিকার সেই অংশের পার্শ্বে লালকালির খুব মোটা রেখা টানিয়া তাঁহাকে পাঠান হইত; তাঁহাদের এই প্রতিকূলতা তো বৎসর ভরিয়াই চলিত, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইত পূর্ব্বোক্ত দুইটি সময়ে, যেন আমি পরীক্ষক না হইতে পারি কিংবা আমার বই পাঠ্য না হয়। আশুবাবু সেই সকল কাগজের এক ছত্র পড়িয়াই সমস্তটার অর্থ বুঝিতেন এবং টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া আবর্জ্জনার ঝুড়িতে ফেলিয়া দিতেন। তিনি পরের হাতে খাইতেন না,—তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মানব-চরিত্রের জ্ঞান তাঁহাকে সাধারণ লোক হইতে অনেক উচ্চে রাখিয়াছিল। তিনি যাহার যে মূল্য, তাহা বুঝিতেন এবং পরের নিক্তির ওজন গ্রাহ্য করিতেন না; বিশেষতঃ কি উদ্দেশ্যে যে কি লেখা হইতেছে, তাহার গভীর মর্ম্ম বুঝিতে তাঁহার তিল মাত্র বিলম্ব হইত না। শত্রুতা-মূলক কথা কানে শুনিয়া তখনই অগ্রাহ্য করিতেন এবং কর্ণভেদী শর সন্ধানীরা তাঁহার নিকট কোন প্রশ্রয়ই পাইত না। আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, আশুবাবু কোন অবিচার করিবেন না। ভগবান যাঁহাকে বিচারপতির সমস্ত গুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কোন অবিচার করিবেন না,—ইহাই তাঁহার গুণ মুগ্ধ শত লোকের স্থির ধারণা ছিল।

আমার একখানি বৃহৎ পুস্তকের বহু দোষ খুঁজিয়া বাহির করিয়া এবং আমার প্রতি তাঁহার অন্যায় পক্ষপাতিত্বের বহু নিন্দা করিয়া কোন ব্যক্তি

তাঁহাকে সুদীর্ঘ, বার পৃষ্ঠা-ব্যাপক একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তখন আশুবাবু সবে মাত্র হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতির পদ পাইয়াছেন। আশুবাবু আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং ঐ চিঠিখানি পড়িতে বলিলেন। আমি সমস্তটা পড়িলে পর তিনি বলিলেন,—"এখন কি করিব, বলুন।" আমি বলিলাম—"আপনি এখন প্রধান বিচারপতি, আপনি অন্যায় দেখিলে আমাকে যে আদেশ করিবেন, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে আমি বাধ্য।" উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম আশুতোষ সে পত্র-লেখকের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সেই পত্রে এমন কতকগুলি কথা ছিল, যাহা স্পষ্টতঃ ঘোর মিথ্যা এবং তিনি তাহা জানিতেন। তিনি আমার সমক্ষে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

একজন তৃতীয় ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, কোন মস্ত বড় পণ্ডিত আমার বই বিজ্ঞান-সঙ্গত নহে এবং তাহাতে অনেক ভুল আছে বলিতেছিলেন। আশুবাবু ভৃত্যের দ্বারা আমার সমস্ত বই আনিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং বলিলেন—"এত বড় অমানুষী খাটুনী যে খাটিয়াছে, তাহার ভুল হইবে না, ভুল হইবে কি নিষ্কর্ম্মার ? কাজ করিতে গেলেই ভুল হয়। আর বিজ্ঞান-সঙ্গত হয় নাই যে বলিলেন, এ কথাটা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আমরা জানি, বিলাতেই তো বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লেখার আদর হয়। সেখানে মহা মহা বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিতগণ দীনেশবাবুর বই গুলির এত অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন যে, এ সকল কথা আপনার মত লোকের মুখে শোভা পায় না। অসমর্থ ও অযোগ্য ব্যক্তিদের ঈর্ষামূলক কথার উপর জোর দেওয়া আপনার মত লোকের উচিত নহে।"

এই যে আমার বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, আশুবাবু আমার কাছে প্রায়ই তাহা বলিতেন না। তিনি যেমন পরের কথায় কান দিতেন না, তেমনই অপরেরা অসাক্ষাতে যাহা বলিয়াছে, তাহাও অন্যের কাছে বলিতেন না। সেই বিরাট্ পুরুষ এই সকল ক্ষুদ্র কথাবার্ত্তাকে অতি তুচ্ছ মনে করিতেন। যদি তাঁহার ঈষৎ প্রশ্রয় পাইত, তবে ষড়যন্ত্রীরা যে কিরূপ ঘোট পাকাইত, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। শুধু দুই একদিন আমাকে বলিতেন, "আপনার বন্ধুরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেক কথা বলিয়া গেলেন।" কিন্তু কি

কথা বলিয়া গেলেন, তাহা জানিতে উৎসুক হইয়া আমি যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছি, তখন তাঁহার গিরিশৃঙ্গের মত অটুট মৌন ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বুঝিয়াছি, উহার বেশী তিনি আর কিছু বলিবেন না।

দুই-এক দিন তাঁহার আড়ালে কে কি বলিয়াছে, তাহা বলিতে উদ্যত হইয়া আমি কেবল বদন ব্যাদান করিয়াছি, তাহা আভাষে বুঝা মাত্র "ওসব কথা থাক্", এই কথা কয়েকটি এমন বজ্র-কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, আমার মুখের হা-টাই মুখে থাকিয়া যাইত, আর কিছু বলা সাহসে কুলাইত না।

কিন্তু নিজে যখন দোষ স্বচক্ষে দেখিতেন, তখন রেহাই ছিল না,—তখন তিনি উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাকে দিয়া যাহা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের পর করাইতেন, তাহার নিন্দা হইলে, তাহা যেন নিজের গায়ে লাগিত, এরূপ মনে করিতেন। সেই দোষানুসন্ধিৎসুদের তাঁহার নিকট ক্ষমা ছিল না। যাহা তিনি অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছেন, কখনই তাহার প্রশ্রয় দেন নাই। বাইবেলে লিখিত আছে—ভগবান্ নিজের আকার দিয়া মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আশুবাবুর প্রকৃতিও সেইরূপ ভগবানের নিজের হাতে গড়া,—তাহাতে তাঁহার সংহার ও পালন-শক্তির একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হইত।

যাহার প্রতি ন্যায্য কারণে তিনি এই ভাবে ক্রুদ্ধ হইতেন, তাহাকে তিনি ক্ষমার সীমা হইতে বাহির করিয়া দিতেন না,—সে ব্যক্তি বাস্তবিক অনুতপ্ত হইলে আবার তাহার প্রতি সদয় হইতেন। আশুবাবুর নাম সার্থক ছিল,—তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট হইতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষতঃ শিক্ষা-বিভাগ, সর্ব্বদাই অর্থ-কৃচ্ছ্রের দরুণ বিপন্ন অবস্থায় ছিল। যাঁহাকে যতটা পুরস্কার দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহার হইত, অনেক সময় তাহা তিনি দিতে পারিতেন না। রামতনু লাহিড়ী-ফেলোশিপের কার্য্যে প্রথমতঃ আমাকে ২৫০৲ টাকায় নিযুক্ত করেন; কিন্তু আমার কাছে বলিয়াছিলেন যে, আমাকে ৫০০৲ টাকায় নিযুক্ত করার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, কিন্তু তিনি পারিয়া উঠিলেন না।

তিনি যাঁহাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া সামর্থ্যে কুলাইত না। কিন্তু কাজ-সমাধার পর যে দুই-একটা কথা বলিতেন, তাহাতে কর্ম্মীর মনে মত্ত হস্তীর বল আসিত। পুস্তক-লেখকদের

প্রতি তাঁহার প্রসন্নতা সর্ব্বজন-বিদিত। ইতিহাসে জানা যায়, যুদ্ধজয়ী সেনা-পতিকে প্রাচীন রাজারা নিজ হস্তে তাম্বুল দিতেন; নবদ্বীপের টোলের বিজয়ী পণ্ডিতদিগকে কৃষ্ণনগরের রাজারা সামান্য পুরস্কার দিতেন, কিন্তু সেই সকল সামান্য প্রসাদ যে তৃপ্তি ও আনন্দ দিত, তাহা গ্রহীতারা চরম পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেন। কোন বই লিখিয়া ছাপা হওয়ার পর গ্রন্থকারেরা তাঁহার নিকট যাইয়া যে উৎসাহ পাইতেন, তাহা তাঁহাদের কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। সুধী-সমাজে পুস্তকের প্রশংসা হইলে, তাহা আশুবাবুকে দেখাইতে পারার সৌভাগ্যের জন্য তাঁহারা লালায়িত হইতেন;—সৌভাগ্যই বটে,—সেই দুই বিরাট্ গুম্ফের মধ্য হইতে প্রাণোজ্জ্বল, শুভ্র হাসির ছটা,—তাহা দেখিলে মনে হইত সমস্ত পরিশ্রম সার্থক। কত বড় লোককে দেখিলাম,—বই উপহার দিতে যাইয়া গ্রন্থকার তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন,—"বই রাখিয়া যান, পড়িয়া দেখিব।" তাঁহাদের অটুট গাম্ভীর্য্যের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গ্রন্থকার বেশী বাক্য ব্যয় করিতে সাহসী হ'ন না। কিন্তু আশুবাবু বই হাতে করিয়া স্বীয় বাগানের বহু ঈপ্সিত কলমের চারায় উৎপন্ন প্রথম ফলটি হাতে পাইলে উদ্যান-স্বামী যেরূপ প্রফুল্ল হ'ন, সেইভাবে তিনি গ্রন্থখানিকে অভিনন্দিত করিয়া লইতেন। সেই অভিনন্দন লেখকের মনে যে প্রেরণা দিত, তাহা অবর্ণনীয়। বঙ্গদেশীয় সমস্ত লেখক তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ১৯০৪ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সময় ছোট-বড় ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা এত পুস্তক গ্রন্থকারেরা তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, অন্য কোন বাঙ্গালী বড়-লোকের ভাগ্যে তাহার ১/১০ অংশও লাভ হয় নাই।

আমাকে যখন 'বঙ্গভাষা ও ইতিহাস' লিখিবার ভার দিয়া 'রিডার' নিযুক্ত করিলেন, সেদিন আমি বলিয়াছিলাম—"আমি বহুদিন ইংরাজী লিখি নাই, ইংরাজী লিখিতে পারিব তো?" তিনি হাসি-মুখে বলিলেন,—"পারিবেন।" সেই প্রসন্ন মুখের হাসি এখনও ভুলিতে পারি নাই। আমার লেখা একটি ইংরাজী লাইন তিনি দেখেন নাই, আমি স্বয়ং দ্বিধাপন্ন, অথচ তিনি বলিলেন—"পারিবেন।" তিনি কি আমার শক্তি আমা অপেক্ষা বেশী বুঝিয়াছিলেন? অন্য কেহ হইলে বলিতেন—"চেষ্টা করিয়া দেখুন, পারেন

কি না।” কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য, সম্পূর্ণ বিশ্বাস-সহকারে তিনি বলিলেন—“পারিবেন।” এই একটি ব্যক্য মন্ত্র-শক্তির কাজ করিল,—আমার সমস্ত শক্তির উদ্বোধন করিয়া আমাকে কর্ম্মে নিরত করিল। আমি ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিলাম—“প্রভু, আমি যেন এই বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারি।”

এইরূপ প্রেরণাই প্রকৃত শক্তি-সঞ্চারিণী,—বৃহৎ আর্থিক পুরস্কার ও খেলাৎ অপেক্ষাও এই প্রেরণার শক্তি বেশী। যে কাজ করে, সে জানে আশুবাবুর নিঃস্ব হস্তের এই দানের মূল্য কত! বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার সময়ে যে সমস্ত মহৎকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা টাকা-কড়িতে হয় নাই, উচ্চ পদ-প্রাপ্তির লোভে হয় নাই,—সেই বিরাট্ কার্য্য আশুবাবুর স্বল্পাক্ষরা কথার প্রেরণায় হইয়াছে;—যেমন অগ্নির সম্মুখবর্ত্তী হইলে বুঝা যায়, তাহার একটি স্ফুলিঙ্গও তুচ্ছ নহে,—এই মহাকর্ম্মীর সংস্পর্শে আসিলে তেমনই বুঝা যাইত যে, তাঁহার মুখের একটি কথা এক তোড়া মোহর অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী।

আশুতোষের ন্যায় গম্ভীর-প্রকৃতি, অটল হিমাদ্রিসম ব্যক্তি যে পরিহাস করিতে পারিতেন, এবং বাল-সুলভ তরলতার সহিত আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতে পারিতেন, তাহা হয়ত অনেকেই মনে করিতে পারিবেন না। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার প্রকৃতি মানুষের সহজ আনন্দ উপভোগের সীমার বাহিরে ছিল না। শ্যামাপ্রসাদ একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। অতি জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র-পরিহিত একটি যুবক একদিন আশুতোষের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া তাঁহাকেই বলিল,—“মহাশয়, আশুবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করিতে পারি?” আশুবাবু বলিলেন,—“অবশ্যই পারেন। আপনি কি চান?” যুবক বলিল,—“তাহা আপনার কাছে বলিতে চাই না। আপনি তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা করার একটা সুযোগ ঘটাইয়া দিন।” আশুবাবু নগ্নদেহে এবং চটি-পায়ে ছিলেন,—সুতরাং যুবকটি তাঁহাকে সেই দেশ-বিখ্যাত, কীর্ত্তিমান্ পুরুষ বলিয়া মনেই করিতে পারে নাই। আশুতোষ বলিলেন,—“আপনি এইখানে বসুন, আমি আপনার সঙ্গে তাঁহার একটা দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ করাইয়া দিতে পারি কি না, দেখি।” আশুবাবু

পরিহাস-রসিকতা

তাঁহার বসিবার ঘরটায় যাইয়া তদীয় বিশাল কেদারায় বসিয়া যুবকটিকে ডাকাইলেন। সে বেচারী তাঁহাকে আশুতোষ বলিয়া চিনিতে পারিয়া ভয়ে ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া গেল। আশুতোষ তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া আশ্বাস দিলেন এবং একখানি 'প্লেটে' মিষ্টান্ন আনাইয়া তাহাকে উদরপূর্ত্তি করিয়া খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন।

হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক তাঁহার এক আত্মীয় সর্ব্বদা ৭৭ নং বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। ইনি একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন; ২০ বৎসর ইনি স্নান করেন নাই। হাওয়াকে তিনি যমের মত ভয় করিতেন। অনেক সময় পাছে এই দুরন্ত, চঞ্চল হাওয়া কোন রন্ধ্র-পথে তাঁহার দেহে প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় তিনি কর্ণমূলে তুলা গুঁজিয়া আত্মরক্ষা করিতেন। আকাশে একটু বাদলার ভাব দেখিলে তিনি ভীত হইতেন। এবম্বিধ হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন ডিসেম্বরের কনকনে হাওয়ার মধ্যে মধুপুরে 'গঙ্গাপ্রসাদ-গৃহে' আশুতোষের পার্শ্বে বসিয়া আছেন; তাঁহার কাণে যথা-রীতি তুলা গোঁজা, এবং সেই ঠাণ্ডা বাতাস পাছে তাঁহাকে ছুঁইয়া ফেলে, এই আতঙ্কে তিনি নিজের দেহটি খুব পুরু জামায় আচ্ছাদিত রাখিয়াছেন। আশুতোষ তাঁহার দিকে তাকাইলেন না,—যেন অন্যমনস্কভাবে একটি চাকরকে বলিলেন,—"শীঘ্র এক বাল্‌তি ঠাণ্ডা জল লইয়া আয়।" আদেশ প্রতিপালিত হইলে তাঁহার ইসারায় ভৃত্যটি সেই বড় বাল্‌তিটির সমস্ত ঠাণ্ডা জল হীরালালবাবুর মাথায় ঢালিয়া দিল। তখন যে হৈ-চৈ, চীৎকার আরম্ভ হইল, এবং হীরালাল বাবু ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যেরূপ দেহভঙ্গী করিতে লাগিলেন, তাহা অদূরে উপবিষ্ট আশুতোষ বেশ প্রশান্তভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন।

আমাদের ল-কলেজের ভাইস্‌প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন মজুমদারকেও একদা এইরূপ একটা কৌতুকের পাত্র হইতে হইয়াছিল। সেদিন শ্যামাপ্রসাদের গায়ে-হলুদ। স্নেহময় পিতা খুব খোস-মেজাজে ছিলেন। বিরাজবাবু যেমনই গৃহে ঢুকিয়াছেন, অমনই পিছন হইতে আশুতোষ এক বাল্‌তি হলুদ-জল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিলেন। অনেক টাকা খরচ করিলে যে আমোদ-প্রমোদ না হইত, বিরাজবাবুর উপর হলুদ-জল-বর্ষণে গৃহের সকলে সেই আনন্দ বিনা খরচায় উপভোগ করিলেন; অবশ্য

বিরাজবাবু সেই দিনের মিলিতকণ্ঠের উচ্চ হাসিতে যোগ দিতে পারিয়াছিলেন কি-না, তাহার কোন ইতিহাস আমরা পাই নাই।

আশুতোষের সেই প্রাণ-খোলা হাসি মনে পড়ে, তাহা অধরের প্রান্তে শুভ্র চন্দ্রিকার মত মিলাইয়া যাইত না, তাহা মামুলী ভদ্রতার সৌজন্যে মনের ভাব প্রচ্ছন্ন করিবার উপায় ছিল না; যাহাকে কাষ্ঠ-হাসি বলে, এ হাসি মোটেই সে হাসি নহে। ইহা ছিল অট্টহাসি, তাহা সমস্ত হৃদয়ের আনন্দের ভাণ্ডার খুলিয়া দেখাইত। ইহা ছিল প্রসন্নতার স্বরূপ, কুটিল প্রকৃতির জটিল-চিত্ত লোক এরূপ হাসি হাসিতে পারে না। যেরূপ দিবালোকে সমস্ত দিক্ প্রকাশিত হইয়া উঠে, আশুতোষের উচ্চ হাস্যে সেইরূপ তাঁহার সমস্ত অন্তরের ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িত। সমুদ্র-তরঙ্গের সংঘাত-জনিত উচ্চ রোলকে কবি এস্কাইলাস্ এইরূপ হাসির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—"The eternal laughter of waves"। এই হাস্য আমরা আর একজন খ্যাত-নামা, ঋষিকল্প লোকের মধ্যে পাইতাম, ইহা শুধু দন্ত-রুচি-বিকাশ নহে, ইহা অধরৌষ্ঠের সঙ্কোচন-প্রসারণ-সম্ভূত, শব্দহীন, শুষ্ক হাসি নহে—ইহা মুক্তপ্রাণ, সহৃদয় ব্যক্তির বীরের মত কণ্ঠ-ধ্বনি। পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইরূপ হাসি হাসিতেন।

প্রাণ-খোলা উচ্চ হাসি এবং প্রসন্নতা-জ্ঞাপক নয়ন-ভঙ্গী

আশুতোষের দু'টি চোখের তারা সময়ে সময়ে ইসারার দ্বারা হৃদয়ের প্রসন্নতা জানাইত। কোন কথা না বলিলেও সেই চোখের ইঙ্গিতে যে সহানুভূতি, সম্মতি বা উৎসাহ বুঝাইত, ভাষা তাহার উপর আর কিছু বুঝাইতে পারে না। শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার পিতার এই অপূর্ব্ব কৌতুক, আনন্দ ও সহানুভূতি-জ্ঞাপক নয়ন-ভঙ্গীর উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার কন্যা কমলা দেবী বিধবা হইলে তিনি তাঁহাকে দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়াছিলেন। আশুবাবু সমাজসংস্কারক ছিলেন না, তিনি বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ চালাইতে চেষ্টা করেন নাই, বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধে কোন দিন কোন বক্তৃতা করেন নাই, কোন কিছু লেখেন নাই। তিনি দেশ হইতে পণ-প্রথা উঠাইয়া দিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান বা কৌলিন্য প্রথা-নিবারণ—ইত্যাদি সামাজিক কোন সমস্যা লইয়া ব্যস্ত হ'ন নাই।

কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহ.

উগ্র সমাজ-সংস্কারকদের মত কোন কাজ করেন নাই, বরং তিনি প্রাচীনপন্থীদের মতই কাজ করিতেন। জাতি-ভেদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা তো দূরের কথা, তিনি স্বীয় ব্রাহ্মণত্বের গৌরব করিতেন। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন,—"তিনি ব্রাহ্মণের বেশে আপনাকে পরিচয় দেওয়া শ্লাঘার কথা মনে করিতেন।"—(বঙ্গবাণী) স্বীয় গৃহে বিধবা-বিবাহ-উপলক্ষে তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ সুসম্পন্ন করিতেন এবং পূজার মন্দিরে বসিয়া পট্টবস্ত্র-পরিধানপূর্ব্বক চণ্ডীপাঠ করিতেন। বাড়ীতে নগ্ন-গায়ে ও চটি-পায়ে থাকিতেন। একদিন একজন হ্যাট-কোট-পরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি দস্তুরমত সাহেবী কায়দায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। নিতান্ত অনাড়ম্বর-বেশী আশুতোষকে নগ্ন-গায়ে দ্বিতলের বারান্দাটায় ঘুরিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বাড়ীর কোন নগণ্য লোক মনে করিয়া তাঁহার হাতে কার্ডখানি দিয়া বলিলেন—"জজ্ সাহেবকে কার্ডখানি পাঠাইয়া দিন।" আশুবাবু কার্ডে জজ্ সাহেবের নাম দেখিয়া প্রথম সাক্ষাতের পরিচয়োচিত সৌজন্যের সহিত কর-মর্দ্দনের জন্য দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

সাহেবী পোষাক

তিনি যতই হাত বাড়াইতে লাগিলেন, ততই সেই গর্ব্বিত ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পশ্চাৎ হটিয়া যাইতে লাগিলেন। আশুবাবু বলিলেন—"ভয় পাইতেছেন কেন? আমিই আশু মুখার্জ্জি।" তখন সেই ব্যক্তি কোন গ্রীকৃদেবতার (জোভ) নাম উচ্চারণ করিয়া ইংরাজীতে বলিলেন—"এ কি সম্ভব যে, আপনার মত লোক ধুতি পরিয়া এরূপ বেশে থাকেন?"

আশুবাবু বলিলেন—"সে কৈফিয়ৎ আপনাকেই দিতে হইবে, আমাকে নহে! আমার চৌদ্দপুরুষ যে ভাবে থাকিতেন, আমি তাহাই করিতেছি। আপনার পূর্ব্বপুরুষদের কেহ কি গলায় নেক্‌টাই বাঁধিয়াছেন, মাথায় হ্যাট্ পরিয়াছেন এবং এরূপ প্যাণ্ট্-কোট শরীরে ধারণ করিয়াছেন?"

সেই সাহেববেশী, পদস্থ ব্যক্তি ইহার উত্তর দিতে পারিলেন না। এই ঘটনার কথা আমি আশুবাবুর নিজের মুখ হইতে শুনিয়াছি। বস্তুতঃ দেশীয় পোষাকের গৌরব তিনি শিক্ষিত-সমাজে বাড়াইয়াছিলেন। সিনেটের সদস্যগণের

মধ্যে অনেকেই তাঁহার দেখাদেখি এই রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐরূপ উচ্চ প্রতিষ্ঠানে ধুতি, জামা ও চাদর পরিয়া যাওয়ার রীতি আশুবাবুর পূর্ব্বে একেবারে অবিদিত ছিল। অধ্যাপকেরা গ্রীষ্মকালে সার্জ্জের কোট্ পরিয়া ও আঁটা-সাঁটা পোষাক-পরিহিত হইয়া ক্রমাগত ঘামিতেন, তবু বাঙ্গলার আবহাওয়ার যোগ্য মসৃণ মস্‌লিনের জামা ও সুবিধাজনক, আরামপ্রদ ধুতি পরিতেন না। আশুবাবু এই বিকৃত রুচি একেবারে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। হাইকোর্টে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিচারক-জনোচিত পোষাক পরিতে হইত; কিন্তু সেই হাই-কোর্টে ও অবসরের ঘণ্টায় বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে অনাড়ম্বরে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া চলা-ফেরা করিতেন। এইরূপ চটিপায়ে, একরূপ অর্দ্ধনগ্ন বেশে তিনি যখন প্রাতর্ভ্রমণের সময় গড়ের মাঠে পায়চারি করিতেন, তখন কখন কখনও লাটসাহেব বা অপর কোন বড় রাজপুরুষ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, নিকটে বড়, বড় স্বর্ণ-খচিত পোষাক-পরিহিত সান্ত্রীরা উপস্থিত থাকিত,—এদৃশ্য দেখিবার মতো বটে, জ্ঞানের দুয়ারে জড়শক্তিকৃত সম্মান দান এই সকল ব্যাপারে দেখা যাইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও এইরূপ দেশী পোষাকেই সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন,—কিন্তু তিনি ছিলেন খাঁটি টুলো পণ্ডিত,—তাঁহার পক্ষে ঐ-রূপ করার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না। কিন্তু আশুবাবু ছিলেন ব্রিটিশ অধিকারে ইংরাজী শিক্ষার পাণ্ডা,—একজন সর্ব্বাপেক্ষা গণ্যমান্য পদবী ও পদ বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহার পক্ষে ধুতি-চাদর গ্রহণ করা এবং উন্মুক্ত বক্ষে পৈতা দোলাইয়া সর্ব্বসমক্ষে দর্শন দেওয়া—সে সময়ের একটি সামান্য ঘটনা নহে। একথাও বলা চলে যে, তিনি যদি ঐরূপ রীতির পুরোভাগে থাকিয়া ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনঃ প্রচলন না করিতেন, তবে হয়ত জে, এম্, সেন, সুভাষ বসু, এমন কি চিত্তরঞ্জন দাশকেও আমরা মেয়র হইয়া ধুতিচাদর-পরিহিত দেখিতে পাইতাম না।

আশুবাবু 'বাবু' শব্দটির আভিধানিক মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি 'জজ্‌সাহেব' বা 'মিষ্টার' প্রভৃতি সকল উপাধি অপেক্ষা দেশীয় 'বাবু' শব্দটির প্রতি বেশী অনুরক্ত ছিলেন; এজন্য 'Sir Ashutosh' অপেক্ষা

'আশুবাবু' নামটি বেশী জনপ্রিয় হইয়াছিল। এবং তিনিও 'বাবু' নামে অভিহিত হইয়া আনন্দ বোধ করিতেন। অবশ্য আভিধানিক ব্যবহার-সম্বন্ধে গবেষণা করিলে জানা যায় যে, 'বাবু' শব্দটি 'বাবা' শব্দেরই রূপান্তর। পূর্ব্বে 'বাবু' শব্দ এদেশে প্রচলিত ছিল। এখনও ছেলেদের লোকে আদর করিয়া 'বাপু' বলিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে পিতা বুঝাইতে 'বাপু' শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এই 'বাপু' এবং তৎপরবর্ত্তী 'বাবু' শব্দ এক কালে গৌরবজনক ছিল। একশত বৎসর পূর্ব্বে এই 'বাবু' শব্দ আভিজাত্য বুঝাইত এবং যাহাকে তাহাকে 'বাবু' বলা হইত না। ইদানীং বাঙ্গালী-বিদ্বিষ্ট কতকগুলি সাহেব 'বাবু' শব্দটি ঘৃণার্হ করিয়া তুলিয়াছে; বাঙ্গালীরাও সেই কলঙ্ক স্বীকার করিয়া লইয়া 'বাবু' স্থলে আসাম-বাসীদের মত 'শ্রীযুত' কথাটি ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু বিদ্বিষ্ট বিদেশীদের দ্বারা লাঞ্ছিত উপাধিটি ত্যাগ করিয়া তাঁহারা শত্রুদের আরোপিত অর্থ মানিয়া লইয়া পরাজয় স্বীকার করিতেছেন মাত্র। আশুবাবু এই শব্দের অর্থ পুনরায় গৌরবাত্মক করিয়াছেন।

'বাবু' শব্দ গৌরবাত্মক

আশুবাবু প্রতীচ্য শিক্ষার অগ্রণী, সেই শিক্ষার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চিরকালই যে খাঁটি বাঙ্গালী, সেই খাঁটি বাঙ্গালীই রহিয়া গিয়াছিলেন,—আবহাওয়া-ভেদে তাঁহার রং একেবারেই বদলাইত না।

আমি যে কথা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহার সব কথা বলা হয় নাই। যিনি আদৌ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, তিনি কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিলেন কেন? তিনি দৃষ্টান্ত-স্থলীয় হইয়া সমাজ-সম্বন্ধে কোন বিশেষ মত প্রচার করিতে ইচ্ছুক হ'ন নাই, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তিনি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী কমলা দেবীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন; এবং এই লক্ষ্মীর বৈধব্য-বেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজেরা খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা খাইবেন, অথচ সেই অনুপমা, কোমলহৃদয়া বালিকা পার্থিব সমস্ত সুখে বঞ্চিতা হইয়া নির্জ্জলা একাদশী ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন, এই অবিচারের আঘাত আশুবাবু সহ্য করিতে পারিলেন না। ইহা বুঝাইতে যাইয়া বিদ্যাসাগরের মত তিনি শাস্ত্র ঘাঁটিয়া শ্লোক উদ্ধার করেন

জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলা দেবী

নাই, কারণ ইহার প্রেরণা তিনি শাস্ত্র হইতে পান নাই ; সেই মহানুভব ইহা পাইয়াছিলেন তাঁহার দয়ার্দ্র, স্নেহময়, সাগর-সদৃশ *বিশাল হৃদয়* হইতে। *বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবীর হৃদয় যেভাবে বিধবাদের কষ্টে* বিগলিত হইয়াছিল, আশুবাবুর মনেও একই কারণে তাহা সেইরূপ এক উৎস হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল। আশুতোষের আগ্রহাতিশয্যে কতকটা দ্বিধা সত্ত্বেও বাড়ীর সকলে, এমন কি জননী জগত্তারিণী দেবীও ইহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন, তিনি জবরদস্তি করিয়া কিছু করেন নাই ; প্রত্যুত তাঁহার হৃদয় পারিবারিক স্নেহে ভরপূর ছিল।

কমলা দেবীর বিবাহ-উপলক্ষে তিনি গোঁড়া হিন্দু-সমাজের অতিশয় প্রতিকূলতা সহ্য করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় গোঁড়া হিন্দু-নেতা, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বিবাহে সম্মতি ছিল এবং বিবাহ-সভায় তিনি উপস্থিত থাকিবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। এবিষয়ে আশুতোষের সঙ্গে তাঁহার পরে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। গুরুদাসবাবু বলিলেন—"আমি বিবাহে যাইবার জন্য যথাসময়ে প্রস্তুত হইতেছিলাম, এমন সময়ে আমার কুল-পুরোহিত হঠাৎ আসিয়া আমাকে তাঁহার ঘোর আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু আমি কথা দিয়াছি, এখন কি করিয়া অন্যথাচরণ করি, এই বলিয়া গমনোদ্যত হইলে তিনি বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বীয় পৈতা ছিঁড়িয়া তখনই একটা ভীষণ কাণ্ড করিয়া বসিবেন, এই ভয় দেখাইয়া একেবারে আড় হইয়া পড়িলেন। সুতরাং আমি কিছুতেই আসিতে পারিলাম না।"

বিধবা কন্যা-বিবাহে গোঁড়া হিন্দুদের প্রতিকূলতা

যখন আশুতোষের মাতা জগত্তারিণী দেবীর হঠাৎ মৃত্যু হইল, তখন আশুতোষ আর গুরুদাসবাবুর দ্বারস্থ হইলেন না। গুরুদাসবাবুও তাঁহাকে শোকে সহানুভূতিসূচক কোন পত্র লিখিলেন না। কিন্তু মৃত্যুর দশ দিন অতিবাহিত হইলে একাদশ দিবসে হঠাৎ গুরুদাসবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশুতোষের মাতাকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। সামাজিক সংস্কার রক্ষা করিয়াও তিনি এই ব্যাপারে যে সহানুভূতি ও শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আন্তরিকতা-পূর্ণ।

সেই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের অপরাধ গুরুদাসবাবু কখনই ভুলিতে পারেন নাই। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে (১৯১৮ খৃঃ অঃ) যখন গঙ্গাতীরের পুণ্য-সমীরণ-স্পর্শ লাভ করিয়া তিনি মৃত্যুশয্যায় বাগবাজারের ঘাটের উপর তাঁহার দ্বিতল বাড়ীখানিতে ভগবানের শেষ আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন বহু আত্মীয়, বন্ধু সেই নির্ব্বিকার, প্রশান্ত, দেবকল্প পুরুষের পদরজঃ-গ্রহণের জন্য সেইখানে ভিড় করিতেন; আশুবাবু সেই সময় প্রায় প্রত্যহ একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। একদা সেই অবস্থায় মুমূর্ষু গুরুদাসবাবু অতি ব্যগ্রভাবে আশুতোষকে নির্জ্জনে বলিলেন,—"বলুন, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের জন্য একটা অনুতাপ আমাকে খোঁচার মত বিদ্ধ করিতেছে। আপনি আমাকে ক্ষমা না করিলে এই শয্যায় আমি শান্তি লাভ করিতে পারিব না।" আশুতোষ বারংবার অতি-সৌজন্য এবং বিনয়ের সহিত আশ্বাস দেওয়ার পর গুরুদাস স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি তাঁহার শ্রাদ্ধ-সময়ে পুত্রগণ যেন আশুতোষের দ্বারস্থ হইয়া তাঁহাকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করেন, এই আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। তদনুসারে আশুবাবু গুরুদাসবাবুর শ্রাদ্ধ-বাসরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আশুতোষ-জননী জগত্তারিণী দেবী

লীলাবসান

"বিসর্জ্জি' প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিল নীরবে।"
—মাইকেল

"He was the greatest Bengalee of his generation. I do not think that I should be wrong, if I were to say that in many respects he was the greatest Indian of his days."

—Chief Justice of Calcutta High Court. (27-5-24)

মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই আশুতোষ নানারূপ পারিবারিক অশান্তির মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার জননী পুণ্যশীলা জগত্তারিণী দেবীর দেহান্ত ঘটে। এই ঘটনায় স্বভাবতঃই তাঁহার মত মাতৃভক্ত পুত্রের হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। কিন্তু এই মৃত্যু এরূপ এক অবস্থায় ঘটিয়াছিল, যাহাতে শোকটা তাঁহার পক্ষে কতকটা অসহ্য হইয়াছিল এবং সেই কষ্ট তিনি অবশিষ্ট জীবনে একদিনও ভুলিতে পারেন নাই। সে ঘটনাটি এই :—

জগত্তারিণী দেবী নানারূপ পীড়া ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু শীঘ্র যে মৃত্যু ঘটিবে, এ আশঙ্কা কেহ করেন নাই। ১৩ই এপ্রিল (১৯১৪ খৃঃ অঃ) কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কোন উৎসবে আশুতোষকে নেতৃত্ব করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। যদিও মাতৃদেবীর আসন্ন মৃত্যুর কোন লক্ষণই ছিল না, তথাপি আশুতোষ তাঁহার সান্নিধ্য হইতে দূরে যাইতে সহজে স্বীকৃত হইতেন না। কিন্তু মহারাজা বাহাদুর না-ছোড়বান্দা হইয়া তাঁহাকে স্নেহের জোরে একরূপ টানিয়া লইয়া গেলেন। মাতা বলিলেন,—"দুই এক দিনের জন্য যাইতে ক্ষতি কি?" শনিবার তিনি কাশিমবাজার গেলেন, রবিবার (১৪ই এপ্রিল) তিনি কলিকাতা হইতে 'তার' পাইলেন যে, তাঁহার মাতৃদেবী চিরতরে পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাস-রোগে তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন,—এই ঘটনা অসম্ভাবিত এবং একরূপ ধারণার অতীত ছিল। আশুতোষ আসিয়া মাতার

মাতৃবিয়োগ

শ্মশানে তাঁহার সৎকারের সময় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাশিমবাজার যাওয়ার সময়ে যিনি কত স্নেহে কথা বলিয়াছিলেন,—তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় আর তিনি দেখিতে পাইলেন না।

আশুতোষের কন্যা কমলা দেবীর আকস্মিক বৈধব্য, এবং তাঁহার পুনরায় বিবাহ দেওয়া উপলক্ষে নানা ঝঞ্ঝাট এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই বিবাহের শোচনীয় পরিণতি,—এই সকল অবস্থার বৈগুণ্য তাঁহাকে এক দিনও সোয়াস্তি দেয় নাই। তারপর এই কন্যার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

কমলা দেবীর মৃত্যু

একদিকে পাটনার সেই জটিল সুবৃহৎ মামলা, তাহার নথিপত্র লইয়া দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে,—অন্যদিকে প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র বামাপ্রসাদ টাইফয়েড্ জ্বরে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় শয্যাগত। আশুতোষকে একবার কলিকাতায়, একবার পাটনায় দারুণ উদ্বেগে ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ এবং জামাতা প্রমথনাথ পাটনায়। এই বিপদে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের পাষাণ-প্রতিম সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা ছিল,—কিন্তু একটি জায়গায় ভগবান্ তাঁহার চরিত্র কুসুম দিয়া গড়িয়াছিলেন,—উহা ছিল পারিবারিক স্নেহের জায়গাটুক। যিনি পরের গৃহের আধি-ব্যাধির কথা শুনিলে বিগলিত হইয়া পড়িতেন, তিনি নিজের গৃহের কষ্ট সহিতে পারিলেন না। বামাপ্রসাদের এই দারুণ রোগ এবং তজ্জনিত আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। এদিকে পাটনা হাইকোর্টে জরুরী আহ্বান। তিনি পুত্রকে দেখিতে আসিয়া বুঝিলেন,—তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন,—তিনি এ অবস্থায় পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য পাইলেও কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না। প্রধান বিচারপতিকে জানাইয়া 'তার' করিলেন, দয়া করিয়া তিনি শুনানীর দিন পিছাইয়া দিলেন। বামাপ্রসাদের অবস্থার একটু উন্নতি হইলে, সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভের পর তিনি তাঁহাকে একটা বড়, ভাল মোটরগাড়ী কিনিয়া দিবেন বলিয়া কত স্নিগ্ধ কথা বলিলেন। রোগ-শয্যায় বামাপ্রসাদ একটা ভাল মোটরগাড়ীর আবদার করিয়াছিলেন। মোটরগাড়ীর জন্য অর্ডার চলিয়া গেল। প্রিয় পুত্রের অবস্থার একটু উন্নতি

পারিবারিক অশান্তি

ধর্ম্মতলার নিকট স্থাপিত আশুতোষের প্রতিমূর্ত্তি

দেখিয়া তিনি উৎফুল্ল হইলেন এবং বিদায় গ্রহণ করিয়া পাটনায় চলিয়া গেলেন। হায়! কে জানিত সে বিদায় চিরবিদায়।

পাটনায় পৌঁছিয়া আশুবাবু অনন্যমনা হইয়া ডুম্‌রাওন-মোকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন। ১৯শে মে, সোমবার দিন তিনি পাটনায় গেলেন, বৃহস্পতিবার দিন তাঁহার মোটরের সোফার খাইবার জন্য তাঁহাকে তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিল। এতবড় লোককে সামান্য সোফার খাওয়াইতে চাহিয়াছে! কিন্তু সে জানিত আশুবাবু তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না; প্রীতির আহ্বান যেখান হইতে যখনই আসিয়াছে, কুটীর ও রাজপ্রসাদের ভেদ তখনই তাঁহার চক্ষে অন্তর্হিত হইয়াছে। চন্দ্র-কিরণ যেমন রাজপ্রসাদের শীর্ষ-দেশ উজ্জ্বল করিয়া কুটীরের প্রতি কার্পণ্য করে না, আশুতোষের উদারতাও সেইরূপ সার্ব্বজনীন ও সৌজন্যময় ছিল।

সাংঘাতিক পীড়া

সোফারের বাড়ীতে খাইয়া আসিয়া ২৩শে শুক্রবার তাঁহার সামান্য জ্বর হইল, একটা কুচকি একটু ফুলিল,—ডাক্তার বলিলেন,—"ইহা প্লেগ নহে।" সেই কুচকি-ফোলা ও জ্বর কমিয়া গেল; তিনি তলপেটে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। পেটের দস্তুরমত অসুখ ও বমি হইতে লাগিল,—ডাক্তার বলিলেন,—"ইহা কলেরা নহে।" তবে কি? রমাপ্রসাদ কলিকাতা হইতে লেডী মুখার্জ্জীকে ডাক্তার লইয়া আসিতে 'তার' করিলেন। ডাঃ ব্রহ্মচারী যাইতে পারিলেন না; ডাঃ পি, নন্দী যাইয়া দেখেন, রোগীর অবস্থা গুরুতর এবং জীবনের আশা নাই।

শনিবার আমি ভবানীপুরে আসিয়া খবর লইয়া গিয়াছিলাম,—আশুবাবুর সামান্য একটু জ্বর হইয়াছে এবং কুচকি ফুলিয়াছে। পাটনা প্লেগের একটা চিহ্নিত কেন্দ্র,—এই সংবাদে আমরা একটু আতঙ্কিত হইয়াছিলাম; কিন্তু অব্যবহিত পরেই শুনিতে পাইলাম— কুচকি-ফোলা সারিয়া গিয়াছে।

রবিবার শেষ রাত্রিতে আমার পুত্র অরুণ আমাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া আশুবাবুর মৃত্যু-সংবাদ দিল। রেজিষ্ট্রার জ্ঞান ঘোষ আমাকে সংবাদ দিলেন, তখনই আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে যাইতে হইবে, আশুবাবুর শব-দেহ স্পেশাল ট্রেণে প্রাতঃকালে সেখানে আসিবে।

সমস্ত সহর হাওড়া পুলের দিকে

আমরা যে যেখানে ছিলাম, যে অবস্থায় ছিলাম, ছুটিলাম। মনে হইল, পৃথিবী যেন নির্ম্মনুষ্য হইয়াছে,—সূর্য্যের আলো ফুরাইয়া গিয়াছে!

হাওড়া ব্রিজের কাছে অসম্ভব ভিড়। এই ভিড় ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, মনে হইল যেন কৌস্তুভ, কোহিনুর অতল গঙ্গা-গর্ভে হারাইয়াছে, জনসাধারণ উন্মত্ত-ভাবে তাহা খুঁজিতে যাইতেছে! কি দুর্দ্দৈব! সেদিন হাওড়া ব্রিজ খোলা,—অন্য দিন দুই ঘণ্টা পরে তাহা যাতায়াতের জন্য ঠিক হইয়া যায়, কিন্তু সেদিন প্রভাত গড়াইয়া মধ্যাহ্নে ডুবিয়া গেল, তথাপি সেতু ব্যবহার-যোগ্য হইল না। এরূপ বিলম্ব তো কোন কালে হয় না!—লোকে বলিতে লাগিল, এই বিলম্ব ইচ্ছাকৃত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেতুর একটা শিকল ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, এইজন্য সেদিন সকাল সাড়ে নয়টার সময়ে তাহা যাতায়াতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা থাকিলেও বেলা দুইটার পূর্ব্বে ঠিক করিতে পারা গেল না। সকাল ৭টা হইতে বিকাল ২টা পর্য্যন্ত সেতু বন্ধ ছিল,—এরূপ বিলম্ব সচরাচর ঘটে না। সমস্ত দিক্ দিয়াই সে দিনটা মস্ত বড় একটা দুর্দ্দিন।

আমাদের তখন মনের যে অবস্থা, সাঁতার কাটিয়া নদী পার হইতে হইলেও আমরা সেই ঝুঁকি গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া বসিলাম। অবশেষে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ 'ফেরি'-নৌকা-যোগে, কতক ষ্টীমারে ওপারে গেলেন,—দেখিলাম, সমগ্র বাঙ্গলাদেশ সেখানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। লোকে লোকারণ্য—কেবল অগণিত নর-মুণ্ড! সেই শোক-বিমূঢ় জন-সমুদ্রের মধ্যে কত রাজা, মহারাজা, কত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী—কত ইউরোপীয় এবং ভারতবাসীকে দেখিলাম, তাহার সংখ্যা কে করিবে!

পাটনার সুপ্রসিদ্ধ হাসান ইমাম সাহেব আশুতোষের শবদেহের জন্য স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লেডী মুখার্জ্জী পাটনা যাইবার পথে ঝাঁজা পর্য্যন্ত যখন পৌঁছিলেন, তখন কলিকাতা হইতে সেখানে রেলওয়ে-অফিসারের নিকট আশুতোষের মৃত্যু-সংবাদ আসিল।

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তথাকার ষ্টেশন পর্য্যন্ত শবের অনুগমন করিয়াছিলেন। নির্দ্ধারিত সময়ের দীর্ঘ চারি ঘণ্টা পরে, বেলা
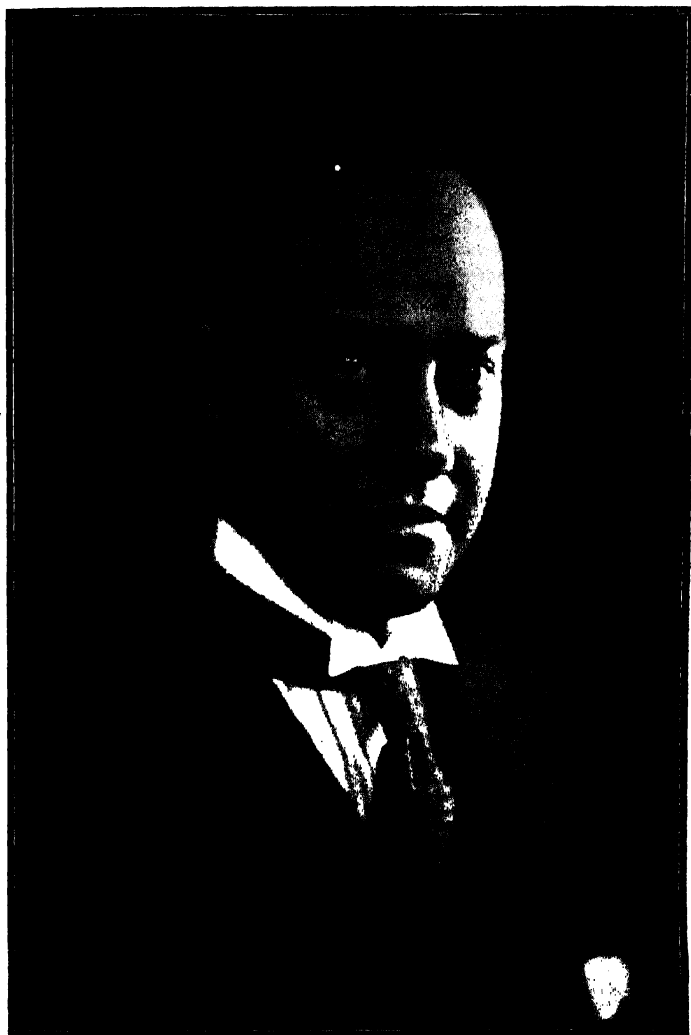
আশুতোষের জামাতা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুইটার সময়ে স্পেশাল ট্রেণখানি যেন মন্থরগতিতে, বিষণ্ণ চক্রাবর্ত্তনে হাওড়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

লৌহ-শকটের চক্রগুলি যেন অগণিত নর-নারীর হৃদয় নির্ম্মমভাবে পিষিয়া দুঃসহ আঘাতে সকলকে হত-চেতন করিয়া সহসা থামিল! সে যে কি অবর্ণনীয় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! শবদেহ স্কন্ধে করিয়া যাঁহারা নামাইলেন, তাঁহাদের মধ্যে দেখিলাম ডাঃ যতীন মৈত্রকে এবং ধূলি-ধূসর, মলিন পরিচ্ছদে অশ্রু-প্লাবিত গণ্ড, সুদর্শন প্রমথনাথকে। তিনি বজ্রাহতের ন্যায় আবিষ্ট, তাঁহার চন্দ্রমুখখানির সুন্দর অধর-যুগ্ম ক্রন্দনের বেগে ঈষৎ কম্পিত। এদিকে বাহকগণের কাঁধের উপর কুসুম-মাল্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে-আবৃতদেহ আশুতোষের মস্তকটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। যে মুখের দাপটে দম্ভোলি-নিক্ষেপীর দম্ভ যেন স্তব্ধ হইত, সে মুখ আজ মন্ত্র-সিদ্ধ শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে; যিনি দাঁড়াইলে মনে হইত মৈনাক-মন্দারকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার শিরোদেশ উর্দ্ধে উঠিয়াছে; যাঁহার পাদ-ক্ষেপে দ্বারভাঙ্গা-গৃহের সোপানাবলী প্রকম্পিত হইত,—যেন মন্ত্রশক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলরব স্তব্ধ হইয়া যাইত; যাঁহার কণ্ঠ-স্বরে কর্ম্মীর কর্ম্মের তৎপরতা বাড়িয়া যাইত; যিনি যেখানে গিয়াছেন, রাজযোগ্য আদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন; বাঙ্গালীদের মধ্যে একমাত্র যাঁহাকে সাহেবেরা ভীতির চক্ষে দেখিতেন; সিনেট-হলে শত সভায় দৃষ্ট হইয়াছে যে, তাঁহার কথাই শেষ কথা এবং তাঁহার কথার উপর আর কাহারও কথা চলিত না; যাঁহার মন্ত্র-সিদ্ধ বাক্য পাখোয়াজের বোলের ন্যায় ওজস্বী এবং সুগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হইত; যিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন; যে শক্তিশালী পুরুষবরের কটাক্ষ-পাতে মাধব-বাজারের ছোট-বড় দোকানপাট, মেছুনীদের কলরব ও খরিদ্দার-গণের তুমুল গণ্ডগোল কুয়াসার ন্যায় বিলীন হইয়া সেখানে গগনস্পর্শী, অদ্ভুত বিদ্যায়তনের ভিত্তি প্রোথিত হইল; সেই জ্ঞান-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-যোগের অবতার, শত শত বৎসরে যাঁহার মত একটি লোক অবতীর্ণ হ'ন; ক্রমবিলীয়মান বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যেরূপ লোকের পুনরাবির্ভাব সন্দেহ-স্থল; যিনি পরীক্ষা-শালায় সর্ব্বপ্রথম,—সিনেট-গৃহে সর্ব্বপ্রথম,—গভর্ণমেণ্ট্-কাউন্সিলে শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত তর্কে সর্ব্বপ্রথম, যিনি সাধারণের মধ্যে দাঁড়াইলে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়-পূর্ণ

হাওড়া ষ্টেশনে আশুতোষের শব-দেহ

দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন ;—যিনি সময়ের এক মুহূর্ত্তও অপব্যয় করেন নাই,—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া যিনি পরহিত-কল্পে, একান্ত নিঃস্বার্থভাবে প্রতিপক্ষের নানা গ্লানি ও ষড়যন্ত্র সহ্য করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে মহাযোগীর ন্যায় অকুণ্ঠিতভাবে কাজ করিতেন ; যাঁহার বিশাল ভুজাশ্রয়ে কত দুঃখী, তাপী ও আর্ত্ত সান্ত্বনা পাইয়াছে ; দাঁড়াইলে যাঁহাকে হিমাদ্রির ন্যায় অটল বলিয়া মনে হইত ; যিনি কথা বলিলে মনে হইত *গিরি-নিঃসৃত* গৈরিক স্রাব ঝরিতেছে অথবা ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিতেছেন ; যিনি স্বীয় বৃহৎ চেয়ারে উপবেশন করিয়া কথোপকথন-কালে চাণক্য অথবা সক্রেটিসের মত উপদেষ্টারূপে প্রতীয়মান হইতেন ; উৎসব-গৃহে যিনি আনন্দের প্রদীপ-স্বরূপ ছিলেন ; যাঁহার অভাবে সূর্য্যহীন সৌর-মণ্ডলের ন্যায় আর সমস্ত জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হইত,—সেই নর-দেহে ভাগবত-শক্তির জীবন্ত প্রকাশ—বিপুল পুরুষের চির-নিদ্রায় মুদিত-নেত্র মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইল, মানুষ, তুমি যত বড়ই হও না কেন, তোমার কিসের গর্ব্ব ? যাঁহার ইঙ্গিত ঐরাবত মণ-প্রমাণ খাদ্য খাইয়া বৃহৎ হইতেছে, এবং ক্ষুদ্র কীট কণা-প্রমাণ প্রসাদে তৃপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, সেই সর্ব্বব্যাপী, সুমহান, বিশ্বের অনন্য-শরণ একমাত্র ভগবান্ ছাড়া জগদ্বাসীর আর কেহ আশ্রয় ও বন্দনীয় নহেন।

শোকবিহ্বল-জনতা

তাঁহার শব দেখিয়া কেহ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিলেন, কেহ কেহ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন,—"বাঙ্গলা-দেশের শিক্ষা রসাতলে গেল।" সে দিনও তিনি দ্বারভাঙ্গা-ভবনে কত গুরুতর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন ; পাটনা যাইবার দিনেও তাঁহার গৃহে বন্ধু-বান্ধবের ভিড় হইয়াছিল, তিনি স্মিতমুখে সকলকেই আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। গ্রীক্ দেবতা য়্যাটলাসের ন্যায় তিনি যে এক খণ্ড-জগৎকে কাঁধে করিয়া ছিলেন ! বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভার গ্রহণ করিবে এমন বৃষস্কন্ধ কাহার ? বাড়ীর পরিজন ও পুত্রবর্গের চক্ষু সজল,—কেবল একজন ধীর,

বিপদে অটল শ্যামাপ্রসাদ

স্থির, পাষাণের ন্যায় অটল,—তিনি শ্যামাপ্রসাদ। প্রথম যৌবনে যেদিন তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়, সেদিনও তাঁহার সেই ধীর, স্থির, অটল মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। তাঁহার প্রিয় দুলাল পুত্রের মৃত্যুতেও তিনি অভিভূত হ'ন নাই ; তাঁহার বিশাল হৃদয়ে বজ্র পড়ে, কিন্তু তাহা

বিদীর্ণ হয় না। এই অমানুষী চরিত্র-দৃঢ়তাই তাঁহাকে তরুণ যৌবনে ভাগ্যাকাশের উজ্জ্বল ধ্রুব-নক্ষত্রের দীপ্তি দিয়াছে।

সেই হাওড়া ষ্টেশনের মর্ম্মবিদারী দৃশ্যের কথা আর কি বলিব! দেখিলাম, তাঁহার শবদেহের অনতিদূরে তাঁহার প্রিয় রেজিষ্ট্রার জ্ঞানচন্দ্র শোকাবেগে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন, আর অদূরে, কোথা হইতে একদল বৈষ্ণবের কীর্ত্তন-গানের সুর বাতাস্ বহিয়া আনিতেছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, তাহারা যে গানটি গাহিতেছিল, উহা আমার শৈশবে শ্রুত;—এইরূপ এক উপলক্ষেই তাহা প্রথম শুনিয়াছিলাম—"গৌর চল্‌ল ব্রজ-নগরে। ছেঁড়া কাঁথা, মুড়ো মাথা, করঙ্ক লইয়া করে॥"

আশুতোষের মহাপ্রয়াণ

সত্যই গৌরাঙ্গ-সুন্দর, যাঁহার পাদ-পীঠে শত শত ভক্ত গড়াগড়ি দিত, যাঁহার কুঞ্চিত কেশদাম আমলকী দ্বারা মার্জ্জিত হইয়া মল্লিকা-মালতীদামে সজ্জিত থাকিত, যে কেশ সুগন্ধি-তৈলবাসিত হইয়া স্কন্ধের উপর দুলিতে থাকিত, এবং 'কৃষ্ণ-কেলি'-ধুতিতে যাঁহার গৌর দেহ অপূর্ব্বরূপে শোভা পাইত এবং দ্রষ্টার মনোরঞ্জন করিত, সেই সোনার পুতুল গৌরাঙ্গ, সেই নবদ্বীপের চোখের মণি, শচীমাতার অঞ্চলের নিধি, বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠহার আজ 'ছেঁড়া কাঁথা', 'মুড়ো মাথা' লইয়া সন্ন্যাসীর কমণ্ডলু-হস্তে ব্রজপুরে যাইতেছেন,—আর নবদ্বীপে ফিরিবেন না। নবদ্বীপ-চন্দ্র বিনা নবদ্বীপ চিরদিনের জন্য আঁধার হইয়া গেল, নবদ্বীপের ঘরের সাঁঝের দীপ নিভিয়া গেল! যাঁহার জন্য মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী শচী-মাতা কত যত্নে নিত্য নূতন সামগ্রী রন্ধন করিতেন, আজ সেই বড় সাধের পুত্র করঙ্ক হস্তে লইয়া, বনে জঙ্গলে কটু, কষায় ফল খাইয়া থাকিবেন! ঐ দেখুন শ্রীবাসকে,—যাঁহার বিস্তৃত আঙ্গিনায় গৌর নূপুর-শিঞ্জিত পদে নৃত্য করিয়া স্বর্গীয় ভাবাবেশে সারারাত্রি কাটাইয়া দিতেন, ভক্তগণ তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত শ্রীমুখের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দেখিয়া সারারাত্রি বিনিদ্র চোখে তাঁহার রূপ-সুধা পান করিতেন, সেই শ্রীবাসের প্রাণের দুলাল গৌর ধূলিকাদা মাখা গায়ে, মুণ্ডিত মস্তকে সমস্ত আত্মীয়তা ও স্নেহের বন্ধন ছাড়িয়া জীবন-তরণী অকূলে ভাসাইতেছেন,—এ দৃশ্য কি দেখিবার?

শিক্ষামন্ত্রী ফজ্‌লুল্‌ হক্‌ সাহেব পোর্ট-কমিশনারদের সভাপতিকে আশুতোষের শব-বাহনের জন্য একখানি স্পেশাল ষ্টীমারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। দুই ঘণ্টা হাওড়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করার পর 'ফেরি'-জাহাজ 'বাক্‌ লাণ্ডে' বাহিত হইয়া শব গঙ্গার অপর পারে আনীত হইল। সেখানে এক অভাবনীয় জনতা,—মনে হইল যেন একটা জন-মুণ্ডের সমুদ্র। গবাক্ষ, অলিন্দ, গৃহশীর্ষ হইতে শত শত চক্ষু শব-দেহ একটিবার দেখিবার জন্য ব্যগ্র, নির্নিমেষ ভাবে প্রসারিত। হ্যারিসন্‌ রোড্‌ হইয়া যখন শব কলেজ স্কোয়ারে আনীত হইল, তখন মনে হইল—সেই প্রশস্ত স্থানে জনতা আর ধরে না। চৌরঙ্গী ও এস্‌প্ল্যানেডে যাইয়া শব-বাহকেরা 'আরমি' ও 'নেভি'র দোকানের কাছে কিছুক্ষণ থামিয়া গীর্জ্জার পশ্চিমদিকের পথে চলিলেন। হরিশ মুখার্জ্জী রোড ধরিয়া তাঁহারা রসা রোডের ৭৭নং ভবনে আসিলেন, কিন্তু বাড়ীতে ঢুকিলেন না। তখনও বামাপ্রসাদ কঙ্কালসার, শয্যাশায়ী,—পাছে মানসিক এই নিদারুণ আঘাতে তাঁহার মূর্চ্ছা হয়, এই আশঙ্কায় শব বাহির-বাড়ী হইতেই কেওড়াতলার শ্মশানে আনা হইল। বাঙ্গলার ভাগ্যাকাশের গৌরবোজ্জ্বল সূর্য্য মধ্যাহ্ন-গগন হইতে কেওড়াতলার শ্মশানে অস্তমিত হইলেন,—সেদিন গঙ্গার গর্ভে বাঙ্গালী-জাতি তাহাদের দুর্লভ, অমূল্য রত্নটি বিসর্জ্জন দিয়া দীন বেশে গৃহে ফিরিল।

আশুতোষের শব-যাত্রা

কেওড়াতলার শ্মশানে

আশুতোষ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন,—পশ্চিম আকাশে প্রখর মার্ত্তণ্ড ঢলিয়া পড়িয়াছে, রৌদ্র-দীপ্ত উজ্জ্বল আকাশ হঠাৎ যেন আঁধার হইয়াছে,—স্মৃতির লালিমাটুকু বুকে করিয়া দিগ্বলয় আঁধার আঁচলে মুখ ঢাকিতেছে! আমি কবি নহি,—এই মহাবিয়োগান্ত দৃশ্যের কারুণ্য ভাষায় বুঝাইব কিরূপে?

তরুণ বয়সে আশুতোষ

কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
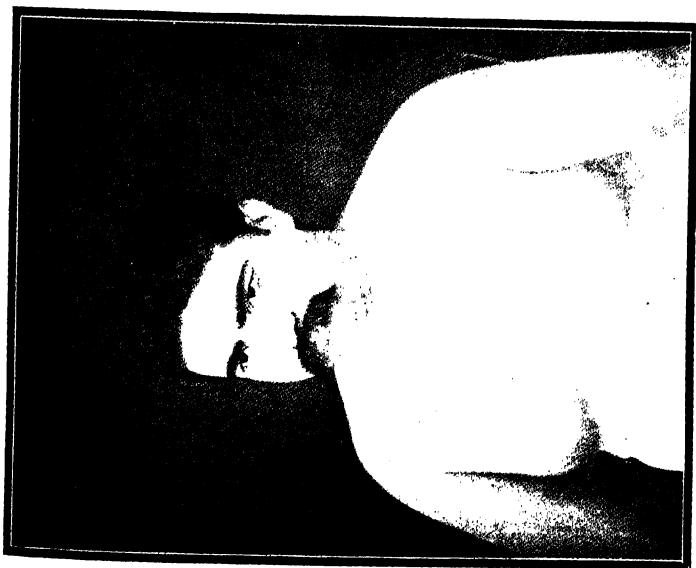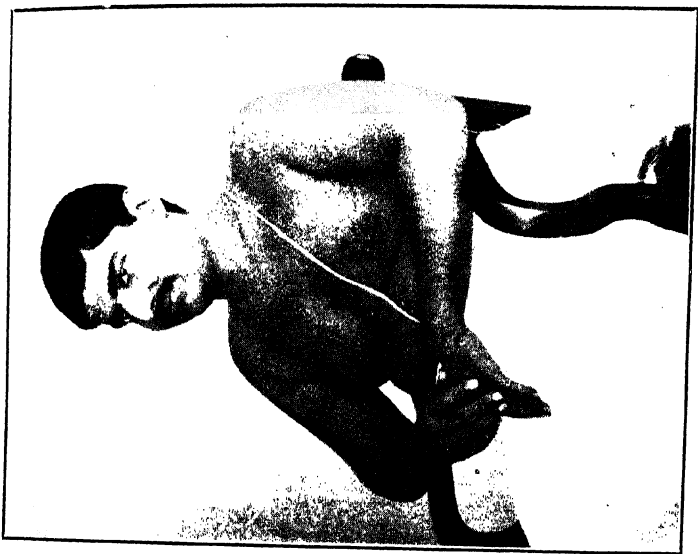
হারাইয়াও হারাই নাই

আশুতোষের মৃত্যু সূর্য্যাস্তের ন্যায়। বাল্যকালে তিনি যখন পিতার করাঙ্গুলি ধরিয়া মিল্‌টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট'এর প্রথম অধ্যায়, বার্কের হেষ্টিংস্ সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ক্যাম্বেলের 'আশার আনন্দ' ('Pleasure of Hope') আবৃত্তি করিতে করিতে প্রাতর্ভ্রমণ করিতেন, কিংবা প্রায় প্রতি দিন স্কুলে প্রথম থাকিয়া পিতৃদত্ত একটাকা পুরস্কার পাইতেন, তখন তিনি তরুণ সূর্য্যের মতই প্রিয়দর্শন ছিলেন। ইহার পরে অপোগণ্ডত্ব-উত্তীর্ণ সূর্য্যের ন্যায়ই তিনি বিদ্যাপীঠে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়া দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়াছিলেন। পরিণত জীবনে আশুতোষ মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় প্রখর ও দুর্নিরীক্ষ্য, স্বীয় অদ্ভুত তেজের দ্বারা কর্ম্মক্ষেত্রকে যজ্ঞ-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। সূর্য্যের মত তাঁহার তীব্র দাহিকা-শক্তি সময়ে সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অসহ্য হইয়াছে; কিন্তু মধ্যাহ্ন ভাস্কর যেরূপ অন্যত্র তেজ দেখাইয়াও অশ্বত্থের নব পত্র-পল্লবের মধ্যে সবুজ রং ছড়াইয়া—তন্মধ্যে নবজাগরণের কলরব ও সাড়া আনয়ন করেন, আশুতোষও সেইরূপ স্বীয় প্রখরতা সত্ত্বেও দেশের তরুণদের মধ্যে জীবন-প্রভাতের শুভ প্রেরণা আনিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে; কিন্তু আমরা তাঁহাকে হারাইয়াও হারাই নাই। তাঁহারই হাতে-গড়া শ্যামাপ্রসাদ এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার; এই তরুণ যুবক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়। প্রকৃতি যেন আশুতোষের মূর্ত্তিতে রং ফিরাইয়াছেন। বাল্যে, যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে আশুতোষ সূর্য্যের মতই কখনও মধুর-উজ্জ্বল, কখনও স্বীয় তেজে দীপ্ত, কখনও তাঁহার উগ্র দাহিকা-শক্তিতে কেহ সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ সকল অবস্থায়ই স্নিগ্ধ, অমায়িক ও প্রিয়দর্শন এবং তরুণ যৌবনেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। ইনি প্রথম হইতেই

পূর্ণচন্দ্র, অথচ ইঁহার সমস্ত আলো, সমস্ত প্রতিভা সেই সূর্য্য হইতেই পাওয়া; প্রকৃতি ইঁহাকে সূর্য্যের সকল শক্তিই দিয়াছেন, কেবল সেই প্রখর দাহিকা-শক্তিটি দেন নাই। তাই আশুতোষকে হারাইয়াও আমরা হারাই নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের তীক্ষ্ণ মনস্বিতা ও মৃদুতার মধ্যে লুক্কায়িত কর্ম্মশক্তি ও মতের দৃঢ়তা, উমাপ্রসাদ ও বামাপ্রসাদের প্রতিভা,—সকলের মধ্যেই আমরা ন্যূনাধিক পরিমাণে আশুতোষকে পাইয়াছি, আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়তঃ। জামাতা অনাথনাথ কর্ম্মজীবনে আশুতোষের নিকটেই হাতেখড়ি পাইয়াছেন। তিনি কর্ম্মকুশল, অধ্যবসায়শীল অথচ মৃদু। কিন্তু আশুতোষের প্রথম জামাতা প্রমথনাথ, যিনি জীবনে তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন ও প্রতি কার্য্যে সেই মহা-উপদেষ্টার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে আশুতোষের তেজের স্ফুলিঙ্গ বিশেষ করিয়া পাইয়াছি।

শেষ দেখা

"স্বপনে দেখিলুঁ শিব সিংহ ভুপ।
চৌতিশ বচ্ছর পরে শ্যামল রূপ॥"
—বিদ্যাপতি

আশুতোষের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে,—তখন আমি অবসর গ্রহণ করিয়াছি—এক দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-গৃহের বঙ্গীয় বিভাগে গিয়াছিলাম,—পথে মনোমোহন পিয়ন দাঁড়াইয়া ছিল। এই মনোমোহনের পিতা দ্বারকা আমার বাড়ীর লোক,—ছোটকালে সে-ই আমাকে কাঁধে লইয়া সারাদিন ঘুরিত এবং খেলনা দিত। তাহার পুত্র মনোমোহনকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশ হইতে আমার বাড়ীতে আনাইয়াছিলাম; শেষে আমার আপিসে এই পিয়নের কাজটি সে পাইয়াছিল।

বঙ্গ-বিভাগের নীচ তলার অতি নিকটে পোষ্ট্-আপিস,—ত্বই-এক মিনিটের পথ। আমি খগেনবাবুর কাছে গিয়াছিলাম; তিনি ছিলেন না,—আমি পরিশ্রান্ত হইয়া একখানি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলাম। মনোমোহনকে দেখিয়া, পকেট হইতে কয়েকখানি চিঠি বাহির করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম,—"এই চিঠিগুলি ডাকে ফেলিয়া আইস।" সে বলিল,—"যাইতেছি, কিন্তু যদি খগেনবাবু আসিয়া পড়েন",—একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার বলিল,—"তবে তাঁহাকে বলিবেন, আপনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, এখনই ফিরিব।" আমি চিঠি-কয়েকখানি ফেরত লইয়া বলিলাম,—"থাক্, খগেনবাবু যখন এখনও আসিলেন না, আমি এখনই যাইতেছি, যাইবার সময় নিজেই চিঠিগুলি ফেলিয়া দিয়া যাইব।"

কিন্তু কেন যেন একটা অসোয়াস্তির ভাব মনে হইল। আমি শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া চেয়ারে হেলিয়া পড়িলাম, তখন চক্ষু ত্বইটি বুজিয়া আসিয়াছে,—

আমার তন্দ্রা আসিল। সহসা এ কি দেখিলাম? জীবন্ত আশুতোষ,—সাদ ধুতির অযত্ন-ন্যস্ত কোঁচাটি পায়ের কাছে হেলিয়া পড়িয়াছে, সেই দীর্ঘ, কালে কোটটি গা'য়, বিশাল গুম্ফে ওষ্ঠাধর আবৃত, সেই মূর্ত্তি,—ঠিক আশুতোষ তিনি আমার কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন,— "আপনার এ দুর্দ্দশা কে করিল?" মুহূর্ত্তের মধ্যে করুণায় আমার প্রাণ ভরিয়া গেল এবং আমি জাগিয়া উঠিলাম,—দেখিলাম, তিনি নাই, কিন্তু আমার চোখের দুই ফোঁটা জল গণ্ডে নামিয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে স্মিতমুখে খগেনবাবু আসিয়া বলিলেন,—"এই যে, কতক্ষণ?" আমি চোখের জল তাঁহার আড়ালে মুছিয়া ফেলিলাম।

সেই একবার তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্নেহ, উৎসাহ ও তৎপ্রদত্ত গৌরব এ জীবনে কেমন করিয়া ভুলিব? যে দিন এফ্, এইচ্, টমাস্ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন, সে দিন আমাকে তাঁহার সহিত পরিচিত করার উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন,—"He is a pillar of our University." এমন গৌরব আমাকে আর কে দিবে? অথচ তিনি আমার সমক্ষে প্রশংসা আর কখনও করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তাঁহার প্রিয় দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইংরাজীতে বি, এ, অনার্স পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ইংরাজীতে এম্, এ পরীক্ষা দিতে না দিয়া তিনি তাঁহাকে বঙ্গ-বিভাগের এম্, এ ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও আমার প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়াছিলাম।

তাঁহার স্বর্গারোহণের পর যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়াছি, তখনই মন কাঁদিয়া উঠিয়াছে,—ভাবিয়াছি যেন আমার পায়ের নীচ হইতে পৃথিবী সরিয়া গিয়াছে,—আমি নিরবলম্ব এবং শক্তিহারা; তখন তাঁহার স্মৃতি ও তৎসম্বন্ধে শত কথা স্মরণ করিয়া আমার চক্ষু দুইটি ভারাক্রান্ত হইয়াছে। সেই স্মৃতির আলেখ্য যথা সম্ভব সতর্কতার সহিত এই পুস্তকে অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

পরিশিষ্ট

আশুতোষের পিতামহ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত এবং স্বহস্ত-লিখিত রোজনাম্‌চার একটি পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট

বিশ্বনাথের "রোজনামচা"

[আমরা ৯—১৩ পৃষ্ঠায় বিশ্বনাথের রোজনামচার সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করিয়া মূল হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। মহেন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের লেখা অবলম্বন করিয়াই আমরা এই সঙ্কলন প্রস্তুত করিয়াছিলাম।

এখন আমরা বিশ্বনাথের রোজনামচার মূল পুঁথিখানি পাইয়াছি। মূলের সঙ্গে বিদ্যানিধি-কৃত নকল মিলাইয়া দেখিলাম যে, নকলটি অনেক স্থানে মূলানুযায়ী হয় নাই। সঙ্কলয়িতা বর্ণাশুদ্ধি তো সংশোধন করিয়াছেনই, তাহা ছাড়া পরিবর্ত্তন ও বর্জ্জনের পরিমাণও কম করেন নাই। বাঙ্গলা ভাষার আদি রূপ সন্ধান করিতে গেলে প্রাচীন কালের বর্ণ-বিন্যাসের রীতিটি আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রাচীন পুঁথিগুলির সহিত সুদীর্ঘ কালের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, শুধু ভাষা-ক্ষেত্রে নহে, উচ্চারণ ও বর্ণ-বিন্যাস প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই বাঙ্গলা-সাহিত্য প্রাচীন কালে সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃতের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতার বেশী পরিচয় দিয়াছে। প্রাকৃত-শব্দগুলির সেই বর্ণ-সন্নিবেশ আমরা পরবর্ত্তী সংস্কৃত-প্রাধান্যের যুগে একেবারে উল্টাইয়া দিয়াছি। আমরা গত তিন শতাব্দীর মধ্যে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত-শব্দের আমদানী করিয়া আমাদের ভাষার রূপটি এরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছি যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, বাঙ্গলাটা সংস্কৃতেরই রূপান্তর। কিন্তু ইহার প্রাচীন কালের নমুনায় বাঙ্গলার পল্লী-মায়ের সুস্নিগ্ধ গন্ধ ও রূপটি বন-ফুলের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি মুগ্ধ করে। এখন 'যাইতে' লিখিতে যদি কেহ 'জাইতে' লিখেন, 'ছুটিয়া' লিখিতে যাইয়া যদি 'ছুটীয়া' লিখেন, এমন কি 'আমি' লিখিতে যদি কেহ 'আমী' লিখিয়া বসেন, তবে আমরা বিজ্ঞবৎ তদ্বিধ মূর্খতা লইয়া উপহাস করিয়া থাকি। কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার লেখকবর্গের অনেকেই ঐরূপ লিখিতেন। এমন কি, যে শব্দগুলিকে আমরা খাস সংস্কৃত-শব্দ বলি, তাহার সম্বন্ধেও সেই সকল লেখক ঝুড়ি ঝুড়ি বর্ণাশুদ্ধি করিয়া বসিতেন। 'পদ্মা' লিখিতে 'পদ্যা', 'শীত' লিখিতে 'সীত', 'পশ্চিম' লিখিতে 'পচ্চীম' প্রভৃতি ভাবের 'বর্ণাশুদ্ধি' বিশ্বনাথের এই রোজনামচায় সুলভ। কিন্তু উহা আদৌ বর্ণাশুদ্ধি কি না, তাহা জিজ্ঞাস্য। এই-ভাবের নানা শব্দের বর্ণ-বিন্যাস প্রাকৃতের রীতি-অনুযায়ী বলিয়াই আমার মনে হয়। 'স' 'জ' 'ন' বৌদ্ধ-প্রধান বাঙ্গলা দেশে একরূপেই লিখিত হইত, তাহাদের অন্যরূপগুলি প্রাকৃত ভাষায় স্বীকৃত হয় নাই। তবে গত তিন শতাব্দীর মধ্যে

বাঙ্গলা লেখায় একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। প্রাকৃত-রীতির স্থলে ধীরে ধীরে বাঙ্গাল লেখকেরা উচ্চারণ ও বর্ণ-বিন্যাসে সংস্কৃত-রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই রীতি পরিবর্ত্তনের যুগে এক দিনেই লিপির প্রাচীন পদ্ধতি উল্টিয়া যায় নাই। এজন্য আস সংস্কৃত-রীতি ও গমনোন্মুখ প্রাকৃত-রীতি উভয়েরই প্রভাব এই যুগের বাঙ্গলা-সাহিত্য বহ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজেরা 'girl'এর স্থলে 'guerle', 'vote'এর স্থলে 'voat 'politics'এর স্থলে 'politiks' লিখিতেন।

খুব প্রাচীন পুঁথির সঙ্গে পরবর্ত্তী একটি একটি করিয়া কয়েক যুগের বাঙ্গলা লেখা তুলনা-মূলক একখানি 'লিপি-পরিচয়' প্রস্তুত করিলে হয়ত দেখা যাইবে, কি ভাবে উদয়োন্মু সংস্কৃত-প্রভাবের পার্শ্বে বিলয়োন্মুখ প্রাকৃত-রীতি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই গুরুত সমস্যা-সমাধানের পক্ষে প্রাচীন বাঙ্গলা গদ্যের নমুনা-স্বরূপ আমরা বিশ্বনাথের স্বহ লিখিত প্রাচীন পুঁথিখানি "যথা দৃষ্টং" সেই ভাবে নকল করিয়া প্রকাশিত করিলাম একটা দেশ-ব্যাপক পদ্ধতি, যাহা বিশিষ্ট একটি ভাষার রীতি-নির্দ্দেশক, তাহা সংস্ক নিয়মাধীন নাই বা হইল, সেই পরিচয়-প্রদায়ী এই পুঁথিখানি যেন তথা-কথিত বিজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণাশুদ্ধির উদাহরণ বলিয়া মনে না করেন; সেরূপ করিলে তাঁহাদের বিজ্ঞতা হইতে অজ্ঞতা বেশী প্রদর্শিত হইবে। অবশ্য এখন বাঙ্গলার লিখন-পঠনের রীতি একটা নির্দ্দিষ্টরূপ গ্র করিয়াছে। কিন্তু সন্ধি-যুগের লেখাগুলি আধুনিক শুদ্ধাশুদ্ধির নিয়ম দ্বারা বিচার ক একেবারেই অসঙ্গত হইবে। আর কয়েক বৎসর পরে বাঙ্গলার লিপি যে নানা ভা পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহার সূচনা এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীশ্রীহরিঃ।—

সরণং।—

মোং কালনারগঞ্জ হইতে জেলা রংপুর পর্য্যন্ত নৌকাপথে জাইবার পথের বিবরন সন ১২৪৭ সাল তাং ১৫ কার্ত্তিক।

শ্রীশ্রীহরি।—

সহায়।—

সন ১২৪৭ সাল তারিখ ২৭ আস্বীন রবিবার মোং জিরাটের বাটী হইতে জাত্রা করিয়া ২৭।২৮ তারিখ বাহির বাটীতে থাকীয়া ২৯ রোজ প্রাতে অম্বীকার বাটীতে রাহি হইলাম ঐদিবষ দিবা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় অম্বীকায় পৌছিয়া রংপুর জাওনের নৌকার অসঙ্গতি প্রজুক্ত ইং ২৯ আস্বীন লাং ১৪ কার্ত্তিক অম্বীকার বাটীতে থাকীয়া ১৫

কার্ত্তিক দিবা আন্দাজ এক প্রহরের সময় উঠিলাম ইহার প্রর্ত্তহ দিবসের পথের বৃত্তান্ত লেখা বহি ইতি সন ১২৪৭ সাল তারিখ ১৫ কার্ত্তিক

সন ১২৪৭ সাল তারিখ ১৫ কার্ত্তিক মোং কালনার গঞ্জ হইতে শ্রীতিলকচন্দ্র কুণ্ডুর তহবিলের শ্রীবেঙ্গু মাজির নৌকায় আরোহন হইয়া ঐ দিবষ আন্দাজ দিবা এক প্রহরের সময় নৌকা খুলিয়া রাত্র আন্দাজ ছয় দণ্ডের সময় মোং শ্রীপাট নবদ্বিপের পুর্ব্ব আন্দাজ দুই ক্রোষ পথ দুরে নৌকা লাগান হইল—তথায় পাক করিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে থাকা গেল ইতি—

১৬ কার্ত্তিক প্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া শ্রীপাট নবদ্বিপ বামভাগে রাখিয়া ৺ভাগীরথী বাহিয়া মোং খড়িয়ার নদিতে নৌকা বাহিয়া সন্ধ্যার সময় গোআড়ি কৃষ্ণনগর পৌঁছিয়া পাক করিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে তথায় থাকা গেল ইতি।—

১৭ কার্ত্তিক রবিবার ঐ গোআড়ির ঘাটে নৌকা কুত করিবার কারণ দিবারাত্রে তথায় থাকা হইল ইতি ॥=॥=॥=

১৮ কার্ত্তিক সোমবার প্রাতে গোআড়ি হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ খড়িয়া নদি বাহিয়া মোং চাপড়ার নিলের কুটী ও নতুন হাঁষখালির বন্দর দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া তাহার উজানে রাত্রে নৌকা রহিল তথায় পাক করিয়া খাইয়া রাত্রে থাকা গেল ইতি

১৯ কার্ত্তিক মঙ্গলবার প্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ খড়িয়া নদি বাহিয়া মোং হাঁড়রার নিলের কুটী দক্ষীণভাগে রাখিয়া ও হাঁড়রার বন্দর দক্ষীণভাগে রাখিয়া সন্ধ্যার সময় মোং হাথীসালার হাটের উজান নৌকা লাগান হইল তথায় রাত্রে পাক করিয়া পাক করিয়া খাইয়া থাকা গেল ইতি ॥=॥=॥=

২০ কার্ত্তিক বুধবার অতি প্রাতেঃ তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ খড়িয়া নদি বাহিয়া মোং পালাসীপাড়ার বন্দরের উজান রাত্রি দুই দণ্ডের সময় নৌকা লাগান হইল তথায় পাক করিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে থাকা গেল ইতি ॥=॥=॥=

২১ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার অতি পূর্ত্তুসে নৌকা খুলিয়া ঐ খড়িয়া নদি বাহিয়া দিবা আন্দাজ ছয় দণ্ডের সময় মোং বালিটুঙ্গির বন্দর ও পুলিসের থানার কাছারি দক্ষীণভাগে রাখিয়া মোং বাটীকাপাড়া বাম ভাগে রাখিয়া মোং টীয়াকাটার বন্দরের পুর্ব্ব পারে সন্ধ্যার সময় নৌকা লাগান হইল রাত্রে তথায় পাক করিয়া খাইয়া থাকা গেল ইতি ॥=॥=॥=

এইখান হইতে সহর মুরসিদাবাদ আন্দাজ তিন ক্রোষ পথ পচ্চীম তরপ ইতি।—

২২ কার্ত্তিক যুক্রবার অতি প্রাতে নৌকা খুলিয়া মোং মধুপুর বাম ভাগে ও ফিদকাটী বামভাগে রাখিয়া মোং পাটগাছির নিলের কুটী দক্ষীণভাগে রাখিয়া ও পাটগাছির হাট বামদিগে রাখিয়া উহার উজানে রাত্রি আন্দাজ দুই দণ্ডের সময় নৌকা রহিল তথায় রাত্রে পাক করিয়া আহারাদি করিয়া থাকা গেল ইতি ॥=॥=

২৩ কার্ত্তিক শনিবার অতি প্রত্যুসে নৌকা খুলিয়া মোং বাগাডাঙ্গা ও অপ্রলং বামদিগে রাখিয়া সহর মুরসীদাবাদের শ্রীযুত নওয়াব সাহেবের কাটাখাল বাহিয়া পুনর ঐ খড়িয়া নদি দিয়া আসীয়া মোং চোড়াদহ ও করিমপুর বামভাগে রাখিয়া মোকাম কুকীন খালের মোহানা বামভাগে রাখিয়া ঐ খড়িয়া নদিতে রাত্রি আন্দাজ দুই দণ্ডের সং নৌকা লাগান হইল রাত্রে তথায় পাক করিয়া আহারাদি করিয়া থাকা গেল ইতি ॥=॥=

২৪ কার্ত্তিক রবিবার অতি প্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া মোং গোপালপ ও গয়রহ গ্রাম দক্ষীণভাগে রাখিয়া ঐ খড়িয়া নদি বাহিয়া দিবা আন্দাজ দেড়প্রহরের সং মোং জলঙ্গির মোহানায় পৌছান গেল অর্থাত "পদ্মাবতি নদিতে আইসা গেল—ঐ জলঙ্গি বাজারে উঠীয়া ক্ষুরি কর্ম্মাদি করিয়া এবং বাজারে কিছু২ খাদ্য দ্রর্ব্বাদি ক্রয় করিয়া আন্দা দিবা ত্রিতিয় প্রহরের সময় ঐ জলঙ্গির মোহানায় নৌকায় উঠা গেল—ঐ মোহানার পুর ধার দিয়া হাউলির গাঙ্গ গিয়াছে অর্থাত জে নদি হাঁষখালি দিয়া ৺গঙ্গাতে মিলিত হইয়াছেন দিবা আন্দাজ চারি দণ্ড থাকীতে পদ্মা বাহিয়া জাওয়া গেল রাত্রি আন্দাজ এব প্রহরের সময় ঐ পদ্মার পুর্ব্ব কীনারায় নৌকা রাখিয়া রাত্রে পাক করিয়া আহারাদি কর গেল রাত্রি আন্দাজ ছয় দণ্ড থাকীতে নৌকা খোলা গেল ইতি ॥=॥=॥=॥=

২৫ কার্ত্তিক সোমবার রাষ পুন্নিমা পুর্ব্ব দিবসের রাত্রি আন্দাজ ছয় দণ্ড থাকীতে নৌকা খুলিয়া ঐ পদ্মা বাহিয়া পচ্চীম কীনারায় দিবা আন্দাজ চারি দণ্ডের সময় মো দামোদরের নিলের কুঠি ও বন্দর দীক্ষণভাগে রাখিয়া ঐ পদ্মা বাহিয়া কুষ্টের বন্দর ও কুমা খালির রেষমের কুটী বামভাগে রাখিয়া দিবা আন্দাজ ছয় দণ্ড থাকীতে পাবনার নদিতে নৌকা আইল পদ্মা নদি এখান হইতে দক্ষীণদিগে গমন করিয়াছেন পাবনার নদি বাহিয় সন্ধ্যার সময় পাবনার জেলার কাছারি ডান হাতি ও নিলের কুটী বামভাগে রাখিয়া রাত্রি আন্দাজ দুই দণ্ডের সময় পাবনার বন্দরে পৌছিয়া রাত্রে পাক করিয়া আহারাদি করিয় থাকা গেল ইতি ॥=॥=

২৬ কার্ত্তিক মঙ্গলবার মাজিদিগের কোন কর্ম্মের কারণ ঐ পাবনার বন্দরের উত্তর পারে রাধাবন্দরের নিচে নৌকা রাখা গেল মধ্যাহ্নে তথায় পাক করিয়া আহারাদি করা গেল এবং ঐ বন্দরে কিছু২ খাদ্য দ্রর্ব্বাদি ক্রয় করিয়া দিবা আন্দাজ দুই দণ্ড থাকীতে নৌকা খুলিয়া ঐ পাবনার গাঙ্গ বাহিয়া নদির দুই পারে দোগাচি ও গয়রহ অনেক গ্রাম রাখিয় রাত্রি আন্দাজ এক প্রহরের সময় ঐ নদীর দক্ষীণ কিনারায় নৌকা থাকীল রাত্রে তথায় খেচরঅন্ন পাক করিয়া আহারাদি করিয়া থাকীলাম ইতি ॥=॥=॥=॥=॥=

২৭ কার্ত্তিক বুধবার গতো রাত্রি আন্দাজ ছয় দণ্ড থাকীতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ পাবনা নদি বাহিয়া নদির দুই পারে অনেক গ্রাম রাখিয়া দিবা আন্দাজ দেড় প্রহরের সময় মোং ধুনিআড়ার নিলের কুটীর নিচে নৌকা রাখা গেল এ কুটী শ্রীযুত ওয়াষ্টীন

সাহেবের—এখানে এ নদিকে ইছামতি নদি কহে দিবা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় পাক করিয়া আহারাদি করা গেল এখান হইতে উত্তর তরপ আন্দাজ দেড় ক্রোষ পথ তটাবেতে মোং ডেমরা গ্রামে শ্রীতিলকচন্দ্র কুণ্ডু দিগরের বাটীতে জাওয়া গেল শ্রীচন্দ্রমনী কুণ্ডু ও গয়রহ সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাত্রি আন্দাজ দুই দণ্ডের সময় নৌকায় আসীয়া তথায় থাকা গেল ইতি ॥—॥—

২৮ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিবা আন্দাজ দুই প্রহর পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া পাক করীয়া খাইয়া নৌকা খুলিয়া ঐ ইছামতি অর্থাত পাবনার গাঙ্গ বাহিয়া নদির দুই পারে অনেক গ্রাম রাখিয়া রাত্রি আন্দাজ চারি দণ্ডের সময় বড়াল নদির মোহানার পুর্ব্ব দিগে নৌকা থাকীল রাত্রে তথায় পাক করিয়া আহারাদি করিয়া থাকা গেল ইতি ॥—॥—॥—

২৯ কার্ত্তিক য়ুক্রবার অতি প্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া বড়াল নদি দক্ষিণদিগে রাখিয়া এবং ঢাকা জাইবার নদি পুর্ব্বদিগে রাখিয়া বেলকুঠীর গাঙ্গ বাহিয়া উত্তর তরপ চলিলাম মোং সাজাতপুর গ্রাম বামদিগে থাকীল এ গ্রামে অনেক উনাক নৌকা প্রস্তুত হয় এবং নদিতে বিস্তর চর নদির দুই পারে কিছু২ দফাতে অনেক গ্রাম আছে প্রায় মোছলমানের বসতিই অধিক বিস্তর জমী লোকাভাবে সকল জমী উঠিত হয় না অনেক বিলান জমী আছে তাহাতে আমন ধান্য হয় এই নদির দক্ষীণ কিনারায় নৌকা লাগান হইল না সন্ধ্যার সময় উত্তরপুর্ব্ব ধারে নৌকা রাখা গেল রাত্রে তথায় পাক করিয়া আহার করিতে পোকাতে বড় ব্যাঘাত করিলেক এজন্য সচ্ছন্দমত আহার হইল না রাত্রে তথায় থাকা গেল ইতি ॥—॥—॥—

৩০ কার্ত্তিক সনিবার অতি প্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ বেলকুঠীর গাঙ্গ বাহিয়া গাঙ্গের দুই পারে অনেক গ্রাম রাখিয়া দিবা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় গাঙ্গের বামভাগে নৌকা রাখিয়া খেচর অন্ন পাক করিয়া আহার করিয়া নৌকা খোলা গেল সন্ধ্যার সময় ঐ নদির উত্তর পারে নৌকা লাগান হইল রাত্রে অতিসয় পোকার কারণ অন্নব্যাঞ্জন পাক না করিয়া পুনরায় খেচরান্ন পাক করিয়া আহার করিয়া রাত্রে তথায় থাকা গেল ইতি ॥—॥—॥—

১ অগ্রহায়ন রবিবার তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ বেল কুঠীর গাঙ্গ বাহিয়া জায়দাবাদের গাঙ্গে নৌকা চলিল ঐ গাঙ্গের পচ্চীম তরপ দিয়া ধানবন্দীর একখাল গীয়াছে গাঙ্গের দুই পারে অনেক গ্রাম বষতি আছে দিবা আন্দাজ দষ দণ্ডের সময় মোং সেরাজগঞ্জ পৌছান গেল এতঃদেসের মধ্যে এ অতি বড় ভারি গঞ্জ বিস্তর জিনীষ পত্র আমদানী রপ্তানী হয় এবং বিস্তর নৌকার আমদরপ্ত হয় এই বন্দরে কিছু২ খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া অতি অপরান্নে বন্দরের উত্তর সিমানায় আসীয়া নৌকা লাগান হইল এই বন্দরের নিচে নদির নাম জমুনা কহে পুর্ব্ব তরপ দিয়া এক প্রাল ধারা গিয়াছে ঐ গাঙ্গ দিয়া মোং নলছিটীর তরপ জাওয়া জায় বন্দরের উত্তর সিমানায় নৌকা রাখিয়া রাত্রে অতিসয় কিটের উৎপাতকারণ সির্দ্দপক্ক্য করিয়া আহার করা গেল এখানকার ঐ জমুনা

নদি বড় পরিসর মধ্যে২ ৺গঙ্গা অপিক্ষায়ও অধিক পরিসর বোধ হয় কিন্তু বিস্তর চর পড়িয়াছে রাত্রে তথায় নৌকায় থাকা গেল ইতি ॥=॥=॥=॥=

২ অগ্রহায়ণ সোমবার অতি প্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ জমুনা নদি বাহিয়া দিবা আন্দাজ আড়াই প্রহরের সময় ঐ নদির বামভাগে চড়াতে খেচরঅন্ন পাক করিয়া আহার করা গেল এ নদি বড় পরিসর স্থানে২ পদ্মা নদি অপিক্ষাও অধিক পরিসর বোধ হয় নদির দুই পারে বড ২ চড়া আছে তাহাতে বিস্তর জমী আবাদ হয় আমন ধান্য এবং ধান্নের সহিত মাষকলাই বোনে তাহা পরিপাটীরূপে জন্মে ধান্ন রোয়না কিবল বুনিয়া জায় মাত্র অতি উর্ব্বরা জমী সর্ব্বদা মৃত্তিকা সরষ থাকে জমির পাইট প্রায় করিতে হয় না অনাসে সস্যাদি জন্মে ঐ চড়াতে নতুন২ বসতি হইয়াছে চড়ার পচ্চাৎ কিছু ২ দুর সাবেক বসতি বড় গ্রাম আছে প্রায় মোছলমান লোকের বসতিই অনেক দিবা আন্দাজ চারি দণ্ড থাকীতে ঐ নদির চড়ার জঙ্গলের কীছু দক্ষীণ দিগে নৌকা লাগান হইল তথায় পাক করিয়া সন্ধ্যার পর আহার করিয়া রাত্রে তথায় থাকা গেল ইতি ॥=॥=॥=

৩ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার অতিপ্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ জমুনা বাহিয়া পাড়ি দিয়া নদির পুর্ব্ব পারে আইসা গেল পচ্চীম পারে বিরদ চড়া আবাদ হয় না তাহাতে কসাড় ও ঝাউবন আছে মধ্যে২ পষুভয় আছে পুর্ব্ব পারে জাইয়া খেচরান্ন পাক করিয়া আহার করা গেল নদির পচ্চীম ভাগ দিয়া দাকোপা নামে এক প্রবল নদি বড় পরিসর হইয়া গীয়াছে বরসাকালে নৌকাদি চলে সীতকাল অবধি স্থানে২ বড়২ চড়া হয় একারণ নৌকা জায়না ঐ নদীর তফাতে গ্রাম সকল বসতি আছে প্রায় মোছলমানের বসতি জমুনা নদির পুর্ব্ব ধার দিয়া বৈকাল পর্য্যন্ত নৌকা বাহিয়া জাওয়া গেল অতিঅপরন্নে ঐ নদির কাছাড়ের নিচে নৌকা লাগান হইল রাত্রে তথায় পাক করিয়া আহারাদি করিয়া থাকা গেল ইতি ॥=॥=॥=

৪ অগ্রহায়ণ বুধবার অতি প্রত্যুসে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ জমুনা বাহিয়া দিবা আন্দাজ এক প্রহরের সময় ব্রহ্মপুত্র নদ অতি প্রবল ধারা এবং বড় পরিসর ঐ নদ পুর্ব্বদিগে রাখিয়া দাকোপা নদির প্রবল ধারার মধ্যে আইসা গেল দিবা আন্দাজ দেড় প্রহরের সময় ঐ দাকোপা নদির পুর্ব্ব কিনারায় চড়ার নিচে নৌকা রাখিয়া খেচরান্ন পাক করিয়া আহার করা গেল তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ দাকোপা নদি বাহিয়া দিবা আন্দাজ দুই দণ্ড থাকীতে ঐ নদির পচ্চীম কিনারায় নৌকা থাকীল রাত্রে তথায় পাক করিয়া আহারাদি করিয়া নৌকায় থাকা গেল ইতি এখান হইতে উত্তর দিগে কম্পপুরের নদি গীয়াছেন ॥=॥=॥=

৫ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার একাদসী তিথি প্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ দাকোপা নদি বাহিয়া আইসা গেল দিবা আন্দাজ আড়াই প্রহরের সময় ঐ নদির

প্রবল ধারা দেখা গেল জে পদ্মা হইতেও অধিক পরিসর হইবেক স্থানে২ ডাহি২ চড়া আছে ঐ চড়া আবাদ নহে এবং পষুভয় ইত্যাদিও আছে ঐ প্রবল ধারা বামভাগে রাখিয়া ৺গঙ্গা অপীর্ক্ষাও কোন২ স্থানে কিছু বেসী পরিসর হইবেক সেই ধারা দিয়া উত্তর মুখে জাওয়া গেল সন্ধ্যার সময় এক চড়ার নিচে নৌকা থাকীল তথায় রুটী করিয়া একাদসীর অনুকল্প করা গেল এবং রাত্রে তথায় নৌকায় থাকা গেল ইতি ॥=॥=॥=

৬ অগ্রহায়ণ যুক্রবার অতি প্রাতে॰ তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ দাকোপা নদি বাহিয়া পচ্চীম মুখে কতোদুর জাওয়া গেল· নৌকায় পাইল দিয়া জাওয়াতে উত্তর তরপ এক বিরদ চড়া দেখা গেল তাহাতে কসাড় ও ঝাউ ইত্যাদি অনেক বন আছে ঐ জঙ্গলে ব্রার্ঘ ইত্যাদি পষুভয় আছে ঐ জঙ্গল ও ঐ মোহানা উত্তর দিগে রাখিয়া জঙ্গলের পথে না জাইয়া পচ্চীম উত্তরের মোহানা বাহিয়া জাইয়া দিবা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় এক চড়ার নিচে নৌকা রাখিয়া পাক করিয়া আহার করা গেল আগেকার চড়ার নিচে দিয়া গুন টানিয়া জাইতে মাল্লা লোকেরা বাঘের পাএর অনেক বড়২ চিন্ন দেখিলেক জেখানে মধ্যন্নে পাক করা গেল সে চড়াতেও জঙ্গলাছে তাহাতেও পষুভয় ইত্যাদি আছে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ দাকোপা নদি বাহিয়া জাওয়া গেল সন্ধ্যার সময় পাড়ি দিয়া আসীয়া রাত্রে পাক করিয়া আহার করিয়া থাকা গেল ইতি ॥=॥=॥=

৭ অগ্রহায়ণ সনিবার প্রাতেঃ তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ দাকোপা নদি বাহিয়া দিবা আন্দাজ এক প্রহরের সময় ব্রহ্মপুত্র নদে আইসা গেল ঐ নদ বাহিয়া দিবা দুই প্রহরের সময় পচ্চীম কিনারায় নৌকা রাখিয়া পাক করিয়া আহার করা গেল দাকোপা নদি ইস্তক এবং এই ব্রহ্মপুত্র নদ অবধি দুই পায়ের জমীদারি কলিকাতার ৺গোপী মোহন ঠাকুরের পাতিলাদহ পরগনা কহে এ পরগনায় চড়ার জমীসকল উত্তম২ আছে কিন্তু প্রজা অভাবে অনেক জমী পতিত হইয়া রহিয়াছে ঐ ব্রহ্মপুত্র নদ বাহিয়া দিবা আন্দাজ ছয়দণ্ড থাকীতে তিস্তে নদিতে নৌকা আইল ব্রহ্মপুত্র নদ ডাইন হাতি থাকীল ঐ নদ উত্তর দিগে গিয়াছেন ঐ নদের পূর্ব্ব কিনারায় রাঙ্গা মৃত্তিকার বড় পর্ব্বত দেখা গেল ঐ পর্ব্বতের উপরে বাঁধ এবং নানা জাতিয় বৃক্ষাদি আছেন ঐ পর্ব্বত পুর্ব্ব তরপ হইয়া উত্তর দিগে বহু দুর পর্য্যন্ত গিয়াছেন স্থানে২ রাঙ্গা মৃত্তিকা আছেন এবং প্রস্তরের পর্ব্বত আছেন ঐ পর্ব্বত এবং ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তর দিগে রাখিয়া তিস্তে নদিতে পড়িয়া পচ্চীম মুখে নৌকা চলিল তিস্তে নদি বাহিয়া সন্ধ্যার সময় ঐ নদির পুর্ব্ব কিনারায় চড়ার নিচে নৌকা থাকীল রাত্রে রুটি প্রস্তুত করিয়া আহার করা গেল ইতি ॥=॥=॥=॥=॥=

৮ অগ্রহায়ণ রবিবার প্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ তিস্তে নদি বাহিয়া জাওয়া গেল ব্রহ্মপুত্র নদের কিনারায় পর্ব্বত বরাবর দেখা গেল ঐ পর্ব্বত বহুদুর পর্য্যন্ত গিয়াছেন

ছিলাটের পর্ব্বতের সহিত মিলিয়াছেন। দিবা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় তিস্তে নদির পূর্ব্ব কিনারায় চড়ার নিচে নৌকা রাখিয়া পাক করিয়া আহার করা গেল ঐ স্থানে মোহনগঞ্জ বলিয়া পাতিলাদহ পরগণায় ডির কাছারি আছে ঐ কাছারিতে উঠিয়া দেখিলাম একজন তহসিলদারও মুহরির থাকেন মুহরির সহিত আলাপ হইল তিনী কহিলেন জে বাবুদিগের এ পরগণায় ৩৬০০০ ছত্রিষ হাজার টাকা সদর তালুত প্রায় ১৭৫০০০ এক লক্ষ পচাত্তর হাজার টাকা হস্তবুদ ॥ ঐখান হইতে নৌকা খুলিয়া সন্ধ্যার সময় তিস্তে নদির পুর্ব্ব কীনারায় রাখীয়া রাত্রে পাক করিয়া আহার করিয়া থাকা গৈল ইতি ॥—॥—॥—

৯ অগ্রহায়ণ সোমবার প্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ তিস্তে নদি বাহিয়া দিবা আন্দাজ আড়াই প্রহরের সময় নদির উত্তর কিনারায় নৌকা রাখিয়া পাক করিয়া আহার করা গেল ঐ নদির দুই কিনারায় প্রায় গ্রাম বসতি আছে মোছলমান লোকের বসতিই অধিক হিন্দু অতি অল্পই আছে তাহারাও ছোট জাতি নদি বড় পরিসর নহে খড়িয়া নদির মতো হইবেক কিন্তু উত্তরের পর্ব্বত হইতে আসীয়াছেন ইহাতেই স্রোত বড় তজন্য অতি ঘোলা জল জানিয়া লোকেরা মৎসাদি ধরে না এবং বিস্তর চড়া আছে ঐ নদি বাহিয়া সন্ধ্যার সময় পুর্ব্ব কিনারায় এক গ্রামের নিকট নৌকা থাকীল অমবস্যার নিসি প্রজুক্ত রাত্রে রুটী প্রস্তুত করিয়া আহার করিয়া নৌকায় থাকা গেল ইতি —

১০ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার প্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ তিস্তে নদি বাহিয়া দুই পারে গ্রাম সকল রাখিয়া দিবা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় চড়ায় ধারে নৌকা রাখিয়া পাক করিয়া আহার করা গেল তাহার পর নৌকা খুলিয়া বরাবর জাইয়া সন্ধ্যার সময় ঐ নদির কিনারায় মিরগঞ্জের উজান চড়ার ধারে নৌকা রাখিয়া রাত্রে পাক করিয়া আহারাদি করিয়া তথায় নৌকায় থাকা গেল ইতি ॥ = ॥ = ॥ =

১১ অগ্রহায়ন বুধবার প্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ তিস্তে নদি বাহিয়া দিবা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় নদির উত্তর কিনারায় চড়ার নিচে নৌকা রাখিয়া মধ্যাহ্নাদি করিয়া নৌকা খুলিয়া জাওয়া গেল সন্ধ্যার সময় এক গ্রামের নিকট চড়ার নিচে নৌকা থাকিল রাত্রে তথায় পাক করিয়া আহারাদি করিয়া নৌকায় থাকা গেল ইতি।

১২ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার তথা হইতে নৌকা খুলিয়া ঐ তিস্তে নদি বাহিয়া দুই পারে গ্রাম সকল রাখিয়া দিবা আন্দাজ দেড় প্রহরের সময় পচ্চীম কিনারায় নৌকা রাখিয়া পাক করিয়া আহার করা গেল তথা হইতে নৌকা খুলিয়া উত্তর মুখে জাওয়া গেল এ নদির দুই ধারেই গ্রাম সকল বসতি আছে এবং জমী প্রায় পতিত নাই ধান্যাদি সকল ফসল জন্মে সন্ধ্যার সময় নদির পচ্চীম কিনারায় নৌকা রাখিয়া পাক করিয়া আহার করিয়া রাত্রে নৌকায় থাকা গেল ইতি ॥ = ॥ = ॥ =

১৩ অগ্রহায়ন ষুক্রবার প্রাতে তথা হইতে নৌকা খুলিয়া দিবা আন্দাজ দেড় প্রহরের সময় মোং ছালাবাগের বন্দরে নিচে নৌকা হইতে নামা গেল তথায় পাক করিয়া আহারাদি করিয়া ঐ দিবষ ও রাত্রি ঐ বন্দরে থাকা গেল ইতি।—

১৪ অগ্রহায়ণ সনীবার প্রাতে ছালাবাকের বন্দর হইতে রবিলোচন দাষ করিয়া নাম একজন রাজবংসীর এক বলদ ভাড়া করিয়া তাহাতেই জিনীষপত্র লইয়া দিবা আন্দাজ আড়াই প্রহরের সময় রঙ্গপুরে দেওয়ানটুলি মোকামে শ্রীযুত গোবিন্দপ্রসাদ বষু রাজা মহাশয়ের বাটীতে পৌছিয়া সাক্ষাত করিলাম ইতি ছালাবাক মোং হইতে রঙ্গপুর খুব্বীতে ছয় ক্রোষ পথ ইতি।—

আশুতোষ-কথা

[এই প্রবন্ধটি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আচার্য্য মহাশয়ের লিখিত। ১৩৩১ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'বঙ্গবাণী'তে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথা যখনই ভাবি তখনই মনে হয় যে, ইনি যদি কোন স্বাধীন দেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে একজন ক্লাম্যাঁসো হইতে পারিতেন, কেন না বাঙ্গালীর ক্ষুদ্রতর কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ইনি তাঁহারই মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ বীর্য্য ও অক্লান্ত শ্রম-সহিষ্ণুতার উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার বলিয়াছেন, আশুতোষের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি একটা সাম্রাজ্য শাসন করিবার যোগ্য। এই সম্পর্কে ইহাও বক্তব্য যে, ক্লাম্যাঁসোর সহিত তাঁহার মুখের আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল এবং ক্লাম্যাঁসো ও আশুতোষ উভয়েই পুরুষ-ব্যাঘ্র—এই সম্মান-জনক খ্যাতি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, আমার মনে হয়, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত পুরুষ আশুতোষ ছাড়া আর দেখা যায় নাই। এই জাতির উত্থান আশুতোষের মত জন-কয়েক নির্ভীক, একাগ্রতা-পরায়ণ, কৃত-বিদ্য ও শিক্ষা-ক্ষেত্রে সাধক পুরুষের আবির্ভাবে দেখা যায় ও এই জাতির জীবনী-শক্তির ক্রমোন্নতির উজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া যায়। আর সেই সকল আদর্শ যতই সমালোচনা করা যায়, ততই জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন করিবার পথ পরিষ্কার হয়। পর-পদলেহন না করিয়া কেবল আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া একজন বাঙ্গালীও একটা মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে, আশুতোষের ন্যায় জীবন তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে।

কোন বাঙ্গালীকে আশুতোষের মত সাধু চেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে যশোন্মুখী করিতে দেখা যায় নাই; তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিধাতা-পুরুষ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজ বা বাঙ্গালীর মধ্যে এমন একজনেরও

নাম করিতে পারি না, যিনি আশুতোষের মত নিজ পুরুষকার দ্বারা আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের এতটা উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা মান্দ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবা প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁহারা একটু বুঝেন যে, আমাদের আশুবাবু অনেক পরিমাণে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। এই (আজ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এত মৌলিক গবেষণা হইতেছে, এই যে কলিকাত বিশ্ব-বিদ্যালয় ভারতবর্ষীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার মূ রহিয়াছে আশুতোষের ঐকান্তিক সাধনা।

আমি সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার মধে একটা জিনিষ যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার হৃদয় শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়—যাহা তিনি ভাল বলি বুঝিতেন, তাহা সম্পাদন করিতে তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি ব্রাহ্মণে বেশে আপনাকে পরিচয় দেওয়া শ্লাঘার কথা মনে করিতেন; কিন্তু কর্ত্তব্য-বোধ দ্বার প্রণোদিত হইয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই এবং বর্ণ-ব্রাহ্মণের কন্যার সহি পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। অনেকেই জানেন, হায়! এইরূপ সমাজ-সংস্কারের জ তাঁহাকে কত সামাজিক নির্য্যাতনই না সহ্য করিতে হইয়াছিল!

আর একটি আনন্দের বিষয়, প্রতিভাশালী লোকের মধ্যে যেমন পানাসক্তি প্রভৃ দোষ অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, সে রকম কোনও দোষ আশুতোষে স্পর্শে নাই তিনি সম্পূর্ণরূপে বিলাস-বর্জ্জিত, স্নেহপূর্ণ হৃদয়, আদর্শ-গৃহস্থ ছিলেন। স্বদেশীয় আচার ব্যবহার তিনি চিরকালই শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন, কাহারও অনুরোধে তাঁহা মতামতের অন্যথাচরণ করেন নাই। কি উমেদার, দরিদ্র ছাত্র, কি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা— যিনিই কেন হউন না—তিনি প্রত্যেককেই সমান ভাবে গ্রহণ করিতেন। বাস্তবিকই, তি একজন প্রকৃত স্বজাতি-ভক্ত ও আড়ম্বর-শূন্য, উদার, চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন।

তবে কি তাঁহার কোন দোষ ছিল না? অবশ্যই ছিল। রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষে যে খুঁত ধরা যায় না এমন নয়। তিনি তো আর স্বর্গ হইতে দেবতারূপে অবতীর্ণ হ'ন নাই তবে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহার সামান্য যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, সে সমস্ত তাঁহা অসাধারণ গুণরাশির মধ্যে তলাইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে বলিয়া তাহার সৌন্দর্যে কে না মোহিত হয়? আশুতোষের সম্বন্ধে অমর কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়:—

"The elements so mixed in him that nature might stand up,
And say to all the world, 'This was a man'."

এক কথায় বলিতে গেলে, বর্ত্তমান যুগে ভারতের লুপ্ত গৌরব যে সকল ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে আশুতোষ অন্যতম।

আশুতোষ

[শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব-সম্বন্ধে "Representative Indians" নামক পুস্তকে যে সুদীর্ঘ, সারগর্ভ ইংরাজী প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার একাংশ অনুবাদ করিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে এখানে প্রকাশিত হইল।]

আশুতোষের চরিত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল,—সেগুলি উল্লেখ না করিলে তাঁহার চরিত-কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তিনি অতিশয় অনাড়ম্বরভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। একখানি অতি সাধারণ ধুতি এবং একটি খাটো কোট পরিয়া, স্যাড্‌লার কমিশনের সদস্যরূপে তিনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এমন কি হাইকোর্টেও তিনি দিনের কাজ সমাধা করিয়া, কোর্টের পোষাক ছাড়িয়া ধুতি পরিতেন। একখানি ধুতি পরিয়া এবং বিশাল স্কন্ধের উপর অবহেলার সহিত একটা চাদর ঝুলাইয়া তিনি যখন হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া খুব জোরে জোরে অবতরণ করিতেন, তখন উহা একটা দেখিবার বিষয় হইত। আশুতোষ যদিও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল উচ্চ সরকারী কাজ করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বাঙ্গালীর জাতীয় পরিচ্ছদকে সাহেবদের চক্ষে যতটা শ্রদ্ধেয় করিয়াছিলেন, ততটা আর কেহ করিতে পারেন নাই।

তিনি কঠিন শয্যা পছন্দ করিতেন, তদপেক্ষাও একটি কঠিন উপাধানের উপর শির রক্ষা করিয়া বেশ আরামে ঘুমাইতেন। স্যাড্‌লার-কমিশনের সদস্যরূপে তাঁহাকে বিভিন্ন প্রদেশের বড় লোকদের বাড়ীতে সম্মানিত অতিথি হইয়া থাকিতে হইত। তাঁহার জন্য বিলাসিতাপূর্ণ শয্যা-সম্ভারের আয়োজন হইত,—তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া মেঝের উপর সামান্য বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িতেন, ইহাতে সেই সকল প্রধান ব্যক্তিরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতেন। তিনি কখনও ধূমপান বা মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না, এমন কি পান পর্য্যন্ত খাইতেন না। একদা বিবাহ-উৎসবে কোন গৃহস্বামী পান খাওয়ার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিলে আশুতোষ একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমরা তিন পুরুষ এ জিনিষটা স্পর্শ করি নাই। আমাদের সুচিরাগত এই পারিবারিক সংস্কার ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন কেন?"

সামাজিক জীবনে তাঁহার আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না। তিনি গৃহস্থের নিমন্ত্রণ সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন; নিমন্ত্রণকারী যত ক্ষুদ্র ব্যক্তি হউক না কেন, তিনি তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। তাঁহার মৃত্যু-রোগের প্রাক্কালে তিনি পাটনায় তাঁহার মোটর-চালকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলেন। এই সকল

ছোট ছোট ব্যাপারে তিনি অহেতুকভাবে কাহারও মনে ব্যথা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু যখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে সত্য এবং ন্যায়পরতার জন্য দরকার হইত, তখন দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির ভ্রূকুটিতেও তিনি ভীত হইতেন না। সে সময়ে তিনি সিংহবিক্রান্ত হইতেন এবং কাহারও সাধ্য ছিল না যে তাঁহাকে দমন করে।

অতি শৈশব হইতেই আশুতোষ খুব ভোরে উঠিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যই নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল এবং তিনি ঘড়ির কাঁটার মত ঠিকভাবে কার্য্য করিতেন। রাত্রি ৪টার সময়ে তিনি ঘুম হইতে উঠিতেন এবং আর আধ ঘণ্টা পরেই কাজ করিতে বসিয়া যাইতেন। অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল শীতল প্রাতঃসমীরণের সংস্পর্শে থাকা দেহের পক্ষে ইষ্টজনক, এই হিতকর শিক্ষা তিনি তাঁহার দশম বৎসর হইতে পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য মৃত্যুর মাত্র দুই দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তিনি তাঁহার এই আজীবনের অভ্যাস নিয়মিতরূপে পালন করিয়া আসিয়াছিলেন।

তাঁহার পরিশ্রম করিবার শক্তি ছিল অদ্ভুত। প্রাতঃকালে তিনি হাইকোর্টের রায়, বিষয়ের বিবরণী, টীকা-টিপ্পনী এবং বহু পত্রের উত্তর কহিয়া লিখাইতেন। দুইজন টাইপিষ্ট্ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত,—এই গুরুতর কার্য্যে তাহাদের অবকাশ মাত্র থাকিত না। হাইকোর্ট হইতে তিনি প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেন এবং কোন কোন দিন অপর কোন প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া তৎপরিচালনা-সংক্রান্ত গুরুতর কার্য্যগুলি সমাধা করিতেন। বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া যাইত। সন্ধ্যার পরে আহারাদি করিয়া তিনি পুনরায় কাজ লইয়া বসিতেন এবং রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত কাজ করিতেন। এই সময়টা তাঁহার অধ্যয়নের জন্য নিয়োজিত ছিল। তিনি আলস্যকে দস্তুরমত মত ঘৃণা করিতেন এবং লোকে কি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, তাহা বুঝিতেন না। যে কোন কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাই সুচারুরূপে এবং সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিতেন। তিনি কখনও কাজ অসমাপ্ত বা অর্দ্ধ-সমাপ্ত করিয়া রাখিতেন না। আশুতোষ তাঁহার এরূপ বিচিত্র কার্য্যাবলী ও কর্ত্তব্যরাশি সম্পাদন করিতে কিরূপে সময় পাইতেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

অবিরত জল-স্রোতের মত দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ তাঁহার দ্বারে ছুটিয়া আসিত; সেই দ্বার সর্ব্বদা শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। এই মহামনা মনীষী ব্যক্তির উপদেশ ও সাহায্য পাওয়ার জন্য সর্ব্বশ্রেণী এবং সর্ব্ব অবস্থার লোক তাঁহার কাছে আনা-গোনা করিত। যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে কোন কায়দা বা বাহ্য ভদ্রতা দেখাইতে তিনি আদৌ ব্যস্ত হইতেন না; নামের কার্ড পাঠাইয়া দেখা করিবার কোন দরকার হইত না এবং ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি ব্যবহার-গত পার্থক্য বা পক্ষপাত তিনি দেখাইতেন না। তিনি সকলকে তাঁহার অভ্যস্ত মিষ্ট হাসি এবং সেই চিরপরিচিত চোখের ভঙ্গী সহ গ্রহণ

করিতেন, সেই হাসি এবং উৎসাহ-ব্যাঞ্জক চোখের ইসারায় তাহারা আশ্বস্ত হইত ও তাহাদের মনের কথা খুলিয়া বলিত। মাঝে মাঝে তাঁহার ব্যবহার বাহ্যতঃ একটু কঠোর ঠেকিলেও তাঁহার হৃদয় ছিল কোমল, সহানুভূতিপূর্ণ ও পরদুঃখ-কাতর। তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহৃদয় ও স্পষ্টবাদী ছিলেন, মিছামিছি আশা দিয়া কাহাকেও ঘুরাইতেন না। যদি তাঁহার দ্বারা কাহারও উপকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, তবে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ও সাধ্যমত তাহা করিতেন।

আশুতোষ রহস্য-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার হাসিটি যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা তাহা ভুলিতে পারিবে না। এক দিন রবিবার সায়াহ্নে দূর মফঃস্বল হইতে একটি ছাত্র তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল ; এই ছাত্রটি আশুতোষকে কখনও দেখে নাই। দৈবক্রমে সামান্য পরিচ্ছদ-পরিহিত আশুতোষ স্বয়ং সেই বারান্দা দিয়া তখন আসিতে-ছিলেন ; ইনি যে আশুতোষ হইতে পারেন, ইহা কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া বালকটি তাঁহাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি অশুবাবুর সঙ্গে কখন দেখা করিতে পারি ?" আশুবাবু বেশ আমোদ বোধ করিলেন এবং ছেলেটিকে বেঞ্চের উপর নিজের কাছে বসাইয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—সে কি জন্য আসিয়াছে এবং বলিলেন যে, তিনি 'আশুবাবুকে' খুব ভালরূপেই জানেন এবং তাহার কি দরকার, তাহা শুনিলে তাঁহাকে দিয়া সেই কাজ উদ্ধার করাইবার চেষ্টা করিবেন। বালকটি এই 'অপরিচিত ব্যক্তির' আগ্রহে বিশেষ কোন উৎসাহ বোধ করিল না এবং মাথা নাড়িয়া ধীরভাবে বলিল,—"আমি আশুবাবুর কাছে আসিয়াছি,—তাঁহার কাছে,—শুধু তাঁহারই কাছে আমার কথা বলিব।" আশুতোষ এই ব্যাপারে বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিলেন এবং নিজের কক্ষে ঢুকিয়া সেই বালকটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বালকটি সেই কক্ষে ঢুকিয়া সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে, সেই ব্যক্তিই হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কেদারাখানিতে বসিয়া আছেন। সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া, কিরূপে যে আশুতোষের নিকট ক্ষমা চাহিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া দিশাহারা হইয়া গেল। বালকটি জানু পাতিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলে আশুতোষ তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং মিষ্ট বাক্যে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত করিলেন। সে যাহার জন্য আসিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইল ; বস্তুতঃ তাহা ছাড়া আরও কিছু পাইল,—এক প্লেট্ মিষ্টান্ন তখনই সেখানে আসিল এবং সে স্বচ্ছন্দ মনে তাহা খাইল।

বাস্তবিক বঙ্গদেশে আশুতোষ অপেক্ষা ছাত্রগণের অধিকতর অন্তরঙ্গ বন্ধু কেহ ছিলেন না। তাহাদের প্রতি আশুতোষের প্রগাঢ় ভালবাসা এবং তাহাদের হিতার্থ তাঁহার পরম আগ্রহ ও যত্ন ছাত্রগণ বেশ উপলব্ধি করিত এবং এজন্য তাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি অনুরাগে আকৃষ্ট হইত। তাহারা তাঁহার নিকট শুধু পুস্তক ও

অর্থ-সাহায্যের জন্য আসিত না, সেরূপ সাহায্য তো তাহারা সর্ব্বদাই পাইত,—অধিকন্তু তাহারা কি ভাবে কাজ করিবে, তাহার উপদেশের জন্য সর্ব্বদা অপেক্ষা করিত। তাঁহার কর্ম্ম-বহুল জীবনের বিচিত্র কর্ত্তব্যগুলির মধ্যেও তিনি তাহাদের কথা শুনিবার জন্য অবকাশ করিয়া লইতেন। দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার বহু আশা ও আস্থা ছিল; তিনি অনেক সময়ে তাহাদিগকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিতেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি দৃষ্টান্ত-স্থলীয় :—"যদিও তোমরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার স্রোতে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত হইয়া আছ, তথাপি ভারতের সমুন্নত চিন্তা, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি এবং এদেশের আচার-ব্যবহারের মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তাহার প্রতি বিরূপ হইও না। পাশ্চাত্ত্য প্রখর আলোতে অন্ধ হইয়া এতদ্দেশের যে অমূল্য সম্পদ তোমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছ, তৎপ্রতি উপেক্ষাশীল হইও না। তোমরা পাশ্চাত্ত্য জগতের যাহা কিছু ভাল, তৎপ্রতি শ্রদ্ধাশীল অবশ্যই হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের জাতীয়তা ত্যাগ করিও না। তোমরা খাঁটি ভারতীয় লোক, একথা সর্ব্বদা স্বীকার করিতে দ্বিধা করিও না এবং পোষাক ও রুচির অভিমানের ক্ষুদ্রত্ব হইতে নিজদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিও। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, তোমাদের দেশের ভাষা যত্নের সহিত অনুশীলন করিবে, কারণ দেশীয় ভাষার সাহায্যেই তোমরা এ দেশের জনসাধারণের মন ছুঁইতে পারিবে এবং পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার রত্নরাজি তাহাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে।"

আশুতোষের স্মৃতি-শক্তি অতীব অসাধারণ ছিল। তিনি যে সকল লোক বহুবৎসর পূর্ব্বে একবারমাত্র দেখিয়াছেন, তাহাদেরও নাম-ঠিকানা আশ্চর্য্যজনকভাবে মনে রাখিতেন। ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার, যেহেতু অসংখ্য শ্রেণীর অসংখ্য লোক নিত্য তাঁহার গৃহে ভিড় করিত। তাঁহার পাঠাগার নানা-বিষয়ক, অসংখ্য পুস্তকে পূর্ণ ছিল, তিনি কখনও তাহাদের 'ক্যাটালগ্' প্রস্তুত করেন নাই। তাঁহাকে বাড়ীতে এই সকল পুস্তকের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে দেখা যাইত—এই পুস্তক-রক্ষার কোন শৃঙ্খলা ছিল না, কিন্তু তথাপি তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ তাঁহার মনের ভিতরে ছিল। তিনি কেবল আড়ম্বর দেখাইবার জন্য সেগুলি সংগ্রহ করেন নাই, তিনি সর্ব্বদা পুস্তকগুলির যথোচিত ব্যবহার করিতেন। তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে সে সমস্ত পুস্তক সাজাইয়া রাখিতেন; অনেক সময় তাহারা তাঁহার আবাস-গৃহের সম্ভবপর প্রত্যেক কক্ষে ও কোণে বিক্ষিপ্ত থাকিত, তথাপি তিনি নিজে জানিতেন তাহাদের কোন্‌টি কোন্ খানে আছে।

আশুতোষের বন্ধুরা সর্ব্বদা তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন, তিনি তাঁহাদের অখণ্ড বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের উপকারের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহাদের কেহ বিপদে পড়িলে, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কোন চেষ্টাই বাকি রাখিতেন না। তবে এটাও বলা উচিত, প্রকৃত কারণে তাঁহার বিদ্বেষ জন্মিলে, তাহা সহজে দূর

হইত না। কিন্তু তিনি প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিলেন না। তাঁহার ঘোরতর শত্রুও যদি বিপদে পড়িয়া দ্বিধাশূন্য-ভাবে তাঁহার সাহায্য চাহিতেন এবং অকপটে তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতেন, তবে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তিনি স্বেচ্ছাতন্ত্রী ছিলেন। তিনি যেরূপ অবস্থায় ছিলেন, তাঁহাকে অনেক সময় এমনভাবে কাজ করিতে হইত, যাহাতে লোকে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু যদি একথা কেহ বলেন যে, তিনি লোকের স্বাধীনতা পছন্দ করিতেন না, এবং আলোচনা-কালে স্বাধীন মত ব্যক্ত করার পক্ষে বিরোধী হইতেন, তবে তাহা ঘোরতর অন্যায় হইবে। সমস্ত গুরুতর বিষয়ই খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হইবার পর তাহা সভায় উপস্থিত করা হইত এবং সভার পূর্ব্বে এই যে আলোচনা হইত, তাহাতে সকলেই যা'র যা'র মত কোন কুণ্ঠা না রাখিয়া, সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেন। এই আলোচনা-কালে আশুতোষ নিরপেক্ষ-ভাবে, ধীরতার সহিত সকলের কথা শুনিতেন। কিন্তু এইভাবে একটা বিষয় সম্যক্‌রূপে আলোচিত ও সুচিন্তিত হইবার পর তাঁহার যে মত হইত, তাহা সুদৃঢ় হইত এবং তিনি তাহা সহজে নড়চড় করিতে চাহিতেন না। কিন্তু যদি তৎসম্বন্ধে কোন নূতন ঘটনা বা অবস্থা উপস্থিত হইত, তবে তিনি তাহার পুনর্বিচারে সম্মত হইতেন। তিনি যে সকল গুরুতর প্রস্তাবনা সম্পাদন করিবার ভার লইতেন, তাহা বাদ-প্রতিবাদ-মুখর সভায় ঘোর বিরুদ্ধতার মুখে সফল করিবার পক্ষে তাঁহার এইরূপ বিচার-বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত কোন অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয়ে অবহিত থাকিতেন এবং সভা-গৃহে আর একটি দুর্লভ গুণের পরিচয় দিতেন, যাহা অতি অল্প লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি নিজের মনোভাব সম্যক্‌রূপে জানিতেন এবং অপর সকলের নিকট তিনি কতটা প্রত্যাশা করিতে পারিতেন, তাহার সম্বন্ধে ধারণাও তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল। এই উচ্চ অভিজ্ঞতা তিনি অতি সুকঠোর কার্য্য সম্পাদন-কালে অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অপরাপর স্বাভাবিক গুণের সহযোগে ইহা তাঁহাকে মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব এবং নেতাদের মধ্যে তাঁহাদের দল-পতির গৌরব দিয়াছিল।

আশুতোষ বিলাতে যান নাই। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেকোপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীর প্রতিনিধি-স্বরূপ বিলাত যাইবার জন্য তাঁহার নিকট লর্ড কার্জ্জনের নিমন্ত্রণ আসিল। এ বিষয়ে তাঁহার মাতৃদেবী ঘোরতর আপত্তি করিলেন, সুতরাং মাতার আদেশ লঙ্ঘন করা আশুতোষের পক্ষে অসম্ভব হইল। লাট কার্জ্জন্ আশুতোষকে সাক্ষাতে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি কেন তাঁহার আদেশ পালন করিতে বিলাতে যাইতে পারিবেন না, তাহার হেতু দেখাইয়া যখন আশুতোষ সকল কথা বলিলেন, তখন লাটসাহেব বলিলেন—"আপনি যান, আপনার মাতাকে যাইয়া বলুন যে,

ভারত-সম্রাটের প্রতিনিধি, সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল তাঁহাকে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।" আশুতোষ তিলার্দ্ধ না ভাবিয়া উত্তর দিলেন,—"তাহা হইলে আমি আমার মাতার পক্ষ হইতে জানাইব যে, তিনি তাঁহার পুত্রের উপর আদেশ করিবার অধিকার, তিনি ভিন্ন আর কাহারও আছে, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করেন না।"

যদিও তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং অপরাপর সম্ভ্রান্ত গৃহের ন্যায় তাঁহার বাড়ীতেও ধর্ম্মের নানারূপ উৎসব রীতিমত নির্ব্বাহিত হইত, তথাপি তিনি সমাজ-সংস্কারে আগ্রহশীল ছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বালবিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই কার্য্যে আমরা তাঁহার দুর্জ্জয় সাহসের পরিচয় পাই, এই কার্য্যের ফলে তাঁহাকে অনেক শত্রুতা ও সামাজিক নিপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কন্যাটি এক বৎসরের মধ্যে পুনরায় বিধবা হইলেন। আশুতোষ অতিশয় আত্মসংযমী ছিলেন, তিনি বাহিরে তাঁহার নিদারুণ চিত্ত-ক্ষোভের কোন পরিচয় দেন নাই। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহার তৎকাল পর্য্যন্ত পারিবারিক জীবনের উপর ঘোর দুঃখের ছায়াপাত করিয়াছিল। তিনি কন্যাটিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং কন্যাও তাঁহার প্রতি তেমনই অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার স্নেহময়ী কন্যার দুঃখ-ভার হ্রাস করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই বালিকা তাঁহার পূর্ব্বেই শান্তিপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় ধামে চলিয়া গেলেন এবং এই শোক আশুতোষের হৃদয়ে যে তীব্র আঘাত দিয়াছিল, তেমন আঘাত তিনি জীবনে আর পান নাই। ১৯২৪ সনে, স্বীয় মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার স্মৃতি তাঁহার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত অর্থ-প্রদান করিয়া তাঁহার কন্যার নামে 'কমলা-বক্তৃতা'র ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীবনে তাঁহারা একত্র ছিলেন এবং মৃত্যুও তাঁহাদিগকে বেশী দিন বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারে নাই। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ য়্যানি বেশান্ত প্রথম 'কমলা-লেক্‌চারার'-স্বরূপ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে আশুতোষ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

আশুতোষের চরিতাখ্যান ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক কি ভাবে লক্ষ্য করিবেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। এখনও তিনি আমাদের নিকটবর্ত্তী, তাঁহার বহুধা-বিভক্ত, বহুলক্ষ্যে ধাবিত কর্ম্মজীবনের ধারা ঠিক উপলব্ধি করিবার সময় এখনও আসে নাই। তিনি তাঁহার সমকালীন স্বদেশবাসীদের মনের উপর বহু কার্য্য-সূত্রে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রভুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের পরিচয় সমভাবে দৃষ্ট হয়। "এইটিই তাঁহার প্রতিষ্ঠার প্রধান বিষয়",—এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিবার সময় এখনও হয় নাই। সাহসিক উদ্যম, দৃঢ় সঙ্কল্প, অপূর্ব্ব মনস্বিতা ও চরিত্রবল প্রভৃতিগুণে তিনি সেই সব দিকপালদের পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য, যাঁহারা বৃহৎ ও খণ্ড রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সার মাইকেল

স্যাড্‌লার সত্য সত্যই তাঁহার সম্বন্ধে কহিয়াছিলেন—"তাঁহার মৃত্যুতে পৃথিবী এমন একটি মহামানব হারাইয়াছে, যিনি একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিতেন।" ভারতবর্ষের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে তিনি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা জন-শিক্ষার দিকেই প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি জানিতেন যে, প্রকৃত শিক্ষাই মনুষ্য-জাতির পরম ইষ্টের সহায় এবং সাম্রাজ্যের প্রবলতম শক্তি। আশুতোষ তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্পের যাদু-কাঠি দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং সেই স্পর্শে ইহা বাঙ্গলার জীবনের সম্যক্ অভিব্যক্তি-স্বরূপ জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার যোগ্য হইয়াছিল! প্রাচীন জগতের সুবিখ্যাত কর্ম্ম-বীরগণের পংক্তিতে তাঁহার স্থান, তিনি তাঁহাদেরই গোত্র,—কার্য্যতৎপরতায় তাঁহাদেরই শ্রেণীভুক্ত, তাঁহাদের অদম্য, শুভ্র জ্বালাময়ী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, তাঁহাদেরই মত অসংহত গতি-বিশিষ্ট, তাঁহাদেরই মত স্বীয় বিরাট্ শক্তির উপর আস্থা-সম্পন্ন, তাঁহাদেরই মত অসীম ও ক্লান্তিহীন কর্ম্মতৎপর এবং তাঁহাদেরই মত দুর্দ্দমনীয় প্রতিকূলতায় নির্ভীক ও ধৈর্য্যশালী। কোন মহৎ বিষয়ের পরিকল্পনায় যে চির-উর্ব্বর উদ্ভাবনী শক্তি পরাজয়েও শুধু সাহস উদ্বোধন করে, বাহুকে অসম-সাহসিক কার্য্যের জন্য বল-দৃপ্ত করে এবং কোন কার্য্যই অসম্ভব বলিয়া কুণ্ঠার উদ্রেক করে না,—চিত্তের সেইরূপ শক্তিতে ও বাহু-বলে আশুতোষের সমকক্ষ প্রায় কাহাকেও এ যুগে দেখা যায় না। তাঁহার ধারণায় মানুষই কর্ত্তা,—সে অবস্থার দাস নহে। যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, তিনি গঠনকারী একটি বিরাট্ প্রতিভা, তিনি ভাগ্যের স্রষ্টা, এবং জাতি ও সমাজের ভবিষ্যতের নিয়ন্তা।

তাঁহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দুই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল,—এক দিকে তিনি ছিলেন কর্ম্ম-বীর, অপর দিকে ভাব-প্রবণ ও কল্পনাশীল; কিন্তু তাঁহার এই দুই বিভিন্ন গুণ পরস্পর বিরোধী হয় নাই। সচরাচর কর্ম্ম ও কল্পনা—এই দুই বিভিন্ন গুণ জীবনে পরস্পরের প্রতিকূল বলিয়া মনে করা হয়; কিন্তু আশুতোষের চরিত্রে কর্ম্ম ও কল্পনা, দুই ভগিনীর মত পরম ঐক্যের সঙ্গে একত্র কার্য্যকরী হইয়াছিল। যাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহাদের নিকট আশুতোষ প্রচণ্ড ও অফুরন্ত কর্ম্ম-শক্তির একটি আবাস-স্বরূপ; কিন্তু অতি অল্প লোকেই জানিতেন যে, তিনি স্বপ্ন-রাজ্যের লোক এবং এক সুমহান্ স্বপ্নদ্রষ্টা। জীবনের নিভৃত কক্ষে তাঁহাকে একক দেখিবার যাঁহাদের সুবিধা ছিল, তাঁহারা জানিতেন যে, কর্ম্মের অবসর-কালে কোনও কোনও শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার দুইটি তেজোময় চক্ষুতে অপূর্ব্ব ভবিষ্য-দৃষ্টির সুন্দর জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত এবং সেই সেই মুহূর্ত্তে তিনি আত্মহারা হইয়া যেন অজ্ঞাতসারে কল্পনা-রাজ্যে গা ঢালিয়া দিয়া আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। যিনি তাঁহার এই স্বল্পকাল-স্থায়ী ভাবাবেশ দেখিয়াছেন,—তিনি বুঝিয়াছেন যে, আশুতোষ এই স্থানেই

খাঁটি ভারত-সন্তান। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কি এই ধ্যানশীলতাই আমাদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার, আমাদের পরম গৌরব ও শ্লাঘার বিষয় হয় নাই? এই ধ্যানই কি জগতের সভ্যতায় ভারতের বিশিষ্ট দান নহে? কিন্তু আশুতোষ বাস্তব রাজ্যের সম্পর্ক-বিরহিত বৃথা কল্পনাশীলতার পরিচয় দিতেন না। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক অথবা উন্মাদের মত শুধুই কল্পনা-সমাশ্রিত ছিলেন না। ম্যাথিউ আর্নল্ড্‌ কবি শেলির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তিনি ছিলেন এক দিশাহারা সুন্দর দেবতা, তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় পক্ষপুট বৃথাই শূন্যের উপর বিস্তার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল।" একথা আশুতোষের উপর প্রয়োজ্য হয় না। রবীন্দ্রনাথ আশুতোষের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তিনি যে সকল স্বপ্ন দেখিতেন, তাহা সংস্কার-ক্ষেত্রে বুঝিয়া তিনি সফল করিতে পারিতেন,—তাঁহার স্বক্ষমতার উপর এতটা প্রত্যয় ছিল যে, তিনি বিজয়ী হইবেন,—ইহা জানিয়াই তিনি কর্ম্মের পরিকল্পনা করিতেন, তাঁহার সঙ্কল্পগুলি কৃতকার্য্যতার পথ-স্বরূপ ছিল।"

সাধারণতঃ আশুতোষের সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হয়, তাহাতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রের এই দিকটার প্রতি কেহ লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু এ কথাটা নিশ্চয়ই মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার বাস্তব জগতের সমস্ত প্রস্তাবনাই এই ধ্যানশীলতা হইতে প্রেরণা পাইয়াছিল। এই ধ্যানশীলতা হইতে তাঁহার চরিত্রের আর একটা মহৎ দিকের বিকাশ হইয়াছিল,—যাহা তাঁহার অসীম কর্ম্ম-শক্তি ও বহু-ব্যাপক কার্য্য-ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাকে অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মঠতার ক্ষমতা যোগাইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের সেই মহৎ দিকটা হইতেছে—জগতের শুভ দিকটার উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস। এই যে প্রতি কার্য্যে শুভ দিকটার উপর তাঁহার বিশ্বাস, তাহা কেদারায় আরামে উপবিষ্ট, সৌখীন দার্শনিকের মত আদৌ নহে। এইরূপ কল্পনা-বিলাসী দার্শনিক সর্ব্ব বিষয়েই পরম নিশ্চিন্ত, অনাসক্ত এবং কিছুর জন্যই উদ্বিগ্ন হ'ন না, বরং বইএর মুখস্থ-করা গৎটি তৃপ্তির সহিত আবৃত্তি করিয়া বলেন—"ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, সুতরাং পৃথিবীর সবই ঠিক ভাবে আছে ও চলিবে।" আশুতোষ যদিও তাঁহার মহৎ কার্য্যের প্রারম্ভে ঘনঘটার মধ্যেও দুই একটি রজত-রশ্মি দেখিয়া উৎসাহিত হইতেন, কিন্তু তিনি আকাশ-ব্যাপী, পুঞ্জীভূত মেঘ-সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতেন না। জগতে এরূপ লোকের সংখ্যা বেশী নহে, যাঁহার উপর জনসাধারণ নির্ভর করিতে পারে, যাঁহার আশ্রয়ে তাহাদের আশা-ভরসা সিদ্ধ হইতে পারে এবং যিনি সর্ব্ব সময়ে বজ্র-নির্ঘোষে বলিতে পারেন,—"ভয় নাই, যাহা দরকার, করা হইবে।" আশুতোষ এইরূপ আশ্বাস দেওয়ার যাদুমন্ত্র জানিতেন। তাঁহার আশা ও ভবিষ্য সফলতার উপর বিশ্বাস এরূপ প্রবল ছিল যে, সেই বিশ্বাসের জোরে বুঝি পর্ব্বতও নড়িয়া যাইত। যখন ঝড়ের বেগ দুর্জ্জয়, তখন মাঝি তাঁহার নঙ্গর ফেলিতে জানিতেন। যে লোক একান্ত ভাব-দরিদ্র, আক্ষেপশীল ও সর্ব্বদা নতশির, নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য যাহারা

অদৃষ্টবাদ অথবা দার্শনিক উপেক্ষার ভান করে, সেই সকল লোককে আশুতোষ অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি তাঁহার মৃতকল্প দেশ-বাসীর অসাড় দেহ মৃত-সঞ্জীবনী অমৃত দ্বারা উজ্জীবিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সেই অমৃতপায়ী ছিলেন। বিবেকানন্দের যে ধর্ম্ম, তাঁহারও তাহাই ছিল,—ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা এবং মানুষের সেবা। একথা আশুতোষ-সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত সত্য যে, কোন বিপদই তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত এবং ললাট তমসাচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতিতে চির-প্রসন্নতা বিরাজিত ছিল, এই প্রসন্নতা সর্ব্বত্যাগীর কঠোর সাধনালব্ধ প্রসন্নতা—যিনি অনুভব করিয়াছেন যে, জয়-পরাজয় কিছুই নাই, পরাজয়ের প্রকৃত অর্থ জয়। যখন তিনি গত জীবনের একটা হিসাব-নিকাশ করিতে বসিতেন,—তিনি কি করিয়াছেন এবং এখনও কি করিতে বাকি আছে—এ সকল কথা আলোচনা করিতেন, তখন তাঁহার মন উৎসাহ-চঞ্চল হইয়া উঠিত, কর্ম্ম-শক্তি দ্বিগুণ উদ্বুদ্ধ হইত, তিনি দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছার বেগ সামলাইতে পারিতেন না এবং আশঙ্কা করিতেন, পাছে তৎকৃত জীবনোৎসর্গ ভগবানের নিকট অযোগ্য বলিয়া উপেক্ষিত হয়।

জীবনের পর জীবন পুঞ্জীভূত হইলেও তাঁহার দুর্ব্বার সেবাধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর হইত। হায়, একটি মাত্র জীবনের অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল! যদি তিনি আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে তিনি আর কোন্ কোন্ গৌরব-জনক কর্ম্মে লিপ্ত হইতেন, এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে দৃঢ়তর যোদ্ধৃবেশে আর কোন্ বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের ভবিষ্যতের বহু অচরিতার্থ আশা-ভরসা লইয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে।

স্মৃতি-সভায়

[আশুতোষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কৃষ্ণনগরে তাঁহার যে শোক-সভা হয়, তাহার সভাপতি-স্বরূপ গ্রন্থকার নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন,—ইহা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।]

সিংহ ছাড়িয়া গেলে গহ্বরটি যেরূপ দেখায়, পাখী ছাড়িয়া গেলে খাঁচাটি যেমন পড়িয়া থাকে, দ্বারভাঙ্গা বিদ্যা-মন্দিরের আজ সেই অবস্থা। যে মহাশূন্যতা দ্বারভাঙ্গা মন্দিরে দেখিলাম, সে দিন শ্যামাপ্রসাদের মুখেও সেই মহাশূন্যতার আভা দেখিয়া চমৎকৃত

হইয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের অভাব যে কত বড় বিরাট্, তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে সময় লাগিবে। টোকিওর ভূমিকম্পের পর ক্ষতির পরিমাণ অনুভব করিতে জাপানের অনেক দিন লাগিয়াছিল।

প্রথমতঃই আমাদের বজ্রদগ্ধ, আড়ষ্টপ্রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে পড়ে। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়টি যেভাবে গড়িয়া তুলিতে কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই কল্পনার পরিণতি দিবার শক্তি আর কাহার আছে? অর্জ্জুন গাণ্ডীব ফেলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে জ্যা দেওয়ার যোগ্যতা আর কাহার বাহুতে আছে? নারদের বীণায় স্বর্গীয় সঙ্গীত নারদ ভিন্ন কে জাগাইবে?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাশালা ছিল তাঁহার মানসী কন্যা, তাঁহার প্রাণের শোনিতে এই বিদ্যাশালা পুষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব বিজয়শ্রী ধারণ করিয়াছিল। বঙ্গীয় ভারতী আর কাহার বাহু আশ্রয় করিয়া বঙ্গদেশে দাঁড়াইবেন? বঙ্গের সরস্বতী-পূজা বুঝি প্রকৃত পক্ষে এখন হইতে উঠিয়া গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়টি তিনি ভারতবর্ষের মূল বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, এখানে বিদ্যার তিনি যে সমারোহপূর্ণ উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে পৃথিবীর সর্ব্বজাতির ডাক পড়িয়াছিল। এই বিশ্ব-বিদ্যালয় হইবে প্রাচ্যবিদ্যার মহাকেন্দ্র, এই ছিল তাঁহার সংকল্প। নানারূপ অভাব-অভিযোগ, দ্বেষ-হিংসা ও অন্তরায়কে অগ্রাহ্য করিয়া,—তর্জ্জনী-হেলনে নিরস্ত করিয়া আমাদের এই বিদ্যাপীঠ তাঁহার আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। প্রাচীন কীর্ত্তি-উদ্ধার ও প্রাচ্য ভাষার অনুশীলনের জন্য তিনি পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত-মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। রুষিয়ার স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি পল ভিনোগ্রেডফ্ এই নিমন্ত্রণে এখানে আসিয়াছিলেন। ফরাসীর প্রাচ্যবিদ্যার শিরোমণি সিলভ্যান্ লেভি, জার্ম্মাণির উইণ্টারনীজ ও ওল্ডেনবার্গ, বিলাতের প্রাচ্য-বিদ্যার কল্পতরু টমাস প্রভৃতি কত দেশেরই পণ্ডিতগণ আশুতোষের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁহাদের পদ-রজঃ দিয়া গিয়াছেন! এদিকে অধ্যাপকগণের মধ্যে জাপানী, চৈনিক, দ্রাবিড়ী, সিংহলীজ, মারহাট্টা, টিবেটান প্রভৃতি নানা দিগ্‌দেশাগত পণ্ডিতেরা তো আমাদের বিদ্যাপীঠ অবিরত কলরবে মুখরিত করিতেছেন। কন্‌ভোকেশনের সময় সে কি দৃশ্য! কাহারও উষ্ণীষে রামধনুর বর্ণ খেলিতেছে, কাহারও কৃষ্ণ-টুপি মন্দিরের চূড়ার মত উঁচু হইয়া আছে, অপর দিকে পার্ব্বত্য লামার রোমাবৃত শিরোভূষণের পার্শ্বদেশ চুম্বন করিয়া সিরাজাগত মৌলভির প্রকাণ্ড পাগড়ীর স্বর্ণখচিত রেখাগুলি দেখা যাইতেছে। আমাদের এই বিদ্যাশালাকে তিনি সর্ব্বজাতির মিলন-স্থান জগন্নাথ-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। দ্বারভাঙ্গা-গৃহে যেদিন তাঁহার প্রস্তর-

মূর্ত্তি উন্মোচিত হয়, তখন বাঙ্গলার লাট কারমাইকেল সাহেব বলিয়াছিলেন—"কোন একটা জিনিষকে বিরাট্ কল্পনায় আয়ত্ত করিবার শক্তি আশুতোষের আছে, কিন্তু সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি অনেকের নাই, আশুতোষের তাহাও আছে।" একাধারে কবি ও সাধকের ন্যায় বিরাট্ কল্পনা, অপর দিকে মহাকর্ম্মীর বিশাল কার্য্য-কুশল বাহুর শক্তি—এই দুই গুণের অপূর্ব্ব মিলনে আশুতোষ বরেণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সমকক্ষ কেহ জগতে আছেন কি-না, তাহা আমরা জানি না।

শত শত ভূর্জ্জপত্র ও প্রাচীন কাগজে লিখিত পুঁথি তিনি সমস্ত এসিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়া আসিতেছিলেন। অসংখ্য তিব্বতীয় পুঁথি, জাপানী পুঁথি, ৭০০০ বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথি, দ্বারভাঙ্গা-গৃহের কোণায় কোণায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের জন্য আলমারী তৈয়ারি হইতেছে। ইহা ছাড়া কত যে বিরল, বহুমূল্য পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, ইজিপ্টের প্রাচীন মূর্ত্তির ছবি, কত দেশের মানচিত্র, অতি দুর্লভ সংস্কৃত পুঁথি যে কত, তাহার অবধি নাই। প্রাচ্য বিদ্যা-শিক্ষার্থীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে হইবে, এইখানে না আসিলে তাহার শিক্ষা পূর্ণ হইবে না, এইভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়টিকে গড়িয়া তোলা ছিল তাঁহার সংকল্প। কেবল অধ্যাপক নহে, তাঁহার উদার সার্ব্বভৌমিক আমন্ত্রণে সাড়া দিয়া কত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে কত ছাত্র কলিকাতায় আসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা গণনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

তিনি ইহার মধ্যেই প্রাদেশিক ভাষা-অনুশীলনের যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। কেহ যদি ভারতীয় কোন প্রাদেশিক ভাষায় তুলনা-মূলক চর্চ্চা করিতে চান, তবে এই স্থানে নানা দেশীয় অধ্যাপক ও ছাত্র-মণ্ডলীর সহিত আলোচনা করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন, পৃথিবীর অন্য কোথায়ও তিনি সে সুবিধা পাইবেন কি-না সন্দেহ।

আশুতোষের শত শত সমালোচক ছিল। কিন্তু বাজারে সমালোচকের অভাব কোন কালেই হইবে না। আমরা আর একটি মাত্র স্যার আশুতোষ চাই, কালে হয়ত বাঙ্গালী জাতি টিকিয়া থাকিলে আমরা তাঁহার মত আর একজন পাইতে পারিব, কিন্তু সে ৩০০, কি ৪০০ বৎসর পরে, তাহা কে বলিবে?

আমাদের নিগৃহীত বঙ্গভাষাকে তিনি উচ্চ শিক্ষার কক্ষে স্থান দিয়াছেন। সে দিন পর্য্যন্তও তো বিলাত-ফের্ত্তা কোন কোন বাঙ্গালী তাঁহার ছেলেরা বাঙ্গলা জানে, একথা শুনিলে লজ্জিত হইতেন, আয়া রাখিয়া তাহাদিগকে হিন্দী শিখাইতেন। উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রে এই অবজ্ঞাত বঙ্গভাষাকে তিনি অতি সাবধানে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। পাছে সহসা এই ভাষাকে অনেকটা অধিকার দিলে প্রবল প্রতিপক্ষীয়েরা

ইহাকে অঙ্কুরে উপড়াইয়া ফেলে—এই ভয়ে শনৈঃ শনৈঃ তিনি ভয়ে ভয়ে ইহার জন্য দ্বার মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। চৌদ্দ-পনের বৎসর যাবৎ এম্, এ,-পরীক্ষায় বাঙ্গলাকে চালাইবার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলাম। তিনি তাঁহার বিরাট্ গোঁফ স্ফীত করিয়া গর্জ্জনপূর্ব্বক বলিতেন—"তোমার বাঙ্গলা আবার একটা ভাষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্দ্ধতম শ্রেণীতে তাহাই পড়াইতে হইবে—শোন কথা!" কিন্তু এই বাহ্য তর্জ্জনের সুরের মধ্যে কোথায়ও একটা অনুরাগের তান ছিল, সুতরাং আমি প্রহেলিকা সমাধান করিতে না পারিয়াও একেবারে নিরুৎসাহ হই নাই। হঠাৎ ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমার ডাক পড়িল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"দীনেশ-বাবু, এইবার এম্, এ,-তে বাঙ্গালাভাষা চালাইব, সিলেবাস তৈরি করুন, এগুারসনকে চিঠি লিখুন, তাঁহার এ সম্বন্ধে কোন মতামত আছে কি-না?" আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম—"হঠাৎ মত-পরিবর্ত্তনের কারণ কি?" তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—"ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, যুদ্ধ করতে যাবেন! আপনাকে দিয়া এই ৪।৫ বৎসর যাবৎ যে 'বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যে'র ইংরাজী ইতিহাস লিখাইয়াছি, 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়' ও 'বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস' লিখাইয়াছি, দাশগুপ্তকে দিয়া সপ্তদশ 'শতাব্দীর বাঙ্গলা' প্রভৃতি বই লিখাইয়াছি, তাহার মানে জানেন না। এই বইগুলি না থাকিলে এম, এ, পরীক্ষার্থীদের কি পড়াইব? আপনারা যতক্ষণ সোর-গোল করিয়াছেন, আমি ততক্ষণ জমি তৈরি করিয়াছি।"

তখন বুঝিতে পারিলাম, আমরা জগন্নাথের রথের চাকা মাত্র, কেবল ঘুরিয়া গিয়াছি,—কেন ঘুরিয়াছি, তাহা একমাত্র পরিচালকই জানিতেন।

বিজ্ঞান-শালার বিরাট্ কারখানা ও মন্দিরগুলি যাহা আমাদের অতি-দুঃসময়েও আশুতোষের সংকল্পের বলে,—যাদুকরের কাঠির স্পর্শে রাজপ্রাসাদের ন্যায় গড়িয়া উঠিয়াছে, এই বিরাট্ বিজ্ঞান-শালার সে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঘোর অনাবৃষ্টির দিনে হোতা-ঋষিদের মন্ত্রোচ্চারণের ফলে অজস্র বর্ষণের ন্যায় তাঁহারই মানসিক শক্তি ও প্রবল অনুরাগের ফলেই তো বঙ্গীয় বিজ্ঞান-ভারতীর পাদপদ্মে অজস্র অর্ঘ্য বর্ষিত হইয়াছিল। সে তো আশুতোষের উপর অলজ্ঘ্য, অনন্ত আস্থার ফলে—নতুবা এত অর্থ কে দিত? হায়, আজ আমাদের সকল দিকই যে আঁধার! কে আজ ফ্যাকাল্‌টীসমূহের ডিন্ হইবেন? বোর্ডগুলি পরিচালনা কে করিবেন? উচ্চশিক্ষার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রেসিডেণ্ট কে হইবেন? দিনে বিশটা-পঁচিশটা সভা কে চালনা করিবেন? কাহার ক্ষুর-ধার বুদ্ধিতে বিরুদ্ধবাদীর প্রতিকূলতার নিরসন হইবে? আমরা তো চিরকাল ঘুমাইয়া আসিয়াছি, এক ব্যক্তি সচেষ্ট, সজাগ ও অক্লান্তকর্ম্মা ছিলেন—এই ভরসায়। এখন কে আমাদিগের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিবে? জাগিয়া যে দেখিব কেওড়াতলার মহাশ্মশান!

বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়িয়াও তো হাইকোর্টে তাঁহার বিশাল কর্ম্মশীলতার আর একটা কেন্দ্র ছিল। সেখানেও আজ মহাশূন্যতা বিরাজ করিতেছে। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, তিনি উৎকৃষ্ট বিচারপতি ছিলেন,—কিন্তু শুধু উৎকৃষ্ট বিচারপতি বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়, তিনি শিক্ষার অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন,—কিন্তু শুধু শিক্ষার নেতা বলিলে যাহা বুঝায়, তিনি তাহা হইতে অনেক বড় ছিলেন,—তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, শুধু সেদিক দিয়া দেখিলেও তাঁহার সকল দিকটা দেখা হয় না,—তিনি ছিলেন একটা জাতিকে গড়িয়া তুলিবার বিশ্বকর্ম্মা। কোন্ দিকেই বা তাঁহার দৃষ্টি ছিল না! কোন্ দিক সামলাইবার জন্যই বা তাঁহার হস্ত প্রসারিত হইত না! একবার কীর্ত্তনীয়াদিগকে পুরস্কৃত করিবার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করিতেছিলাম। চিত্তরঞ্জন দাশ, অতুল গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন একত্র হইয়া চাঁদা উঠাইবার সঙ্কল্প চালাইতেছিলেন। আশুতোষ আসিয়া সেই সভার সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইলেন। জাতিকে নানা দিক দিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি বিশ্বকর্ম্মার মত হাতুড়ী লইয়া সতত প্রস্তুত ছিলেন। এই বঙ্গদেশে আশুতোষের কৃপায় যেরূপ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে তাহা কল্পনাতীত। যাহারা তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া পড়া সাঙ্গ করিয়া নানা খেয়ালে জীবন নষ্ট করিত, আশুতোষ-সরস্বতীর মুক্ত তোরণে প্রবেশ লাভ করিয়া বি, এ, এম্, এ, পাশ করিয়া তাহারা কৃতী হইয়াছে। তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়া মূর্খের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইত মাত্র। 'আশুতোষের অক্ষৌহিণী' আজ বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত করিয়াছে। উচ্চ শিক্ষার এই বিশাল বিভাগে কি বাঙ্গালী লাভবান্ হয় নাই? আজ যদি কোন উচ্চ লক্ষ্য অনুসরণ করিবার জন্য এ দেশের সর্ব্ব জাতির ডাক পড়ে, তবে বাঙ্গালী যতগুলি শিক্ষিত লোক জোগাইতে পারিবে, ভারতীয় আর কোন্ প্রদেশ তাহা পারিবে?

এই পুরুষবরের বিরাট্ মনস্বিতা, কর্ম্মকুশলতা, অকুতোভয়তা, অক্লান্ত শ্রমশীলতা—সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন; কিন্তু যেরূপ হরিদ্বারে না আসিলে আদি-গঙ্গা দেখা যায় না, সেইরূপ ইঁহার সান্নিধ্যে না আসিলে, ইঁহার হৃদয়ের শতধারে মুক্ত দয়ার প্রস্রবণ টের পাওয়াও সম্ভব হইত না। যখন কোন দুঃখী ব্যক্তি নিজের অভাব-অভিযোগের কাহিনী ইঁহাকে বলিতে থাকিত, তখন ইঁহার চক্ষু সজল হইত। বাঙ্গালী জাতির কত দুঃখ, কত কষ্ট, দারিদ্র্য ও রোগ-শোক জনিত শত দুঃখে বাঙ্গালী জর্জ্জরিত,—এই দুঃখ বলিবার একটা স্থান ছিল, তাই ক্ষুদ্রতম আফিসের কেরাণী হইতে বিপন্ন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা সকলেই ভবানীপুরে যাইতেন। প্রাণের দুঃখ শুনিবার জন্য—প্রাণের বেদনা বুঝিবার জন্য সেখানে একটা মহান্ প্রাণ ছিল, দুঃখীরা সে কথা অন্তরে জানিয়াই তাঁহার দুয়ারে ভিড় করিত। তিনি অনেক সময় কঠোর কথা বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে চাহিতেন; কিন্তু তাহাদের ছেঁড়া কাপড়, অন্নাভাব, শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়ার উপায়হীনতা,

অত্যাচারী-কৃত লাঞ্ছনা প্রভৃতি শত দুঃখ যে তাঁহার হৃদয়ে কাঁটার মত বিঁধিত, ইহা তাঁহার বাহ্য কঠোরতা সত্ত্বেও তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিত। আমি দেখিয়াছি, দুঃস্থ ব্যক্তির দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া তিনি সময়ে লজ্জিত হইতেন, যেন তাহাদের দুঃখ বিমোচনের ভার ভগবান্ তাঁহার উপরই দিয়াছেন, তাই সামর্থ্যের অভাবে সময়ে সময়ে তিনি লজ্জা বোধ করিতেন। তথাপি কত শত দীন-দরিদ্র যে তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে, তাহা কি গণিয়া শেষ করা যায়? রাজা তাঁহার কোষাগার মুক্ত করিলেও অল্প সময়ে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু আশুতোষের প্রাণের কোষাগার শূন্য করিবে কে? তাহাতে যে, দয়ার অফুরন্ত প্রস্রবণ সঞ্চিত ছিল। এইজন্য ৭৭নং রসারোডে নিত্য ভিড় হইত। তিনি অতি বড় হইয়াও অতি ছোটদের লইয়া এই ভাবে নিত্য মহোৎসব করিয়া গিয়াছেন, এই কাঙ্গালীদের জন্য তিনি বিশ্রামের দিনে বিশ্রাম করিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবন ছিল নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মশীল, দ্বাদশ ঘণ্টা তাঁহার দ্বার ছিল মুক্ত,—সেই দ্বারে রাজার যেরূপ প্রবেশাধিকার ছিল, ফকিরেরও সেই রূপই ছিল। এই কর্ম্ম-পীড়িত হইয়া কর্ম্ম-ক্লান্তির মধ্যেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কখনও দেখিলাম না, একটা মাস স্ত্রী, পুত্র কন্যা-পরিবৃত হইয়া তিনি বিশ্রম্ভালাপের সুবিধা পাইয়াছেন। তিনি নিজেকে দেশের সকলের নিকট বিলাইয়া দিয়াছিলেন, পারিবারিক প্রীতি-সুখ ভোগ করিবার অবসর আমরা তাঁহাকে দেই নাই।

হায়! আজ দ্বারভাঙ্গা-গৃহে আসিয়া আকাশে-বাতাসে কি এক ভীতিকর হাহাকার শুনিতেছি! কে যেন ধীর, গম্ভীর পাদ-ক্ষেপে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেন, তিনি আর উঠিবেন না। তাঁহার আগমনে সমস্ত কক্ষগুলি কর্ম্ম-চঞ্চল হইয়া উঠিত। আজ বড়ই এক নিষ্ঠুর নির্জ্জনতা বোধ করিতেছি, ইলেকট্রিক পাখার বায়ু পর্য্যন্ত যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! যাঁহার বহ্নি-প্রতিম তেজস্বী বক্তৃতায় সিনেট-গৃহ প্রকম্পিত হইত, সাহেব, বাঙ্গালী স্তব্ধ হইয়া উচ্চ শিক্ষার গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহার সহিত একমত হইয়া যাইত,—যাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তালে তালে শ্রোতার বক্ষ স্পন্দিত হইত,—যাঁহার বিদ্যা-জ্ঞানের গভীরতা, বুদ্ধির ক্ষুর-ধার তীক্ষ্ণতা, এবং অপূর্ব্ব ক্ষমতায় প্রতিদিন আমরা মুগ্ধ হইতাম, কাজের নব নব প্রেরণা পাইতাম,—যাঁহার নির্ভীকতা হিমাচলের মত অকম্পিত ও অটল ছিল,—চারি দিকে চিতাগ্নি, প্রেতের নৃত্য, ভূতের দৌরাত্ম্য, ইহার মধ্যেও যে যোগী নিশ্চলভাবে বসিয়া শব-সাধনা করিতেন,—আজ তাঁহার আসনখানি পড়িয়া আছে, কিন্তু সে ত্রিপুর-বিজয়ী ত্রিশূল আজ কোথায়,—আমাদিগকে দুর্দ্দিনে কে আর রক্ষা করিবে? ঐ যে মাধব-বাজারের অর্দ্ধ সমাপ্ত হর্ম্ম্য-স্কন্ধ পর্য্যন্ত উঠিয়া কবন্ধের মত দাঁড়াইয়া আছে—উহা যেন সেই মহাশূন্যের দিকে লক্ষ্য করিতেছে। সেই বিরাট্ বক্ষ, যাহা যমরাজের দণ্ডের উৎক্ষেপও বুঝি ব্যর্থ করিতে পারিত, যাহা রাজপ্রাসাদের বিজয়ী সিংহদ্বারের মত

প্রশস্ত ছিল, তাহার স্পন্দন হঠাৎ কি করিয়া থামিয়া গেল, তাহাই আশ্চর্য্য হইতে আশ্চর্য্য। ইঁহার কথা মনে হইলে ক্লিওপ্যাট্রার এণ্টোনিও সম্বন্ধে সেই বিলাপ-সূচক প্রশংসোক্তি মনে পড়ে :—

"His face was as the heavens ; and therein stuck
A sun and moon, which kept their course, and lighted
The little O, the earth.
His legs bestrid the ocean : his rear'd arm
Crested the world : his voice was propertied
As all the tuned spheres, and that to friends ;
But when he meant to quail and shake the orb,
He was as rattling thunder. For his bounty,
There was no winter in't ; an autumn t' was
That grew the more by reaping ; his delights
Were dolphin-like ; they show'd his back above
The element they lived in :"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
"বঙ্গবাণী" ৩য় বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৩১ সাল

আশুতোষ ও বিদ্যাসাগর

টুলো ব্রাহ্মণের সতেজমূর্ত্তি বিদ্যাসাগর ইংরাজীর আমলে আবির্ভূত হইয়া ইংরাজ-প্রভাবের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন,—এজন্য কবি হেমচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন— "ইংরাজী ঘিয়েতে ভাজা সংস্কৃত-ডিস্। টোল-স্কুলের পড়া-শুনা দুইএরই ফিনিস্॥" কিন্তু তাঁহার চরিত্রে ইংরাজী প্রভাব কতটা পড়িয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিলে খুব বেশী কিছু পাওয়া যাইবে না।

সত্য বটে, তাঁহার একটা জলন্ত তেজ ছিল, তিনি কোনরূপ অন্যায় সহিতে পারেন নাই; তিনি তাঁহার জাতীয় মর্য্যাদা চিরদিনই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, লাট-প্রাসাদে যাইতেও চটি-জুতা ছাড়েন নাই। যে বড় সাহেব তাঁহার দিকে টেবিলের উপর পদ-যুগল প্রসারণ করিয়া এ দেশীয়দের প্রতি তাঁহার অভ্যস্ত অবজ্ঞা দেখাইয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর—নির্ভীক বিদ্যাসাগর—আত্মসম্মান-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত-স্থলীয় বিদ্যাসাগর—সেই সাহেবকে তদ্রূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। গরীব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষতার বিপুল বেতন, বিপুল সম্মান অবশ্য তুচ্ছ করিবার বিষয় নহে,—কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের মিল না হওয়াতে বীর্য্যবান্ বিদ্যাসাগর মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই এত বড় পদ—'দিল্লীকা লাড্ডু'—ছাড়িয়া দিয়া আর্থিক দুরবস্থার সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কেহই তাঁহার এ কার্য্যের অনুমোদন করিতেন না। পুরাকালে রামচন্দ্র তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যটি এক কথায় ছাড়িয়া দিয়া বনে গিয়াছিলেন, এজন্য বাঙ্গলার জনসাধারণ তাঁহার নাম দিয়াছে 'বোকা-রাম'। কিন্তু কথা হইতেছে এই, বিদ্যাসাগর কি তাঁহার চরিত্রের জলন্ত তেজ—এই প্রখর ব্যক্তিত্ব সত্যই পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রভাব হইতে পাইয়াছিলেন?

আমার মনে হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত মোটেই ঠিক নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিছু পূর্ব্বে বুনো-রামনাথ এরূপ তেজ বাংরবার দেখাইয়াছিলেন, সে কথা বিদ্যাসাগর নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা শিবচন্দ্র বুনো-রামনাথকে তাঁহার বেতনভুক্ সভা-পণ্ডিত করিতে প্রয়াসী হইয়া তাঁহার নিকট যেরূপ গঞ্জনা পাইয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রাচীন সাত্ত্বিক আদর্শ সকলের চক্ষে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। এই 'বুনোকে' কলিকাতার মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রমুখ বিখ্যাত ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি বহু অর্থ-সম্পদের লোভ দেখাইয়া একবার কলিকাতায় আনিতে চেষ্টা করিয়া ভৎসিত হইয়াছিলেন। তিনি কখনও এক কপর্দ্দকও দান গ্রহণ করিতেন না; অথচ কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়-বাসী পণ্ডিতেরা 'বুনোর' অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য পরম শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিতেন। এ ঘটনাটি স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এদিকে রামনাথ স্বীয় ক্ষেত্রজাত সামান্য তণ্ডুল ও তিন্তিড়ী বৃক্ষের পত্রের ঝোল আহার করিয়া তৃপ্তি সহকারে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত প্রাচীন-পন্থী পণ্ডিতেরা যুগে যুগে সমাজ সংস্কার করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গর্গ নামক জনৈক মহামনা, বৃদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর অপোগণ্ড-কাল হইতে চণ্ডাল-গৃহে পালিত, জাতি-চ্যুত এক ব্রাহ্মণকুমারকে সমাজে পুনঃ গ্রহণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন পঞ্চবর্ষীয় বালক চণ্ডালিনী ধর্ম্ম-মাতার শ্মশানে তিন দিন পর্য্যন্ত অনাহারে পড়িয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল এবং ব্রাহ্মণদের

তো কথাই নাই, অপরাপর বর্ণের হিন্দুরাও এই অস্পৃশ্য বালকের ছায়া মাড়াইতে স্বীকৃত হন নাই,—তখন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, ব্রাহ্মণকুলোজ্জ্বল, ঋষিতুল্য গর্গ স্বীয় নামাবলী দিয়া চণ্ডালিনীর চিতা-ধুলি-ধূসর এই বালকের অঙ্গ মার্জ্জনাপূর্ব্বক তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া গৃহে লইয়া আসিয়াছিলেন, এবং বালক যখন তাঁহার কৃপায় শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল, তখন গর্গ তাহাকে সমাজে তুলিতে যাইয়া নন্দ প্রভৃতি গোঁড়া ব্রাহ্মণদের হস্তে কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত কাহিনী কাব্য ও ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

তথাপি বিদ্যাসাগর যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা অসামান্য। কারণ, দেশ হইতে এই জলন্ত ব্রাহ্মণ্য-তেজ-শিখা বিলীন হইতেছিল। বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে পূর্ব্বকালের উপানহ, শিখা ও ধুতি-চাদর এ দেশের নব-আভিজাত্য-দৃপ্ত সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল। কপালে পবিত্র চন্দন-লেখা মুছিয়া ফেলিয়া নবশিক্ষিত ব্রাহ্মণ মুখে পাউডার মাখিতে লাগিয়া গেলেন, উপবীত এবং তুলসীদাম বা রুদ্রাক্ষমালার স্থানে গলদেশে নেকটাই, উপনহের স্থলে ডসনের বুট ও গরদের ধুতির স্থানে র‍্যাঙ্কিনের বাড়ীর ট্রাউজার পরিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ-সমাজেরই একজন ইংরাজী শিখিয়া, একটা কলেজের অধ্যক্ষের উচ্চপদ পাইয়া এবং লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ ও উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সংস্পর্শ লাভ করিয়া, এমন কি ইংরাজী সাহিত্যের স্বর্ণ-ভাণ্ডারে গভীরভাবে প্রবেশ-লাভ করিয়াও যে টুলো ব্রাহ্মণ সেই টুলো ব্রাহ্মণই রহিয়া গেলেন,—সেই প্রাচীনকালের সামান্য বেশ পরিয়া তিনি কুণ্ঠার সহিত এক কোণে সরিয়া রহিলেন না, বরঞ্চ ধুলি-ধূসর উপানহ-সহ পদ-যুগল তাঁহার উৰ্দ্ধতন রাজপুরুষের সম্মুখে তদীয় টেবিলের উপর স্থাপন-পূর্ব্বক তৎকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইলেন,—সেই উপানহ ও ধুতি-চাদর রাজ-দ্বারে অসম্মানিত হওয়াতে তিনি রাজ-প্রাসাদের তোরণ হইতে অভিমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুতরাং তাঁহার এই যে প্রাচীন আচার-ব্যবহার-পালন, তাহা ঠিক গতানুগতিক বলা যাইতে পারে না। ইহা ব্রাহ্মণ্য-বীর্য্যবত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা নিজের দৈন্য-কুণ্ঠিত, চিরাগত একটা অভ্যাস নহে,—ইহা পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবের নিকট নতি-স্বীকারে অসম্মত, অপরাজিত জাতীয়তার ঘোষণা। বিদ্যাসাগরই সর্ব্বপ্রথম সগৌরবে এই স্বজাতীয় আদর্শ শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তৎপূর্ব্বে, তৎসময়ে এবং এখনও শত শত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সামাজিক বিশুদ্ধতা ও আচার-ব্যবহার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁহাদের এই প্রভেদ যে, তাঁহারা গতানুগতিক, পূর্ব্বসংস্কারাবদ্ধ এবং বিলাতী আদর্শ স্বীকার না করিয়াও কতকটা কুণ্ঠা ও লজ্জার সঙ্গে কোনরূপে বিদেশীয় প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্বীয় চিরাচরিত পথ অনুসরণের অর্থ—এদেশের আচার-ব্যবহারের

বিজয়-ঘোষণা, উহাতে একটুকু কুণ্ঠা বা নতি-স্বীকারের ভাব তো নাই-ই, বরঞ্চ উহা পাণ্ডিত্যের চিহ্ন ও জাতীয় সম্মান-জ্ঞানের অভিব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তাহা যেন নব্য-তন্ত্রী সমাজকে ডাকিয়া বলিতেছে—"তোমরা একটা সামান্য চাকুরি পাইয়াই বিদেশী প্রভাবে নিজস্ব গৌরব বিসর্জ্জন দিতেছ এবং পরানুকরণ করিয়া স্পর্দ্ধিত হইতেছ, কিন্তু দেখ, আমি তোমাদেরই মত ইংরাজী শিখিয়াছি, তোমাদের অনেকের যেখানে প্রবেশাধিকার নাই, অল্প সময়ের জন্য যে সকল ইংরাজের সাক্ষাৎলাভ করিলে তোমরা কৃতার্থ হও, সেই ইংরাজ-সমাজে আমার অবাধ গতি, তাঁহারা আমাকে বন্ধুবৎ গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ আমি আমার নিজ সমাজের আচার-ব্যবহার ছাড়ি নাই, আমার পূর্ব্বপুরুষাচরিত পন্থা শুধু আমার প্রিয় নহে, তাহার মধ্যে আমার পক্ষে অগৌরবের কিছু নাই।" বিদ্যাসাগর এই যে সামাজিক প্রথা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন, তাহা বীর্য্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহা সনাতন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিলেও তিনি তদ্দ্বারা তৎকালে এই দেশ ও সমাজকে নূতন করিয়া গৌরব প্রদান করিয়াছিলেন।

সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জীবনে যে অপূর্ব্ব ত্যাগ ও তেজ, জলন্ত অভিমান ও আত্মসম্মান-জ্ঞান, সার্ব্বজনীন দয়া-বৃত্তি ও সমাজ-সংস্কারের প্রবল ইচ্ছা দেখাইয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন, তাহার কোন গুণই যে তিনি বিদেশী প্রভাব হইতে পাইয়াছেন, এরূপ তো মনে হয় না। তবে কবি হেমচন্দ্র তাঁহার চরিত্র বুঝাইতে "ইংরেজীর ঘিয়ে ভাজা" এইরূপ একটি বিশেষণ আরোপ করিলেন কেন?

তাহার কারণ আমার এই মনে হয় যে, ইংরাজ আগমনের পর হইতে প্রাচীন ব্রাহ্মণের আদর্শ আমাদের চক্ষু হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছিল, আর সে বুনো রামনাথ ও গর্গের আদর্শ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ছিল না। জড়-সভ্যতা আমাদিগের নিকট অর্থ ও পদ-গৌরবকে মহিমান্বিত করিয়া পার্থিব সুখ-ভোগের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছিল। এদিকে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু অবস্থা-বৈগুণ্য ও ইংরাজদের নির্ব্বন্ধ ও অপ্রতিহত প্রভুত্ব আমাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে তাহাদের কৃপাপ্রার্থী করিয়া মানসিক অবসাদ ও দৈন্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। অর্থ ও সামান্য পদ-লিপ্সা আমাদিগকে এরূপ প্রলুব্ধ করিয়াছিল যে, তাহার বিনিময়ে আমরা আমাদের আত্মসম্মান-জ্ঞান, চরিত্র-বল ও তেজ, সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম। একশত বৎসর পূর্ব্বে এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলসন্ সাহেব যখন প্রচুর মাসিক বেতন অঙ্গীকার করিয়া একজন সংস্কৃত-অধ্যাপক ব্রাহ্মণদের মধ্যে খুঁজিতেছিলেন, তখন এদেশে কুটীরবাসী অর্দ্ধাশন ও অনশনে অভ্যস্ত সেই সমাজে তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য একজনও টুলো পণ্ডিত পাওয়া গেল না। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে (মাসিক পাঁচশত টাকা) একজন বৈদ্য পণ্ডিত নিযুক্ত

করিতে বাধ্য হইলেন। সে সময়ের ব্রাহ্মণ-সমাজ আর এখনকার ব্রাহ্মণ-সমাজের তারতম্য করিলে আকাশ-পাতালের প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে বলিতে হইবে।

যখন এইভাবের ব্রাহ্মণ্যতেজ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, তখন মনুষ্যোচিত বীর্য্য ও স্বাধীন মনোবৃত্তির কোন দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে দেখিতে পাইলেই আমাদের মনে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উদিত হইত,—এদেশের মাটিতে তো ইহা নাই, এ গুণ এই ব্যক্তি পাইলেন কোথা হইতে? সুতরাং যে দেশে এই সকল মনুষ্যোচিত বীর্য্যবত্তা ও সদ্‌গুণাবলীর দৃষ্টান্ত সুলভ, এবং বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়, সেই দেশের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত এবং পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে গোমুখী কল্পনা করিয়া আমাদের গুণগরিমার গঙ্গার উৎপত্তিস্থল তাহাই বলিয়া নির্ণয় করিতাম। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের এই তেজ সুচিরাগত, আমরা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে চাণক্যের এবং দেবপালের সময়ে দর্ভপাণি ও কেদার মিশ্রের এই ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠা ও তেজের পরিচয় পাইয়াছি। এই তেজ ও নিষ্ঠাকে আদর্শ-স্বরূপ স্বীকার করিয়াই সেনরাজারা ব্রাহ্মণদিগের কৌলিন্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে পালবংশাবতংস গোপালও এইসকল গুণের পূজা করিয়া বাঙ্গলা দেশের সমাজ সংস্কার করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এই তেজ, এই ত্যাগই অতি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়; ইহা বিদেশী প্রভাবজাত নহে। টুলো ব্রাহ্মণের পদে এই উপানহ বহু যুগ হইতে বিরাজ করিতেছে, উহা বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনা নহে; তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ধুতি ও চাদর ছাড়েন নাই, ইহাতেও তাঁহার মৌলিকত্ব নাই।

বিদ্যাসাগর প্রাচীন-পন্থী হইয়াও এই হিসাবে নবীন-পন্থী। জগতে মহাপুরুষ ও বীরগণ সচরাচর কোন নূতন সত্য আবিষ্কার করেন না; সত্য জটায়ুর মতই বৃদ্ধ ও বহু প্রাচীন। যখন এই সত্য কালে ম্লান হইয়া পড়ে, তখনও তাহা লুপ্ত হয় না,—ভস্মের নীচে খোঁচা দিলে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়, সেইরূপ বীরপুরুষগণ যুগ-যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের আবর্জ্জনা উস্কাইয়া এই নির্জীব ও মৃতপ্রায় সত্যকে পুনরায় সজীব ও উজ্জ্বল করিয়া প্রদর্শন করেন।

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা একেবারেই বিদেশী প্রভাবের ফলে নহে,—উহা নব্য সংস্কারকের সমাজ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বিদেশী আদর্শে গড়িবার চেষ্টা-প্রসূত নহে। তিনি নিজেই বহু শাস্ত্র ঘাঁটিয়া প্রাচীন সত্যকে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বে এ সমাজে অভাগিনী রমণীদের জন্য মনুষ্য-মনে সহানুভূতি ও করুণা ছিল এবং পূর্ব্বসূরিগণ এজন্য সামাজিক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন—প্রাচীন যুগের সত্যের নূতন প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার উদ্যমে বার্দ্ধক্যের মধ্যে যৌবনের তরুণ প্রভা স্ফুরিত হইতেছে।

সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ অনেক সময় স্বাভাবিক গুণগুলি ভুলিয়া যায়। সর্ব্বভূতে দয়ার কথা আমরা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সংস্কারবশতঃ সেই দয়ার গণ্ডি আমরা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া আসিতেছি। কুকুর, বিড়াল অবাধে মনুষ্য-গৃহে আনাগোনা করিতেছে, কিন্তু কোন হীনবর্ণের লোকের সেই আঙ্গিনায় প্রবেশ নিষিদ্ধ,—আসন্নমৃত্যু কোন হীনবর্ণের লোকেরও সেবা-শুশ্রূষা করিতে উচ্চবর্ণের প্রতিবেশী স্বীকৃত হন না। কিন্তু মহাপুরুষগণ এই আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও সম্পূর্ণরূপে সেই আবেষ্টনীর প্রভাব-মুক্ত। যেখানে বৈধব্যের কঠোর নিয়মে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা স্বীয় ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের ধারণা করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম,—বিপর্য্যস্ত ও ক্লিষ্ট,—অথচ সে সম্বন্ধে সমাজের প্রবীণ-দের মন একেবারে প্রাচীন সংস্কারের পাষাণে গঠিত, সেখানে এই বীর দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—এ কি ঘোর অত্যাচার! তোমরা চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়, পার্থিব যত সুখ ভোগ করিবে, একবারের জায়গায় পাঁচবার বিবাহ করিবে, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আরও বহু স্ত্রীর কপালে সিঁদুর আঁকিয়া তাহাদেরও তোমাদের জীবনে ভোগাকেই বড় করিয়া দেখাইবে, কেবল নিবৃত্তি-মার্গ দেখাইবে ঐ উপবাস-ক্লিষ্ট, তৃষ্ণার্ত্ত, আশন-বসন-বঞ্চিত দুর্ভাগ্য শিশুটিকে?

ভগবতী দেবী বিদ্যাসাগরকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন,—তাঁহারই চরিত্রে এই দয়া-ধর্ম্মের সংস্কার-মুক্ত সত্যের,—এই অমৃতফলের বীজ ছিল। বিদ্যাসাগরকে তিনি যখন ইহার ইঙ্গিত দিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে করুণার বন্যা বহিয়া গেল। অগ্নি-শিখার উপাদান তাঁহার চরিত্রের মধ্যেই ছিল, এবার অনুকূল বায়ুতে তাহা জ্বলিয়া উঠিল। সংসারের হিসাব-নিকাশ লইয়া বিদ্যাসাগর কখনই খাতাপত্র ঘাঁটিতে বসিতেন না। তিনি সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু যে কুবের-দেবতা তাঁহাকে এই ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, তাঁহাকে চিরদিনই তিনি ভ্রূকুটি দেখাইয়া আসিয়াছেন; যখন তিনি কোন সত্য দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তখন তিনি সেই সত্য-প্রচারের জন্য তাঁহার সমস্ত ধন-দৌলত ও পদ-গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেন নাই। কে বলিয়াছিল তাঁহাকে এই বিধবা-বিবাহ-প্রচারের চেষ্টা করিতে? ইহাতে ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছিল, জলের মত অজস্র অর্থব্যয় হইয়াছিল। তথাপি অনাহূতভাবে এই সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে উপদেশ ও প্রেরণা দিয়াছিল? ইহার এক উত্তর সত্যের তাড়না। মহাজনগণের হৃদয়ে যখন সত্যোপলব্ধি বদ্ধমূল হয়, তখন উহা শুধু প্রেরণা দেয় না,—দস্তুরমত তাড়না করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থ ধ্বংস করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার স্বীয় পুত্রের বিধবা-বিবাহ সম্পাদন করিয়া তাঁহারও সামাজিক জীবন বিড়ম্বিত করিয়াছিলেন। সত্য হইতে বড় কিছুই নাই,—তিনি এই কথা সিংহ-বিক্রমে ঘোষণা করিলেন।

কে তাঁহাকে বলিয়াছিল কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সামান্য মতভেদ-উপলক্ষ্যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের এতবড় একটা উচ্চ পদে ইস্তফা দিতে? সে পদ বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিত ই, বি, কাউল প্রভৃতি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তখনকার দিনে একজন টুলো ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা কি কম গৌরবের সামগ্রী? কিন্তু ভ্রূক্ষেপে মনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, তিনি কাজটি ছাড়িয়া নিঃস্ব হইলেন। সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য তাঁহার কোন বিপদই ছিল না, যাহা অসহনীয়,—কোন কাজই ছিল না, যাহা অসাধ্য।

এই মহাপুরুষের দানের কথা আর কি বলিব? তাঁহার গৃহে যে দানের এই নিত্য মহোৎসব চলিতেছিল, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ছিল না, শত্রু-মিত্র ছিল না; চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায়, সূর্য্যের কিরণের ন্যায় সেই দানের পরিবেশন সর্ব্বত্র হইত। সেই দানের তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; তাহার মোট পরিমাণ দিতে গেলে হয়ত কোন কোন বড় রাজার তুলনায় তাহা অল্প বলিয়াও মনে হইতে পারে। তিনি রাজেন্দ্র মল্লিক কিংবা তারক পরামাণিকের মত ধনশালী ছিলেন না, হয়ত শেষোক্তের দানের বার্ষিক পরিমাণ তাঁহার হইতেও বেশী ছিল, কিন্তু এ বিষয়টি সে দিক্ দিয়া মোটেই বিচার্য্য নহে,—এই বিচারের তুলাদণ্ড মর্ম্মানুভূতি, সহৃদয়তা ও পরদুঃখকাতরতা।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে হাইকোর্টের উকিল শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত পীড়িত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"শুনিয়াছি কারমাটারে আপনার শরীর ভাল থাকে, সেখানে তো আপনার বাড়ী আছে, আপনি সেখানে কিছু-দিন থাকিলে আপনার শরীর শোধরাইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার মুখ মুহূর্ত্তকাল বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত হইল। বিদ্যাসাগর বলিলেন—"সেখানে থাকিবার মত আমার অর্থ নাই।" শিববাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"সে কি কথা? সেখানে আপনার ব্যয়-বাহুল্য হইবার তো কোন কারণ দেখি না।" এই কথায় বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন, অশ্রু-নিরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"সে জায়গায় অসংখ্য সাঁওতালের বাস,—তাহাদের এক একজন প্রতি বেলায় এক সের চালের ভাত খাইতে পারে,—এমন দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে যে, তাহারা এক ছটাক ভাতও সারা দিনে পায় না। শিব-বাবু, আমি শত শত সাঁওতালের অনশন-ক্লিষ্ট মুখ ও তাহাদিগকে আর্ত্ত ও অভুক্ত দেখিয়া এই ক্ষুৎপিপাসুদের সম্মুখে নিজে কিরূপে ভাত খাইব? এত অর্থ কোথায় পাইব, যাহাতে তাহাদের দুঃখ নিরসন করিব? আমি কোন্ প্রাণে সেখানে যাইব?" এই বলিয়া মুমূর্ষু বিদ্যাসাগর কাঁদিতে লাগিলেন। লক্ষ টাকা কেহ দান করিতে পারেন, কিন্তু এইরূপ প্রাণ কে দিবেন? এই প্রাণবন্ত, মূর্ত্ত দয়ার অবতার মোট কত টাকা

দিয়াছেন, সেই হিসাবে দেখিয়া বিচার করিতে হইবে না। তিনি যাহা দিয়াছিলেন, এক কথায় বলিতে হইলে—তাহা তাঁহার সর্ব্বস্ব।

এই পুরুষের সঙ্গে বাঙ্গলার ব্যাঘ্র আশুতোষের চরিত্রগত অনেক সাদৃশ্য আছে। বিদ্যাসাগর ছিলেন খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত,—তিনি পরিণত বয়সে ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। আশুতোষের শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই নব্য তন্ত্রের, তিনি পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের একেবারে তোপের মুখে ছিলেন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহাধ্যায়ীরা ইংরাজের অনুকরণের কৃতিত্ব দেখাইতে যাইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। তাঁহাদের অনেকেই বাঙ্গলা-ভাষাকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার এক সহযোগী বাঙ্গালী বিচারপতি আয়া রাখিয়া তাঁহার সন্তানদিগকে হিন্দী শিখাইতেন; পূরো সাহেব হইতে হইলে ইংরাজী তো শিক্ষার মুখ্য বিষয় হইবেই,—চাকরদিগের সঙ্গে কথা বলার জন্য হিন্দীও জানা চাই। বাঙ্গলায় কথা বলা সে সময়ের উচ্চশিক্ষিত সমাজে হেয় ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সকল উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বাধ্য হইয়া বাঙ্গলা বলিতে যাইয়া মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাকৃত ইংরাজী টান দিতেন। আমাদের শৈশবে দেখিয়াছি, বাঙ্গলা ভাষায় 'ফেল' হইলে পরীক্ষার্থী তাহা বরঞ্চ গৌরবের বিষয় বলিয়াই মনে করিত। বিদ্যাসাগর যাঁহাদের মধ্যে লালিত-পালিত তাঁহারা সকলেই খাঁটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক। তিনি শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে যে আবেষ্টনীর মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে উপানহ, ধুতি-চাদর এবং টিকির সংস্কার সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। পরিণত বয়সে তিনি ইংরাজী শিখিয়া উচ্চ পদ লাভ করিয়া ইংরাজ রাজপুরুষদের সংস্পর্শে আসিবার পরেও তিনি তাঁহার জীবনের অভ্যস্ত রীতি ছাড়েন নাই, ইহাই আমাদের চক্ষে তাঁহাকে গৌরব দিতেছে। এ কথাটাও খুব সহজ নহে। এইরূপ শিক্ষা ও পদ পাওয়া মাত্র তখনই বাঙ্গালী উন্নত সম্প্রদায়ের লোকের মাথা বিগ্ড়াইয়া যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। বাহ্যে পাশ্চাত্ত্য রীতির পক্ষপাতী হইয়াও সে আমলে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজ-চরিত্রের দার্ঢ্য, আত্মসম্মান-জ্ঞান, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ এ সকল কিছুই দেখাইতে পারিতেন না। বিদেশীয়দের সমাজের অতি উপেক্ষিত এক কোণে একটু স্থান করিয়া লইবার জন্য তাঁহারা ব্যবহারে ও চরিত্রে অতিশয় মানসিক দৈন্য ও হীনতা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর শুধু দেশীয় রীতি রক্ষা করেন নাই, তাঁহার চরিত্রে ব্রাহ্মণ্য তেজও বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্ত্য জাতি-সুলভ প্রখর ব্যক্তিত্ব অভাবনীয়-রূপে বিকাশ পাইয়াছিল। তথাপি বলিতে হয়, টুলো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজে তখনও এই বিষয়ের উপাদান বিদ্যমান ছিল এবং বিদ্যাসাগর চরিত্র তাঁহার আবেষ্টনীর প্রতিকূল বা স্বীয় সামাজিক সংস্কারের বিরোধী ছিল না।

কিন্তু আশুতোষ আমাদের পতিত সমাজে ভগবানের অপ্রত্যাশিত দান। তাঁহার পিতা, পিতৃব্যগণের প্রায় সকলেই ইংরাজীতে শিক্ষা পাইয়া, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষার যত কিছু নব্য ভাব, তাঁহার বাড়ীতে তাহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহার বাড়ীতে খাঁটি ব্রাহ্মণ্য-আদর্শ দেখিতে পান নাই। তাঁহার পিতা ছিলেন চিকিৎসক,—তাহাও আয়ুর্ব্বেদের নহে, বিলাতী এলোপ্যাথীর। পিতৃব্যদের দুই জন ইঞ্জিনিয়ার এবং অপর এক জনও ডাক্তারী ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আশুতোষ ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে নব্যতন্ত্রীদলের নেতা ছিলেন। শৈশব হইতেই বিদেশী শিক্ষা তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষিত সহাধ্যায়িগণের পুরোভাগে আনয়ন করিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যে ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইয়া আমাদের সমাজের আচার-বিচার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং একাকার করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই প্রবল ঝঞ্ঝার ক্রিয়া আশুতোষের সমকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। কোন টুলো ব্রাহ্মণের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্য তিনি পান নাই,—যাঁহার প্রভাবে আধুনিক সামাজিক বিপর্য্যয়ের প্রতিকূল বুদ্ধি তাঁহার জন্মিতে পারিত। এই প্রবল ঝঞ্ঝা ও বন্যার মধ্যে তিনি কি করিয়া তাহাদের দুর্দ্দমনীয় গতির মুখ ফিরাইয়া দিলেন? তিনি যেখানে যেখানে কাজ করিয়াছেন, সেই সেইখানে বহু ইংরাজ রাজপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। সেই সকল গণ্ডির মধ্যে যে কয়েকজন ভাগ্যবান্ বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই বিদেশীয় ভাবাপন্ন, বিদেশীয় রীতি-নীতিতে আক্রান্ত ও দেশীয় সমাজ ও আচার-ব্যবহারের প্রতি বিমুখ ও বীতশ্রদ্ধ। স্বীয় বংশের তেজ ও প্রখর প্রতিভা আশুতোষকে দেশ ও সমাজের প্রীতি শিখাইয়াছিল। এখন যেরূপ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ মাঝে মাঝে বিদেশীয় কর্ম্ম-পদ্ধতির ও চিত্তবৃত্তির অভিনয় করিয়া স্বদেশ-প্রেমিকের ভূমিকা গ্রহণ করেন, আশুতোষ সেইরূপ অভিনয়ের বিরোধী ছিলেন। তখনকার দিনে কোন কোন মনস্বী বাঙ্গালী ইংরাজীতে আড়ম্বরময় বক্তৃতা দিয়া মনে করিতেন যে, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, তাঁহার অভিভাষণে বার্ক, গ্যারিবল্ডী ও গ্লাড্‌ষ্টোনের ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি সভা-মণ্ডপে ঘন করতালি দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছেন,—ইহাতেই তাঁহার সম্যক্ তৃপ্তি হইত। বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্র ও জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার বক্তব্য-বিষয়ের কোন সম্পর্ক আছে, কি না, তাহা তিনি মুহূর্ত্তকালও চিন্তা করিবার প্রতীক্ষা করেন নাই। আশুতোষ এই অভিনয় কখনই করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতায়ও তিনি ঘন করতালি লাভ করিয়াছেন, তাহা জলন্ত উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু উদ্দিষ্ট লক্ষ্য-বিচ্যুত একটি বাক্যও তিনি বলেন নাই। এক কথায় তিনি যেমন খাঁটি পুরুষ ছিলেন, তাঁহার কথাও তেমনিই খাঁটি ছিল। অলঙ্কার বা বাহ্য চাকচিক্যের অনুরোধে

একটিও ঝুটা কথা, অনধিগম্য কোন আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত বা পরানুকরণে সাফল্য দেখাইতে যাইয়া তিনি একটি বাক্যও প্রয়োগ করেন নাই। এক কথায় তাঁহার বাক্য ও অর্থ পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল এবং অনাড়ম্বর অথচ তদীয় হৃদয়ের আবেগপূর্ণ, জীবন্ত ভাষা গুরুতর কর্ম্মের অগ্রদূত-স্বরূপ কোন আসন্ন আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিত এবং তদনুগামী হইত। যখন অসহযোগ-আন্দোলনের প্রবল বন্যায় কলিকাতার ছাত্র-সমাজ বানচাল হইয়া যাইতেছিল এবং সিনেট-গৃহের দ্বার-দেশে তরুণগণ পরস্পরের কর ধারণ করিয়া এরূপভাবে শায়িত ছিল যে, সেই সম্মিলিত বালক-ব্যূহ ভেদ করিয়া গৃহ একেবারে দুষ্প্রবেশ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তখন আশুতোষ সেখানে আসিয়া ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কি চাও?—স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়? আমি আজীবন তোমাদের শিক্ষার জন্য পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিয়াছি, তোমরা নিজেদের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় চাও, আমি যে তাহাই তোমাদিগকে দিয়াছি; তোমরা একবার আমার দিকে চাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন-পরিষদে এখন প্রধান্য কাহাদের? তোমরা সিনেট-সিণ্ডিকেটের সভা-সমিতিগুলি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখ,—এখানে বাঙ্গালীই কর্ত্তা, বাঙ্গালীরা যাহা করে, তাহাই হয়; এ বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালীদের, এবার স্বভাব-ক্রমেই বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালীর হাতে আসিয়া পড়িয়াছে,—এখানে বাঙ্গালীরা অসংখ্য টাকা দিয়াছেন এবং সর্ব্ববিষয়ে ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব হইয়াছে। বাঙ্গালীর হাতে-গড়া, বাঙ্গালীর শাসনে নিয়ন্ত্রিত এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তোমরা ভাঙ্গিতে চাও কি অপরাধে? আমাদের সভা-সমিতি, আমাদের কর্ম্ম-শালার কর্ম্মী ও অধ্যাপকমণ্ডলীদের প্রতি লক্ষ্য কর,—এই বিদ্যায়তনের সদস্যগণ ও পরীক্ষকগণের দেশীয় পরিচ্ছদ,—এখানে এখন আর বিদেশী প্রভাব নাই। আমরাই আমাদের লোকজন, আমাদের সুধীগণ দ্বারা এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছি। আমি এখানকার একজন কর্ম্মী, আমার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখ, আমি অবিরত যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছি কাহাদের বিপক্ষে? যাহারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের, এই জ্ঞান-মন্দিরের স্বাধীনতা ধ্বংস করিতে চায়, যাহারা শিক্ষার দীপ নিভাইতে চায়, তাহাদের বিরুদ্ধে। এই মহাবিদ্যাপীঠ-রক্ষার জন্য আমাদেরই পালিত, আমাদেরই ঘোষ, আমাদেরই খয়রা মুক্ত হস্তে আশাতীত দান করিয়াছেন। তোমরা কি তাঁহাদের উদার হৃদয়ের দেশপ্রেম-প্রাচুর্য্যের অবমাননা করিবে? তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ আমাদের জাতি-গঠনের উদ্দেশ্যে আমাদেরই হস্তে ব্যয়িত হইতেছে। তোমরা বালক, তোমরা একজন নেতা চাও, যিনি তোমাদিগকে স্বদেশ-প্রেম ও স্বরাজ দিবেন। ভাল করিয়া আমাকে দেখ, আমিই উহা তোমাদিগকে দিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছি, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বরাজের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ কর। তোমরা যাঁহাকে চাও, আমি সেই ব্যক্তি, স্বরাজের অগ্রদূত;—তোমাদের এত কাছে

আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া তুচ্ছ করিও না, আমি তোমাদেরই একজন—আমাকে পর ভাবিও না।”

সেই গদগদ কণ্ঠস্বর ও মর্ম্মান্তিক আবেদনের সুর এখনও আমাদের কানে বাজিতেছে। ছাত্রগণ তাঁহার কথার ইঙ্গিত বুঝিল, আশুতোষ উচ্চ শিক্ষার জন্য কত ত্যাগ করিয়াছেন,—তিলে তিলে জীবনের শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ কার্য্য ও শ্রেষ্ঠ অংশ দান করিয়া ইনিই প্রকৃত দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা তুবড়ীর আগুন নহে, উহা হোমাগ্নি, উহা জীবন ভরিয়া জ্বলিতে প্রতিশ্রুত।

সুতরাং আশুতোষ কথায় ব্যবহারে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা খাঁটি ছিলেন। এই অভিনয়ের যুগে তিনি অভিনয় করেন নাই। তিনি প্রকৃত কর্ম্মবীরের ভূমিকা লইয়া বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

যে তেজ ও স্বদেশের সমস্ত বিষয়ের প্রতি অনুরাগের বীজ বিদ্যাসাগর চরিত্রে উপ্ত হইয়াছিল, আশুতোষের জীবনে তাহা সম্যক্ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। স্বদেশ-বাসীর দ্বারা পরিচালিত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাসাগরের সেই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগ সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালনা,—আশুতোষ বৃহত্তর ক্ষেত্রে সফল করিয়াছিলেন। একজন যে নির্ঝরের খাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অপর সেই খাদে প্রবল ধারা বহাইয়া দিয়া তাহা কূলে কূলে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব পারিবারিক ও সামাজিক গণ্ডির মধ্যেই সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তাঁহার তেজ, চরিত্রের বল, দয়া—এসমস্তই আমরা আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু উহা স্বীয় জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ। তিনি পরকৃত অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই, কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ হইলে স্বীয় স্বার্থ চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া শাল্মলীতরুর ন্যায় দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। একদা যখন ভোজনে বসিয়া মুখে গ্রাস লওয়ার পরে আবিষ্কার করিলেন, ডালের সহিত একটি আরশুলা তাঁহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন সকলে যাহা করিত, অর্থাৎ হৈ চৈ করিয়া সেটা মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়া বারংবার মুখ প্রক্ষালন করিত, তিনি তাহা না করিয়া সেটা আস্ত গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। তিনি বুঝিলেন এই বিষয়টা যদি অপর সকলের বিদিত করিয়া গণ্ডগোল করিতেন, তবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা অন্ন-ব্যঞ্জনসহ থালা ফেলিয়া নিমন্ত্রণকারীর সমস্ত ব্যয়-বিধান ও আয়োজন ব্যর্থ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার খাদ্যের ক্ষুদ্র অংশে সিদ্ধ আরশুলার অস্তিত্ব পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছিল, অন্যের অংশে তাহা সংক্রমিত হয় নাই,—এইটুকু বুঝিয়া তিনি স্বাভাবিক ঘৃণা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আরশুলাটি গিলিয়া ফেলিলেন। সাধু উদ্দেশ্যে এরূপ স্বাভাবিক ঘৃণা-বিজয়ের দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু বহুর মধ্যে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়

নাই, কোন প্রতিষ্ঠান-গড়ার মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বের সত্তা প্রবলরূপে দর্শনীয় হয় না। বিদ্যাসাগর-কলেজ তাঁহার নিজের কলেজ, যদিও উচ্চশিক্ষা-কল্পে এই প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর প্রথম প্রতিষ্ঠান ও উহা ভবিষ্যতের আদর্শ, তথাপি উহা সমস্ত ভারতবর্ষ, এমন কি বঙ্গদেশকেও লক্ষ্য করে নাই। তাঁহার সাহচর্য্যে বা সংস্পর্শে যাহারা আসিয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে। আমরা তাঁহাকে কোন বড় প্রতিষ্ঠান বা যা জনসাধারণের কর্ম্মক্ষেত্রে দেখিতে পাই না; দেবমন্দিরের মধ্যে যেরূপ পুষ্প-বিল্বদল-মণ্ডিত হইয়া দেবতাটি ভক্তকে দর্শন দিয়া তাহাব চক্ষু সার্থক করেন, বিদ্যাসাগরও তেমনই তাঁহার গৃহ ও পরিবারের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া স্বর্গীয় দয়ামণ্ডিত হইয়া প্রার্থীর মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু আশুতোষের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও উদ্দিষ্ট লক্ষ্য সুদূর প্রসারিত, তাঁহার মহিমা কোন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাঁহাকে আমরা স্বজাতি ও স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার সুযোগ পাই না, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জনসাধারণের হিতার্থ সঙ্কল্পিত বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে আমরা তাঁহাকে উজ্জ্বলরূপে যেরূপ দেখিতে পাই, ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে তাঁহাকে তেমন করিয়া পাই না। তিনি যখন সভামণ্ডপে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইতেন, তখন বাগ্দেবী তাঁহার ভুজাশ্রয় করিয়া তাঁহার বাক্যের প্রেরণা জোগাইতেন। তিনি তখন যাহা কহিতেন, তাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীজাতির হিতার্থ পরিকল্পিত, বৃহৎ ভবিষ্যৎ কর্ম্মতালিকার মুখবন্ধ-স্বরূপ। বিদ্যাসাগরের দয়ার অবধি ছিল না,—পথের ভিখারী হইতে কবি-শার্দ্দূল মাইকেল মধুসূদন পর্য্যন্ত সকলেই সেই দয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। শীতার্ত্ত, অনাহারে ও উৎকণ্ঠায় জীর্ণ, পথিপার্শ্বস্থ পতিতারাও তাহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি ছিলেন দয়ার উৎস, তাঁহার কাছে যে আসিত, সে-ই সেই স্বর্গীয় দয়ার অংশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইত। আশুতোষেরও গোপনীয় দান অজস্র ছিল, কিন্তু সমধিক পরিমাণে সেই দান ব্যক্তিগত না হইয়া সাধারণের হিত উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত, সুবৃহৎ কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশ পাইত। লোকশিক্ষা অপেক্ষা বড় দান কিছু হইতে পারে না। যিনি চক্ষুতে দৃষ্টি-শক্তি দান করেন, সেই দানই সর্ব্ব দানের সেরা। গুরু চক্ষুরুন্মীলন করেন, অন্ধকার হইতে লোককে জ্ঞানের আলোকে আনয়ন করিয়া। এই দৃষ্টি-দান অপেক্ষা জগতে বড় দান আর কিছুই নাই, গুরু অপেক্ষা বর দাতা আর কেহই নাই। আশুতোষ শিক্ষার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের শত দ্বার ও শত গবাক্ষের পথে জাতীয় দৃষ্টি মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ভক্ত ও প্রার্থীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন—গৃহে অধিষ্ঠিত দেবতার মত বরাভয়যুক্ত হস্ত প্রসারণ করিয়া; কিন্তু আশুতোষের দান প্রার্থী ও অ-প্রার্থীর মধ্যে কোন বিভেদ রাখে নাই। তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফল তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াই

নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, তিনি এমন দান করিয়াছেন, যাহার ফল বর্ত্তমান ভারতবাসী ও তাহাদের ভবিষ্য বংশধরেরা তুল্যরূপেই লাভ করিয়া ধন্ত হইবে।

বাঙ্গলা ভাষা বিদ্যাসাগর ও আশুতোষ উভয়ের নিকটেই ঋণী; কিন্তু এক জন তাঁহার হাতে-কলমে কাজ করিয়া জাতীয় শিক্ষার মূলধন বৃদ্ধি করিয়াছেন,—অপর ব্যক্তি এই ভাষার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার ফলে বঙ্গভারতীর পূজা দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবার সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। বিদ্যাসাগর-লিখিত রচনা পড়িয়া আমরা লাভবান্ হইয়াছি, আমাদের বংশধরেরাও হইবে, তাহা বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আশুতোষ বঙ্গভাষার জন্য যে আসন গড়িয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে বহু ঐতিহাসিক, বহু কবি, বহু বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে উপকৃত হইবেন, বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য ধাপে ধাপে উন্নততর হইবে। মোট কথা, বিদ্যাসাগরের দর্শনকামী তীর্থযাত্রীকে তাঁহার স্বীয় মন্দিরে যাইয়া নিভৃতে দেখিতে হইবে; কিন্তু আশুতোষের বল শত শত বাহুর মধ্যে, তাঁহার জ্ঞান শত মস্তিষ্কে, তাঁহার শিক্ষার ফল শত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবিষ্কার-যোগ্য এবং তাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জুড়িয়া পড়িয়া আছে। কে বড়, কে ছোট, জানি না। এখানে তুলনা-মূলক আলোচনা বৃথা। আমরা মন্দিরের বরাভয়দায়ী হস্ত, সদয়হাস্যবিমণ্ডিত, রুদ্র ভৈরবরূপী দেবতাটির উপাসক এবং যে সূর্য্যদেবতা অনধিগম্য উর্দ্ধস্থানে থাকিয়া বৃহৎ জগতে রশ্মি বিতরণ করিয়া ধরণীকে ফুলফল-মণ্ডিত করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে শতরূপে জীবনের সক্রিয় রূপ দেখাইতেছেন, সেই ধ্বান্তারি, তমোঘ্ন দেবতাটিরও উপাসক, কে বড়, কে ছোট, তাহা জানি না। একজন উচ্চচূড় মন্দিরবাসী, তিনি একক—অপর ব্যক্তি নির্ম্মাতা, শত শত মন্দিরের গঠনকারী, শত হস্তের মধ্যে নিরন্তর তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইতেছে, বিদ্যাসাগর আরম্ভ হইয়া হয়ত শেষ হইবেন, আশুতোষ যাহা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার পরিসমাপ্তি বহু দূরে।

স্ত্রীলোক আমাদের শাস্ত্রে শক্তিরূপে কল্পিত, এই নারী-শক্তি এদেশের লোকের কাছে মাতৃশক্তি। আমাদের সমাজে নারীশক্তি মনোরঞ্জিনী হইয়া যতটা দেখা দিয়াছে, তদপেক্ষা শতগুণে অধিক পালনী-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্ত্রীলোকের এই পালনী-শক্তিই মাতৃত্ব। শাক্তদের পূজা-বিধানে শক্তিব্যূহ মাতৃকারূপে প্রতিষ্ঠিত। এদেশ সর্ব্বত্র মা, মা-রবে আকুল,—শতশত ব্যাকুল কণ্ঠে, শত সাধকের মুখে মাতৃস্তব ধ্বনিত হইতেছে। এখনকার দিনে শক্তির মাতৃরূপ উপেক্ষিত হইতেছে, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে ইহার শ্রেয়োভাবের উপর হইতে লোকের দৃষ্টি অপসারিত হইয়া শক্তি রঞ্জিনী বা রমণী-মূর্ত্তিতে তরুণ দিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। এই পথ ভয় ও বিঘ্ন-সঙ্কুল। যাহা হউক এই প্রসঙ্গটির আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

বিদ্যাসাগর মাতৃপূজক ছিলেন; আশুতোষও তাঁহার জননীর চিরপূজ্য মূর্ত্তি মনে

করিয়া সর্ব্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। মাতা যখন বৈধব্যের কষ্টের দিকে ইঙ্গিত করিলেন, প্রতিবেশীর সদ্য বৈধব্যগ্রস্তা বালিকা-কন্যার নিদারুণ অদৃষ্টের কথার উল্লেখ করিয়া যখন তিনি বিদ্যাসাগরকে বলিলেন—"তুমি তো এত বড় পণ্ডিত, এই বালিকাদের এবম্বিধ দুর্গতি দূর করার কি কোন উপায় নাই?" মানুষের দুঃখের কথা শুনিবার জন্য বিদ্যাসাগরের কান সর্ব্বদা সজাগ থাকিত। উনানে কয়লার প্রাচুর্য্য ছিল, প্রতীক্ষা ছিল একটি স্ফুলিঙ্গের। মাতৃস্বরূপিণী শক্তি যখন এই স্ফুলিঙ্গ বিদ্যাসাগরের মনে উস্কাইয়া দিলেন, তখন এই টুলো ব্রাহ্মণ যে কিরূপ শক্তিময় হইয়া উঠিলেন, তাহা তাঁহার চরিতকারেরা বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্রের সমুদ্র মন্থিত হইতে লাগিল, বিদ্বেষীর সঙ্গে ঘোর লড়াই বাধিয়া গেল, কত পুস্তক লিখিত হইল, কত অর্থ ব্যয়িত হইল। বিরুদ্ধবাদিগণের পুঞ্জীভূত আক্রোশ তিনি নিজে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পর্য্যন্ত সামাজিক অভিশাপের ভাজন করিলেন।

আশুতোষ বিচারপতির পদ গ্রহণ করিবেন কি না, এজন্য মাতৃআজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন এবং যে পর্য্যন্ত পূজনীয়া জগত্তারিণী দেবী অনুমোদন না করিলেন, সে পর্য্যন্ত কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। লর্ড কার্জ্জন তাঁহাকে শিক্ষা-সংক্রান্ত গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া বিলাতে পাঠাইতে চাহিলে তিনি বড়লাটের আদেশ পালন করেন নাই। লর্ড কার্জ্জন বলিলেন,—"আপনার মাকে বলিবেন, ভারতের মহামান্য রাজপ্রতিনিধির আদেশে আপনাকে যাইতে হইবে।" মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা না করিয়া আশুতোষ বলিলেন,—"আমার মাতা কি উত্তর দিবেন, তাহা আমি বলিতে পারি। তিনি বলিবেন, পুত্রের প্রতি তাঁহার আদেশের উপর আর কাহারও আদেশ করিবার অধিকার আছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন না।" একবার তাঁহার বিলাত যাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল,—তাঁহার খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ এজন্য আয়োজন এক রূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পিতার নিষেধে যাইতে পারেন নাই। এবার পিতার অভিভাবকত্ব নাই, তিনি স্বয়ং কর্ত্তা; কিন্তু এই নর-শার্দ্দূল মাতার বক্র দৃষ্টিতে মেষবৎ হইয়া বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর ও আশুতোষ মাতৃমন্দিরে যে পূজার ডালি দিয়াছেন, তাহা অধুনা বিপর্য্যস্ত, পথভ্রষ্ট বাঙ্গালী যুবকমণ্ডলীর আদর্শ হওয়া উচিত। বিধবা কন্যার বিবাহেও তিনি মাতার সম্মতি লাভ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং যখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার স্বল্প সময়ের অনুপস্থিতি-কালে জগত্তারিণী দেবী স্বর্গারোহণ করিলেন, তখন মাতৃশোক তাঁহার হৃদয়ে যে শেল বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বীয় আকস্মিক মৃত্যুকে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনে মাতা ভগবতী দেবীর এত প্রভাব ছিল যে, তাহা লইয়া একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিত হইতে পারে।

বিদ্যাসাগর ও আশুতোষের মধ্যে চরিত্রগত আর একটি সাদৃশ্য আছে। উভয়ের বাহির কতকটা কর্কশ; খুব শ্রুতি-মধুর, মিষ্ট বাক্যে ইঁহাদের কেহই প্রার্থীর মন মুগ্ধ করিতেন না, কিন্তু উভয়েই প্রাণবন্ত ছিলেন। পরদুঃখের কথায় উভয়ের হৃদয়ই দয়ার্দ্র হইত ও সাহায্য করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিত। মসৃণ ভাষায় আশার কুহক সৃজন করিয়া ইঁহাদের কেহই পরিণামে আশা-ভঙ্গ করিতেন না, বরঞ্চ যেখানে প্রার্থীর মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতেন, সেখানেও ইঁহার বাক্য-পল্লবের বাহুল্য সৃষ্টি করিতেন না। কখনও কখনও বাঙ্গলার ব্যাঘ্র, প্রার্থীরা বিরক্ত করিলে, ব্যাঘ্র-গর্জ্জনে তাহাদের আতঙ্ক উপস্থিত করিতেন, কিন্তু তাহাতে দয়ার প্রস্রবণ শুকাইত না। ফল্গু-নদীর মত দয়ার প্রবাহ বাহ্য ব্যবহারের শুষ্ক বালুকা-স্তূপের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হইত। বিদ্যাসাগরের ব্যবহারও মাঝে মাঝে উগ্র, এমন কি কঠোর বলিয়া মনে হইতে পারিত। প্রথম দিন আমি যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতার প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিলেন,—"তুই কি পাশ?" আমি বলিলাম,—"ইংরেজীতে অনাস সহ বি, এ, পাশ করিয়াছি এবং মফঃস্বলের এক হাইস্কুলে হেড্ মাষ্টারী করিতেছি।"

"তোর বাড়ী কোথায়?"

"ঢাকা জেলায়।"

"ও তোর চাকরি হ'বে না, ছেলেরা বড় দুর্দ্দান্ত, বাঙ্গাল নিয়ে বড্ড টানা-হেঁচ্ড়া করবে। তোর কথায় তো স্পষ্ট ঢাকার টান রয়েছে, এই উচ্চারণ নিয়ে তুই একদিনও ক্লাসে পড়া'তে পার্‌বি নে।"

অবশ্য ইহার পরে ছাত্রগণকে পড়াইতে দিয়া তিনি আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং আমাকে একটি চাকুরি দিতে চাহিয়াছিলেন; নানাকারণে আমি তখন মফঃস্বল হইতে আসিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই।

কিন্তু এই প্রথম সম্ভাষণটা কিরূপ? প্রথম পরিচয়ের দিনেই এরূপ মুখের উপর 'বাঙ্গাল' বলিয়া গালি দেওয়া কি ভদ্রতা? অথচ তাঁহার এই রুচি-বিগর্হিত, 'অভদ্র' কথায় আমার মনে কিছু মাত্র জ্বালা উপস্থিত করে নাই, কারণ, সেই পুরুষবরের চক্ষে 'বাঙ্গাল' ও পশ্চিম বঙ্গের লোকের কোন বৈষম্য ছিল না, বরঞ্চ তাঁহার কঠোর উক্তির মধ্যে যেন অতি নিকট গুরুজনের কথার একটা মাধুর্য্য ছিল। তিনি 'বাঙ্গাল' সারদারঞ্জন রায়কে তাঁহার কলেজের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন।

আমি একস্থানে লিখিয়াছি, আশুতোষের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত খর্জ্জুর বৃক্ষ। সেই ব্যবহারের কর্কশ, বাহ্য রূপ একেবারেই ভিতরের অমৃত-রসের সন্ধান দেয় না। অথচ মানুষের দুঃখ দেখিলে, আর্ত্ত ও শোকাভিভূত ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিলে অতি

অল্পক্ষণ পরেই আবিষ্কার করিত যে, তাঁহার বাহ্য কঠোরতা নারিকেলের ছোবড়ার মত,— উহার ভিতরে উৎকৃষ্ট পেয়—মৃত-সঞ্জীবনী রস সঞ্চিত আছে।

বঙ্গভাষার উন্নতি-কল্পে আশুতোষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করেন নাই। তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে কোন উল্লেখ-যোগ্য অবদান করিয়া যাইবার অবসর পান নাই। কিন্তু তিনি এই ক্ষেত্রে যে কল্পতরুর বীজ বপন করিয়াছেন, তাহার ফল বাঙ্গালী জাতি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া উপভোগ করিবে। ভগীরথ গঙ্গার সৃষ্টি করেন নাই কিন্তু তিনি খাদ কাটিয়া গঙ্গাধারা বহাইয়া দিয়াছিলেন। সেইরূপ আশুতোষ স্বয়ং সৎসাহিত্যের সৃষ্টি না করিয়াও ইহার ধারা বহাইয়া দিবার জন্য অমৃত-কুণ্ডের খাদ কাটিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলাভাষার ভিত্তি-ভূমি তিনি এরূপ সুদৃঢ় করিয়াছেন যে, এখন ইহার উপর যে কোন বৃহৎ ইমারতের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মেকলের আইন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে, ঠিক এক শতাব্দী পরে, উল্টাইয়া দিবার বিধি প্রণয়ন করিবার তিনিই প্রধান পাণ্ডা; রাজা রামমোহন ও মেকলের চেষ্টায় বাঙ্গলাভাষার পাট শিক্ষামন্দির হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল। সেই বিধি প্রচলিত হওয়ার সময় রামমোহন আর ইহলোকে ছিলেন না। কিন্তু মূলতঃ তাঁহারই সাগ্রহ চেষ্টার ফলে মেকলে বাঙ্গলাভাষার শিকড় আমাদের স্কুল-কলেজ হইতে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। আজ আশুতোষ জীবিত নাই, কিন্তু তাঁহারই বহু সাধনায় বাঙ্গলাভাষা গৌরবের সহিত পুনরায় স্কুল-কলেজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ সেই ফল পরিবেশনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আশুতোষ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলাভাষায় এম্, এ, পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এই ভাষাকে জগতের উন্নত ভাষাগুলির সঙ্গে একপাংক্তেয় করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক বিধানে বাঙ্গলাভাষার সাহায্যে জ্ঞানের সর্ব্ববিধ শাখায় প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত হইল এবং সে চেষ্টার কর্ণধার ছিলেন আশুবাবু; ইহাতে আমাদের মাতৃভাষার যে কল্যাণ সাধিত হইল, তাহা কালে বঙ্গভারতীর কর্ণে নিশ্চয়ই বিজয়-কুণ্ডল পরাইবে। আশুতোষ-কৃত বঙ্গভাষার এই সেবা শ্রেষ্ঠ কবি বা দার্শনিকের অবদানের মূল্য হইতে এক তিলও ন্যূন নহে। এই সার্ব্বজনীন শুভঙ্কর বিধানে বঙ্গভাষা অচিরে ভারতীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। একজন কবি, কি সাহিত্যিক, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, ভাষা-ক্ষেত্রে তাঁহার বেশী উপকার করিতে পারিবেন না। এক কথায় বলা যাইতে পারে, আশুতোষ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিশাল উদ্যানে অমৃত সিঞ্চন করিয়া ইহার উর্ব্বরতা অশেষ গুণে বাড়াইয়া গিয়াছেন এবং ইহার গৌরব-ধ্বজা এদেশে এরূপভাবে প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে যতদিন বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গলাভাষা থাকিবে, ততদিন তৎকৃত এই মহোপকারের ফল এ দেশ লাভ করিবে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই যে

প্রেরণা দিয়া থাকেন, তাহার উপলব্ধি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও পরোক্ষভাবে তাহা অশেষরূপ জাতীয় কল্যাণ সাধন করে। আকবর স্বয়ং লিখিতে পড়িতে জানিতেন না—এইরূপ প্রবাদ আছে, কিন্তু তাঁহার প্রেরণায় জ্ঞানের সমস্ত বিভাগ উন্নত হইয়াছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব স্বয়ং কোন মহাগ্রন্থ লিখিয়া যান নাই, কিন্তু তাঁহার প্রেরণায় বিশাল বৈষ্ণব শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। অধুনা দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষটিও সেইরূপ প্রেরণা দিয়া জগতে এক বিপুল ধর্ম্ম-সাহিত্যের ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছেন,—তিনি স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন না। যাঁহারা এইরূপ প্রেরণা দিতে পারেন, তাঁহারাই জগতের গুরু। কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও শাস্ত্রবেত্তার সমস্ত উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টা এই বিরাট্ পুরুষদের প্রেরণায় উদ্বোধিত হয়,—এই হিসাবে যিনি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, তাঁহার স্থান সময়ে সময়ে ক্ষেত্রের কর্ম্মী হইতেও ঊর্দ্ধে। কেহ যেন মনে না করেন, আশুতোষ বাঙ্গলাভাষার কোন সেবা করেন নাই, বরঞ্চ বলা সঙ্গত—তিনি এই ভাষার শ্রেষ্ঠ সেবক।

বাঙ্গলাভাষার এই সেবার প্রবৃত্তি তাঁহার রক্তের মধ্যেই ছিল, ইহা তাঁহার বংশের বৈশিষ্ট্য বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নৃসিংহ ওঝা ও আশুতোষের পূর্ব্বপুরুষ রাম মুকুঠি দুই সহোদর ভ্রাতা এবং তাঁহারা সোনারগাঁ ছাড়িয়া ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই কথা সেকালের একটি ইতিহাস, কিন্তু নিতান্ত আধুনিক কালেও আশুতোষের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার পিতামহ বিশ্বনাথ শৈশব হইতে রাতদিন কবির গান, যাত্রা প্রভৃতি তন্ময় হইয়া শুনিতেন এবং কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের একজন অক্লান্ত পাঠক ছিলেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি অতি সহজ বাঙ্গলা গদ্যে তাঁহার দীর্ঘ পথভ্রমণের বৃত্তান্তমূলক একখানি রোজনামচা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যে একটা স্থান পাইতে পারে। আশুতোষের পিতা ডাঃ গঙ্গাধর বাঙ্গলাভাষায় বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তৎসময়ের বঙ্গীয় প্রধান লেখকদের পর্য্যায়ে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা শুধু চিকিৎসা-শাস্ত্রে আবদ্ধ ছিল না, তিনি নানা বিষয়ে একজন কৃতী লেখক ছিলেন। তিনি বাল্মীকির রামায়ণের প্রায় সমস্তটা বাঙ্গলা গদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন; এই কাব্যখানি কবি রাজকৃষ্ণ রায়-কৃত রামায়ণের পদ্যানুবাদ হইতে শ্রুতিমধুর ও সুললিত হইয়াছিল। আশুতোষের জেঠতাত দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের অনেক কাহিনী তাঁহার চরিতকার মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। আশুতোষের খুল্লতাত হরিপ্রসাদ 'বিচিত্র বঙ্গ'—প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার সময়ে লেখক-সমাজে একটা স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। অথচ এই বংশে সংস্কৃত-

কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, নবগোপাল, প্রসিদ্ধ ভাগবতবিৎ পণ্ডিত কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি ব্যক্তিরা সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চ্চায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা এই উভয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ মুখোপাধ্যায়-বংশের এই শাখার বৈশিষ্ট্য ছিল। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি বাঙ্গলাভাষার প্রতি অনুরাগের বীজ আশুতোষের রক্তের মধ্যেই ছিল। তিনি বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষার একজন অগ্রদূত হইয়াও তাঁহার মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করেন নাই, বরঞ্চ যে প্রাসাদের প্রবেশ-পথে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মহারথীদের রথ সগৌরবে যাতায়াত করিতেছে, সেই সদর দরজা দিয়া তিনি বাঙ্গলাভাষার শকট বল-পূর্ব্বক চালাইয়াছিলেন! বলা বাহুল্য, এ কার্য্য তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না,—তাঁহারই বিশাল ও বলদৃপ্ত বাহু এই কার্য্যের সম্পূর্ণরূপে যোগ্য ছিল।

অপর দিকে বিদ্যাসাগর যে পরিবারে জন্মিয়াছিলেন, তাহা মেদিনীপুরের গোঁড়া টুলো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশ। সেখানে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে তখন বাঙ্গলাভাষার চর্চ্চা শুধু অশোভন ছিল না, তাহা নিন্দার বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতের কৃতী পণ্ডিত এবং শেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলাভাষা চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন, কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠার সঙ্গে নহে,—ইহা গৌরব-জনক মনে করিয়া। বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের মধ্যে গড়া, তাঁহার তেজ ব্রাহ্মণোচিত, তাঁহার বেশ-ভূষা, আত্মসম্মান-জ্ঞান, সংসারের ঐশ্বর্য্যের প্রতি উপেক্ষা, নিজের সঞ্চয় একেবারে নিঃশেষ করিয়া দান করা প্রভৃতি মহদ্‌গুণ সেই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবেরই জয় ঘোষণা করে। কিন্তু এই প্রাচীন বংশের একজন গোঁড়া এবং একশাখার লোক হইয়াও অন্ধ গোঁড়ামী তাঁহার চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই। চটি পায়ে টুলো ব্রাহ্মণ, মাথার পিছনে শিখা নড়িতেছে,—তাহার পুরোভাগটা কামানো—ইনি বিধবা-বিবাহের শাস্ত্র প্রচার করিতেছেন! চিরকাল কীটদষ্ট তালপাতা বা তেরুটপাতার পুঁথির ভূরি খুলিয়া শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার লাইব্রেরী দেখিলে মনে হইত কোন রাজাধিরাজের গ্রন্থশালা। ধারাপাত হইতে সেক্সপীয়রের কাব্য ও কালিদাসের শকুন্তলা—সকলেরই বাঁধাইটি পরিপাটী, নামগুলি পুস্তকের পৃষ্ঠায় সোনার জলে ঝলমল করিতেছে। তাঁহার বুকে উপবীত ঝুলিতেছে, অর্দ্ধম্লান থান-ধুতি-পরা, মাথার অর্দ্ধেক কামানো, বাকি অর্দ্ধের একপাশে গেরো-দেওয়া টিকি, উপানহ ধূলি-ধূসর, কাঁধে সেইরূপ চাদর ঝুলিতেছে,—অথচ রাজপুরুষদের সঙ্গে কথা কহিবার সময় নির্ভীক ও দ্বিধা-শূন্য ইংরাজী ভাষার তুবড়ি ছুটিতেছে,—ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! "আধশিরে জটজুট, আধশিরে শোভে বেণী" এইরূপ অদ্ভুত উপাদানের মিশ্রণে তাঁহার চরিত্র আমাদের চক্ষে অপূর্ব্ব হইয়াছে। এত বড় সংস্কৃতের পণ্ডিত অথচ নিবিষ্টচিত্তে, চেয়ারে বসিয়া বাঙ্গলাভাষার সেবা করিতেছেন। ব্রাহ্মণের মতই সূক্ষ্ম দৃষ্টিসহকারে সত্য উপলব্ধি

করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণ্য-দর্পে সমস্ত গোঁড়ামীর সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া সেই সত্য প্রচারে লাগিয়া গিয়াছেন।

সে সময়ের সংস্কৃত বড় পণ্ডিতের নিকট আমরা যেরূপে বাঙ্গলা প্রত্যাশা করিতে পারি, সেরূপ উদ্ভট বাঙ্গালার নমুনা অনেকেই দেখিয়াছেন। সেই, "কোকিল কলালাপ বাচাল যে মলয়ানিল তাহা নির্ঝরাম্ভ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে"—ইত্যাদি ধরণের লেখা পণ্ডিতী বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য। স্ত্রীর কাছে স্বামী পত্র লিখিতেছেন "পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নদীতীর নিবসিত কলেবরাঙ্গ—সম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত" এবং স্ত্রী স্বামীকে তাহার উত্তর দিতেছেন,—"ঐহিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য"—রচনার ভঙ্গীটা সাধারণতঃ এই প্রকার। পণ্ডিতদের ভাষার আদর্শ যাহা আমরা পাই, তাহা শুধু উদ্ভট, দুর্ব্বোধ্য সমাস-কণ্টকিত ও উপহাস-যোগ্য নহে, তাহাকেও যদি পাণ্ডিত্য বলিতে হয়, তবে তাহা বর্ব্বর-পাণ্ডিত্য ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। শুধু তাহাই নহে ঐ বাঙ্গলায় পণ্ডিতেরা মাঝে মাঝে যে সকল রসিকতা করিয়াছেন, তজ্জন্য রুচির আদালতে লেখকদিগকে বেত্রদণ্ডের যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। এই সকল পণ্ডিতদের অগ্রণী ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা। তাঁহার 'প্রবোধচন্দ্রিকার' প্রথমার্দ্ধের ভাষা পড়িয়া একেবারে স্তব্ধ হইতে হয়। মনে হয়, এই পণ্ডিতদের কি সহজ জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল? তাঁহারা যখন লেখনী লইয়া বসিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহারা ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন? অথচ সেই সময়েই বিপুল সহজিয়া-সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রের অনুবাদগুলি অতি প্রাঞ্জল বাঙ্গলা-গদ্যে দেশময় প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতেরা দারুণ ঘৃণাভরে সেই প্রচলিত লৌকিক গদ্য-সাহিত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া সংস্কৃতের অভিধান লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে বসিয়া গেলেন! ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ কেরি সাহেব মৃত্যুঞ্জয়ের বাঙ্গলা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং তাঁহার সহকারী মার্শম্যান্ বলিলেন,—"এরূপ লেখা জনসনের যোগ্য। মৃত্যুঞ্জয়ের মত পণ্ডিত জগতে বিরল; বাঙ্গলাভাষার তিনি যে আদর্শ দেখাইলেন, তাহা একেবারে নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।" কিন্তু কেরি সাহেবের মত সুচতুর লোক কিছুদিন পরেই বুঝিতে পারিলেন, এই পণ্ডিতী বাঙ্গলা সাধারণের অধিগম্য হইবে না এবং ভয়ে ভয়ে সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিতমহাশয়কে তাঁহার মনের সন্দেহ জ্ঞাপন করিলেন। তখন পণ্ডিতমহাশয় একটা লম্বা দৌড়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং যে খেউড় গাহিলেন, তাহা পরবর্ত্তী কালে 'হুতুম প্যাঁচার' নক্সার আদর্শ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নূতন অধ্যাপক।

বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা ভাষাকে যে গড়ন দিলেন, এখন পর্য্যন্তও সেই গড়ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং বাঙ্গলা-গদ্যের আদর্শ হইয়া আছে। ভাব-গম্ভীর রচনার জন্য বিদ্যাসাগরের বাঙ্গলা হইতে উৎকৃষ্টতর বাঙ্গলা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

শুধু বাঙ্গলা নহে, সংস্কৃত শিক্ষাকেও তিনি কালোপযোগী করিয়া নবভাবে স্থাপিত করিলেন। এই তীক্ষ্ণধী, সহৃদয় ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্রই হিন্দুর পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়াছেন, এবং সর্ব্বত্রই গোঁড়ামীর আবর্জ্জনা দূর করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আজীবন সংস্কৃত-ব্যাকরণের ঘুরপাকে পড়িয়া ছাত্রগণ "সহর্ণেঃ" মুখস্থ করিয়া কাল কাটাইতেন। সস্কৃত দর্শন, সংস্কৃত কাব্য, সংস্কৃত বিজ্ঞান এই সকল বিদ্যার দ্বারে প্রবেশ করিতেও জীবনে সময়-সঙ্কুলান হইত না। এই দুর্গতির হাত হইতে ছাত্রদিগকে রক্ষা করিতে যাইয়া তিনি 'উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' প্রভৃতি লিখিয়া ভারতীর মন্দিরের পথ সুগম করিয়া দিলেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যে তিনি যে দান করিয়াছেন, তাহা অমর। আমার বিশ্বাস, ভাষা হিসাবে বঙ্কিমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি হইতে ও বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, তাহার কারণ, এই যে বঙ্কিম যে ভাষা লিখিয়াছেন, তাহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ সে ভাষাকে ছাড়াইয়া তরুণদিগকে নূতন ছন্দের গদ্য লেখা শিখাইয়াছেন, শরৎচন্দ্র ভাষাকে আর একটু আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখকেরা ভাষাকে নূতন নূতন খাদে বহাইয়া দিতেছেন। বিগত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে বঙ্গভাষার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এই নব জাগরণের দিনে ভাষার আদর্শ বঙ্কিমবাবুর ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া রহে নাই। তিনি যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের গুণগরিমা এখনও নিষ্প্রভ হয় নাই, কিন্তু ভাষা হিসাবে বঙ্কিম-সাহিত্য যে অনেকটা পিছনে পড়িয়াছে, তাহাতে বোধহয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু বিদ্যাসাগর যেস্থানে আছেন, তাহার গৌরবজনক স্বাতন্ত্র্য তাঁহাকে অনুকরণকারীদের সর্ব্বপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করিতেছে। মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিত ও তাঁহার দলের লেখা এবং বিদ্যাসাগরের রচনা একেবারেই একরূপ নহে। কোন্‌টা আবর্জ্জনা, কোন্‌টা নির্দ্দোষ ও খাঁটি, ইহা ভালরূপে উপলব্ধি করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' কতকটা এই ধরণের বটে এবং এককালে এই বইখানিও 'টেলি-মেকাস্' ও 'নবনারী' প্রভৃতি দুই একখানি পুস্তক সংস্কৃতের ছন্দানুবর্ত্তী, অথচ সংস্কৃতের গুরু সমাস-বাহুল্যের কদর্যতা-নির্ম্মুক্ত হইয়া এককালে সাধারণের নিকট উপাদেয় হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের রচনায় যে গতিশীলতা, যে সহজ কবিত্ব ও আড়ম্বরহীন সহৃদয়তা আছে, সেই সময়ের আর কোন বাঙ্গলা পুস্তকে তাহা দৃষ্ট হয় না,—অথচ সংস্কৃতের পাণ্ডিত্যের দরুণ যে ভাষার বিশুদ্ধতা ও শব্দ-মনোনয়নে উপযোগিতার জ্ঞান বিদ্যাসাগরের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য হইয়াছে, তাঁহার অনুকরণকারীদের পক্ষে সেই সফলতা লাভ করা অসম্ভব। সেই জন্যই তিনি যে

স্বতন্ত্রস্থানে অবস্থিত, তাহা অন্যের পক্ষে অনধিগম্য। 'সীতার বনবাস'-পাঠকালে এখনও পাঠকের চক্ষু মুহুর্মুহুঃ অশ্রুসিক্ত হইবে। এই নব-ভবভূতির লেখায় অনুবাদের কষ্টকৃত চেষ্টার আভাষ মাত্র নাই,—ইহা যেন একখানি মৌলিক গ্রন্থ। ইহার কোন একটি শব্দ এমন নাই, যাহা রচনার কুশলতার প্রতিবন্ধক। নদী-স্রোতের ন্যায় লেখা অবিরাম গতিতে বহিয়া গিয়াছে, কোথাও একটু বাধে নাই। সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য লেখকের সমস্ত রচনার উপর ব্রাহ্মণ্য শুচিতার একটা ছাপ দিয়াছে। তাঁহার লেখা সর্ব্বত্র পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী। মৃত্যুঞ্জয়ের রুচির বর্ব্বরতা বিদ্যাসাগরী বাঙ্গলায় কুত্রাপি নাই।

বিদ্যাসাগরী বাঙ্গলা এখন পর্য্যন্তও বালক-বালিকাদের একান্ত নিরাপদ আদর্শ। তাঁহার ভাষার বিশুদ্ধতা, বাক্য-বিন্যাসের নিপুণতা, রুচির পরিচ্ছন্নতা এবং শুভ্র, নির্ম্মল, ও দোষ-লেশহীন রস-ধারা বাঙ্গালী লেখক ও ছাত্রদিগকে যে আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করিবে, তাহা সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর ও শুভার্থবিধায়ক। অথচ ভাষা ভাব-গম্ভীর হইলেও তাহা ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের লেখার যে প্রধান গুণ, তাহা এখনও বলা হয় নাই। বিদ্যাসাগরের প্রধান গুণ তাঁহার মহাপ্রাণতা। যাহা কিছু উচ্চ, যাহা কিছু ভাল, তাহাই বিদ্যাসাগরের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে, পরদুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। এই মর্ম্মানুভূতি-গুণে তাঁহার লেখায় যে প্রাণ-ঢালা করুণা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার প্রতি অক্ষরে যেন অশ্রু নিঃসৃত হইতেছে। এই সহজ হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাঁহার সমস্ত রচনা প্রাণবন্ত হইয়াছে। যে গুণে চণ্ডিদাসের কবিতা অমর, বিদ্যাসাগরের রচনায়ও সেই গুণ বিদ্যমান। তিনি কিছুই নিছক কল্পনা হইতে লেখেন নাই,—যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রাণের আবেগে, মর্ম্মবেদনার অধীর সুরে। এই আবেগ অতি সংক্রামক এবং এইজন্য বিদ্যাসাগরের পাঠক সাশ্রুনেত্রে তাঁহার পুস্তকগুলি পড়িবেন। এমন কি মাত্র দু'চার পৃষ্ঠাব্যাপী তিনি যে তাঁহার অতিশয় আদরের তিন বৎসর বয়স্কা একটি বন্ধু-কন্যার বিয়োগ-কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহাও সেই করুণা ও আবেগে ভরপুর। তাঁহার লেখনী যেন তাঁহার অশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে ও পাঠকের চিত্ত বিগলিত করিতেছে।

বিদ্যাসাগর ও আশুতোষ উভয়েই মহাপ্রাণ; যে হৃদয় হইতে বাল-বিধবার দুঃখে তাঁহার সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল, সে চক্ষু মৃত্যুর প্রাক্কালে সাঁওতালদের দুর্ভিক্ষের চিত্র-স্মরণে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল, খৃষ্টান-চালিত স্কুল-কলেজে হিন্দু বালকদিগের অভাব-অভিযোগ দর্শনে যে বাহু বলদৃপ্ত হইয়া নূতন শিক্ষায়তনের ভিত্তি-স্থাপনের প্রেরণা দিয়াছিল, সেই হৃদয়, সেই চক্ষু ও বাহু তাঁহাকে এই কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়ত সক্রিয় রাখিয়া মনুষ্যসমাজের পুরোভাগে তাঁহার সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে। আশুতোষেরও সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত চিন্তা এবং জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে

এই দেশ-সেবা বৃত্তি ও দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার ঐকান্তিক প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। শুধু বুদ্ধির তীক্ষ্নতা দ্বারা মানুষ বাহাদুরী লাভ করিতে পারে, কিন্তু মানুষের পূজার প্রতি দাবী মহাপ্রাণ পুরুষগণই করিতে পারেন। লেখাপড়া শিখিয়া লোকে বিদ্বান্ হয়, অসি ও বন্দুক চালনা শিক্ষা করিয়া লোকে সৈনিক হয়, দাঁড় ও বৈঠা-চালনা শিখিয়া লোকে নাবিক হয়, কিন্তু প্রাণ লইয়া যে না জন্মিয়াছে, তাহাকে কেহ সেই বস্তুটি দিতে পারে না এবং যে প্রাণবান্ নয়, সে মানুষ কখনও দেবতা হয় না। যে ব্যক্তিদ্বয়ের কথা লিখিত হইল, তাঁহারা নর-দেবতা।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও বঙ্গসাহিত্য

(অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

আমি সে সময়ে পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলাম। মঙ্গলবার দিন প্রত্যূষে সেখানকার স্বনামপ্রসিদ্ধ উকীল ধনপতিবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছি, দেখিলাম ধনপতি বাবু বিষণ্ণ মনে একখানি খবরের কাগজ হাতে লইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, "শুনেছেন মশাই, স্যার আশুতোষের মৃত্যু হয়েছে।" আমি স্যার আশুতোষ চৌধুরীর কথা বলিতেছেন মনে করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, সে সংবাদ তো আগেই শুনেছি।"

ধনপতি বাবু উচ্চকণ্ঠে করুণস্বরে বলিলেন—"স্যার আশুতোষ চৌধুরী নয়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ১২ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যায় পাটনা নগরে পরলোক গমন করেছেন।" এ সংবাদটা শুনিয়া বসিয়া পড়িলাম। উভয়েই নীরব রহিলাম, তারপর ধীরে ধীরে কত কথাই না হইল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র পুরীধামে এ শোকবার্ত্তা বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়িল। সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতীরে ভ্রমণ-নিরত পুরুষ ও নারীর কণ্ঠে শুধু একই বাণী "নাই—নাই—নাই—স্যার আশুতোষ নাই!" এমন সার্ব্বভৌমিক শোকোচ্ছ্বাস জীবনে আর কোন দিন উপলব্ধি করিবার সুযোগ হয় নাই। শোকের ভিতর দিয়া সেদিন এক বেদনা-জনিত সার্ব্বভৌমিক আনন্দের আস্বাদ অনুভব করিয়াছি।

সতের বৎসর পূর্ব্বে আশুতোষের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। তখন আমি তরুণ যুবক। মৎপ্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাস" সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সে সময়ে যাঁহারা আমার পরিচিত ছিলেন—সেইরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণকে ও দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দকে এক এক খণ্ড গ্রন্থ উপহার দেওয়ার

জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুরকে একখানা গ্রন্থ উপহার প্রদান করিলে পর, তিনি বলিলেন, "আপনি আশুবাবুকে কি একখানা বহি উপহার দিয়েছেন ?"

আমি বলিলাম—"না।"

তিনি বলিলেন—"কেন ?"

"কেন কি জানেন ? তাঁর কাছে আমি কেমন করে যাই বলুন তো! অত বড় লোক, কি পরিচয়ে কি ভাবে যাইয়া উপস্থিত হব!"

দীনেশবাবু বলিলেন—"আপনার বই-ই আপনার পরিচয় দেবে। আচ্ছা যাক্, কাল আমি আশুবাবুর বাড়ী যাব, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, খুব ভোরে আস্‌বেন।"

পরদিন একখণ্ড "বিক্রমপুরের ইতিহাস" হাতে লইয়া তাঁহার সঙ্গী হইলাম। সত্যকথা বলিতে কি আমি একটু সন্দিহান হইয়াছিলাম, কি জানি কি ভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করিবেন, কিন্তু পলক মধ্যেই সমুদয় সমস্যা দূর হইয়া গেল। দীনেশবাবু আমার কথা তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া মাত্রই আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অতি সঙ্কুচিত ভাবে বহিখানা উপহার দিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে সাগ্রহে বইখানা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বেশ বই তো! ছেলেমানুষ তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছ।" তারপর বলিলেন, "দেখ, বিক্রমপুর বাঙ্গালার রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বড় গৌরবের স্থান। বিক্রমপুর বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রসিদ্ধ স্থান। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' আমাদের জানাই প্রয়োজন।" এই মহাপুরুষের স্নেহময় সম্ভাষণে হৃদয়ে নূতন বল পাইলাম। নবীন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

তারপর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, আর আমি তাঁহার নিকট কখনও যাই নাই। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা, অত বড় মহতের নিকট কি কথা ও কাজ লইয়া যাইব! তাঁহার সহিত আবার কিছুদিন পরে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। সে সব কথা বলিবার আগে তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য কথার আলোচনা করিতেছি।

পৃথিবীতে কোন কোন মানুষ নেতৃত্ব লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতি শৈশব হইতেই তাহাদিগকে এমন করিয়া গড়িয়া তোলেন যে, তাঁহারা চিরদিনই প্রভুত্ব প্রভাবে জীবন কাটাইয়া যান্। স্যার আশুতোষও সেইরূপ নেতৃত্ব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, বিদ্যা, শক্তি, সাহস ও গঠনশক্তি ছিল অসাধারণ। এইরূপ শক্তিশালী ব্যক্তি কোন স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে অনায়াসে একটা বিশাল সম্রাজ্যের কর্ণধার হইতে পারিতেন। সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার পুণ্যমন্ত্র লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অতি ক্ষুদ্র কার্য্যটির মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। ছাত্রজীবনে তিনি যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন,

সে কথা আর নূতন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। স্কুল ও কলেজে তিনি ছাত্ররূপে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। সে সময়েই ছাত্রমহলে তাঁহার এই খ্যাতি রটিয়াছিল যে, 'গণিতের কোন কোন অধ্যাপক অপেক্ষা গণিতে তাঁহার মাথা খেলে বেশী।'

সেযুগে কোনও বাঙ্গালী মৌলিক গবেষণার দ্বারা জগতের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি এবিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রের জটিল নূতন সমস্যা-সমূহের সমাধানের চেষ্টা করিয়া, পাঠসমাপ্তির অব্যবহিত পরে, তিনি যে সব প্রবন্ধ বিলাতী কাগজে লিখিয়াছিলেন, সেই অভ্যাস যদি নিয়মিত ভাবে পরিচালনা করিতেন, তবে তিনি জগতের পণ্ডিতসমাজে যে প্রকাণ্ড একটা স্থায়ী নাম রাখিয়া যাইতে পারিতেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কর্ম্মজীবনে আশুতোষ আইন-ব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগে কাজ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু বঙ্গের তৎকালীন শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহাকে বিলাতের ইংরেজ গ্রাজুয়েটদের মত শিক্ষাবিভাগের উচ্চস্তরের অধ্যাপকতা দিতে রাজী না হওয়ায়, তিনি অধ্যাপক হইবার বাসনা ত্যাগ করেন। তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি কখনও কোন বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার লোক ছিলেন না, যেখানেই থাকিতেন সেইখানেই শীর্ষস্থানে থাকিতেন। আইন-ব্যবসায়েও তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন—"বিচারক ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যবহারজ্ঞ বলিয়া স্যার আশুতোষ যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা এত সুপরিচিত যে, সে সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। দীর্ঘকাল তিনি বাঙ্গলায় প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে ব্যবহার দর্শন করিয়া এই সেদিন অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে অসাধারণ খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং বিচারক ও ব্যবহারজীবী সকলের কাছে যে শ্রদ্ধা-প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা খুব অল্প বিচারকের ভাগ্যেই ঘটে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে লোকে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ব্যতীত অপর কিছুই বুঝিত না, এমন করিয়াই তিনি উহার প্রতিকার্য্যের ভিতর আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। আশুতোষের পূর্ব্বে আরও দু'চারজন বাঙ্গালী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এমন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি কর্ম্মী ছিলেন—কাল্পনিক ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখেই ছিল না বহুদূরে ছিল। আলোক যেমন পলকমধ্যে নিবিড় অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়া সম্মুখের দিক্‌টা দীপ্ত করিয়া তোলে তেমনি আশুতোষের দৃষ্টি—কোন সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি নিবদ্ধ রহিয়া ধীরে ধীরে গঠন কার্য্যে নিয়ত থাকিত। বহুদূর ভবিষ্যতের অন্ধ জগৎ ও সে দীপ্ত মহিমার আলোকে আলোকিত হইয়াছিল।

একথা বাঙ্গালী মাত্রেই অনুভব করিতে পারিতেছেন, পূর্ব্বে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র আকার দেখিয়াছেন তাঁহারা বর্ত্তমান বিপুলায়তন সৌধাবলী দেখিয়া যেমন বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন, তেমনই অন্তরের জ্ঞান মণিমালার পূর্ণ জ্যোতির বিস্তৃত বিকাশ দেখিয়াও বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছেন। ভারতের মুকুটমণি, ভারতের গৌরব-স্থল বাঙ্গালী জাতির বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, মহৎ ও বিপুল কলেবর না হইলে কেমন করিয়া গৌরব রক্ষা পাইবে, এই মহৎ আদর্শ লইয়াই তিনি আজীবন কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

আশুতোষের বজ্রগম্ভীর নাদে সেদিন বঙ্গবাসী তাঁহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেতার পরিচয় পাইল, যেদিন লর্ড কার্জ্জনের বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল। এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতিকূল হইবে বলিয়া সমগ্র দেশের বুকেই একটা সন্দেহের ছায়া পড়িয়াছিল। কার্জ্জনের ঐ অনিষ্টকর প্রস্তাবগুলির প্রতিবাদ করিবার জন্য মহামতি গোখেলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আশুতোষ উহার সংশোধনের জন্য যে ন্যায়ানুমোদিত স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালী কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার হইবার পর হইতেই তাঁহার চক্ষের সম্মুখে যেন কোথা হইতে বিশ্ব-জ্ঞান-ভাণ্ডারের বিচিত্র জ্যোতি আসিয়া এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনায় তাঁহার চিত্তকে ভরিয়া তুলিল। সেদিন হইতেই বঙ্গবাসীর জীর্ণ মন্দিরে উৎসবের আনন্দ-গীতি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, দিকে দিকে আশা-বীণার মধুর স্বরে গীত হইল—'জাগো জাগো!'

কাহারও প্রতিভা খোলে রাজনীতি-ক্ষেত্রে, কাহারও প্রতিভার বিকাশ হয় সাহিত্যে, কেহ বা বিজ্ঞান, দর্শন, স্থাপত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রতিভাশালী হইয়া স্বদেশের সেবা করিয়া থাকেন। আশুতোষের চিত্তে প্রথমে জননী বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষা, দ্বিতীয়তঃ—ভারতের বিভিন্ন জাতির মিলন-কেন্দ্র মহামানবের মিলন-তীর্থ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে গঠন করিয়া ভারতকে একতাসূত্রে বদ্ধ করাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের মধ্যেও অতি অল্প ব্যক্তিই আশুতোষের এই বিরাট্ কল্পনার কথা প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তাই সময় সময় বিদ্রোহের ভাব দেখা গিয়াছে। 'এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে' একদিন যেমন পৃথিবীর সমগ্র জাতি বিদ্যা ও জ্ঞান-লাভের জন্য সমবেত হইয়াছিল, যে স্মৃতি-কথা এখনও বিক্রমশীলা ও নালন্দার নামের সহিত বাঁচিয়া আছে, আবার কি তেমন করিয়া—বঙ্গভারতীর পুণ্যমন্দির, মহামানবের মিলনক্ষেত্র-রূপে গড়া যায় না? তিনি ভাবিয়াছিলেন—

"চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর

আপন প্রাঙ্গণ-তলে দিবস-শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি'
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস-মুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়"—

আশুতোষের কল্পনা এইরূপ ভাব লইয়াই বিশ্ববিদ্যালয় গঠন-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। পৃথিবীর সকলে জানুক, বুঝিতে পারুক, ভারত এখনও জ্ঞানে ও বিদ্যায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। এইটুকু প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তিনি সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া যাইয়া মিলনের ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

এই জন্যই তিনি এই বিদ্যাপীঠে আসিয়া জ্ঞানানুশীলন করিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্ব জাতিকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালী ছাত্রদিগের মধ্যে বিবিধ জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য নানা দেশীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। "প্রাচীন কীর্ত্তি-উদ্ধার ও প্রাচ্য ভাষার অনুশীলনের জন্য তিনি পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত-মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বিলাতের প্রাচ্য বিদ্যার এবং আরও কত দেশেরই পণ্ডিতগণ আশুতোষের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করিয়াছিলেন। "এদিকে অধ্যাপকগণের মধ্যে জাপানী, চৈনিক, দ্রাবিড়ী, সিংহলিজ, মারহাট্টা, টিবেটান্ প্রভৃতি নানাদিগ্‌দেশাগত পণ্ডিতেরা তো আমাদের বিদ্যাপীঠ অবিরত কলরবে মুখরিত করিতেছেন। কনভোকেশনের সময় সে কি দৃশ্য? কাহারও উষ্ণীষে রামধনুর বর্ণ খেলিতেছে, কাহারও কৃষ্ণ টুপি মন্দিরের চূড়ার মত উঁচু হইয়া আছে, একদিকে পার্ব্বত্য লামার রোমাবৃত শিরোভূষণের পার্শ্বদেশ চুম্বন করিয়া সিরাজাগত মৌলভির প্রকাণ্ড পাগড়ির স্বর্ণখচিত রেখাগুলি দেখা যাইতেছে। আমাদের এই বিদ্যাশালাকে তিনি সর্ব্ব জাতির মিলন-স্থান জগন্নাথক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন।" *

আশুতোষ নয়ন-সমক্ষে এই মহামিলনের চিত্র দেখিতে পাইয়া আনন্দ-গদ্‌গদ চিত্তে বলিয়াছিলেন "আমি যেন দেখিতে পাইতেছি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে স্ব স্ব দেশের ভাষার যে ব্যবধান বা প্রাচীর ছিল, যাহার জন্য পরস্পরের ভাবের বিনিময় —করিতে পারিত না, সেই ব্যবধান-প্রাচীর যেন ধূলিসাৎ হইয়াছে। এখন আর পর-পর ভাব নাই, সব এক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর কণ্ঠে গুর্জ্জরের কণ্ঠ মিশিয়া, এক অভূতপূর্ব্ব স্বপ্নময় সঙ্গীতের প্রস্রবণ ছুটিতেছে। আমি এ বিষয়ে খুব আশ্বস্ত। ভারতবাসীর একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও আত্মসমর্পণের কথা যখন মনে করি, তখন আমি বিশ্বাস করিতে

* বঙ্গবাণী (আশুতোষ-সংখ্যা)—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পারি না যে, ভারতবাসীরা কোন কাজে অসমর্থ, তা' সে কাজ যতই দুষ্কর বা আয়াসসাধ্য হউক না কেন। * * * সুতরাং

"কিসের দৈন্য, কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ ?"

একবার ঐক্যবদ্ধ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের ন্যায় একদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্রতানুষ্ঠান কর,—সাফল্য নিশ্চিত।"

কথায় বলে—"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা'"

বিনা স্বদেশী ভাষা পোরে কি আশা ?"

আশুতোষ ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন। একলব্যের নীরব সাধনার ন্যায় তিনি গোপনে বঙ্গভাষার কল্যাণময়ী মূর্ত্তি ধ্যাননেত্রে অবলোকন করিতেছিলেন, কেমন করিয়া ভাষা-জননী শ্রীবৃদ্ধিশালিনী হয়,—পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার আদর হয়—ইহাই ছিল তাঁহার কামনা, এই মহা আশা বুকে লইয়া তিনি কর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, কোথায় কি উদ্দেশ্যে তিনি গড়া-পেটা করিতেছিলেন, তাহা তখন অনেকেরই বুঝিবার মত অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। বাঁকিপুর দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে আমরা তাঁহার মুখ হইতে শুনিতে পাইয়াছিলাম—"মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়।......কবে এমন দিন আসিবে, যখন আমার শিক্ষিত দেশবাসিগণ আচারে-ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায়, চাল-চলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর মতন হইবে। কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্র-স্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা। কবে শুনিব শিক্ষিত বাঙ্গালী আর এখন বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বসমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, বা বঙ্গবাসী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হ'ন না। আজ ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভূত হয় যে, সেদিন আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে। বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহেন্দ্রক্ষণ।"

এখানে আমরা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। আমি প্রত্নতত্ত্বের গভীর গবেষণার দিকে যাইব না। অতীত যুগের তুলনায় বর্ত্তমান বঙ্গভাষার প্রসার-বৃদ্ধির মূলে আশুতোষের যে কত বড় কৃতিত্ব ছিল তাহা বুঝাইতে হইলে একটু পুরাণ কথা বলা আবশ্যক। শুধু সেজন্যই সংক্ষেপে একটু প্রাচীন কথা বলিতেছি। সে বেশী দিনের কথা নয়, যে সময়ে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সে সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীর চক্ষে বঙ্গসাহিত্য তেমন আদরণীয় ছিল না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক খানি পত্রদ্বারা এণ্ট্রান্স হইতে এম, এ, পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই বঙ্গ-ভাষায় একটী পরীক্ষা লওয়া হউক এবং বাঙ্গালাভাষায় রচনার পরীক্ষা গৃহীত হউক এ প্রস্তাব করিয়া পাঠান। সে সময়ে এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইলে অনেকেই প্রস্তাবটি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাহেব ও তদ্‌পক্ষীয় ব্যক্তিগণ বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা কি একটা ভাষা! বাঙ্গালাভাষায় পাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব। বাঙ্গালায় আবার পরীক্ষা!" পণ্ডিত মহাশয়গণ ও মুসলমানগণ সকলেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আশুতোষ এ প্রস্তাবটি রক্ষা করিবার জন্য একঘণ্টা কাল অনলবর্ষী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।......এই প্রস্তাব দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে, কিরূপ কল্যাণকর তাহা ওজস্বিনী ভাষায় বিবৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু একাদশ জন সভ্য ব্যতীত আর সকলেই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।

আশুতোষ এই ভাবে প্রথম ভগ্নমনোরথ হইয়াও হ'ন নাই। তিনি অনুকূল মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় রহিয়া বহুদিন পরে প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে এম, এ, পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা গৃহীত হইবে এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া আজ বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা মনে করিতেন যে 'বঙ্গভাষা সেদিনের ভাষা' আজ সকলেরই সেই মিথ্যা বিশ্বাস দূর হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গলাভাষার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি, ইহাই হইতেছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐতিহাসিক গবেষণার ফল। পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতেন যে সংস্কৃতই বঙ্গভাষার জননী, কিন্তু এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে,—প্রাকৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার জননী। সংস্কৃত উহার জননী নহে। জনসাধারণের ব্যবহৃত শব্দ হইতে ভাষা বিবিধ রূপান্তরের মধ্য দিয়া আসিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে।

আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি বঙ্গভাষার আদর বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়, তাহা হইলে দেশ-মধ্যে সাহিত্য-সেবার প্রতি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও দৃষ্টি পড়িবে। নচেৎ অনাদৃত বঙ্গভাষার প্রতি শিক্ষিত সমাজের কোনও আকর্ষণ থাকিবে না। আর বাল্যকালে ছাত্রগণ যদি বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে বাঙ্গলার এই অনুরাগ যৌবনে বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষানুরাগী করিয়া তুলিবে, জননী বঙ্গভাষারও প্রকৃত উন্নতি হইবে। তাঁহার এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আজ সফল হইয়াছে। আজ দেশের সর্ব্বত্র বঙ্গ-সাহিত্যের আদর। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়িবার জন্য, বঙ্গ-কবির বাণী শুনিবার জন্য, বঙ্গ-রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিবার জন্য আজ সকলের প্রাণেই নবীন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। কবি গাহিয়াছিলেন,—

"এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে।"

আজ সেদিন আসিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও আসিবে। ধীরে ধীরে বঙ্গ-সাহিত্য তাঁহার আশ্রিত-বাৎসল্যে কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে, আজ ত সে কথা কাহারও অবিদিত নাই। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা হইতে এম্, এ, পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা অধীত হইতেছে—বাঙ্গালার স্কুল-কলেজে বাঙ্গালার শিক্ষক ও অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। আজ জননী বঙ্গভাষা সর্ব্বত্র আদরণীয়া। বাঙ্গালা ভাষার এই প্রসার-প্রতিপত্তির মূলে স্যার আশুতোষের প্রভাব যে কত বেশী, তাহাত আজ কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হয় না।

চৌদ্দ পনের বৎসর পূর্ব্বে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্" হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা অধীত হইবার প্রস্তাব, আমার যতদূর মনে হয়, প্রথম উত্থাপিত হইয়াছিল, তার পর বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মেলনেও এ বিষয় প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হইয়াছিল; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতারা সে কথা কানে শোনেন নাই। বঙ্গ-ভারতী দীনা ও উপেক্ষিতা ভাবেই কাল কাটাইয়াছেন, কিন্তু যে দিন আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার-রূপে হাল ধরিলেন, সে দিন মরা গাঙে বান ডাকিল—দীনা, মলিনা, উপেক্ষিতা বঙ্গ ভারতী বিশ্ববিজয়িনী রূপে আবির্ভূতা হইলেন। দিকে দিকে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল—বাঙ্গালীর জয় হইল,—জয়পতাকা সগৌরবে উড্ডীয়মান হইল।

দীন, দরিদ্র সাহিত্য-সেবকগণ তাঁহার করুণাদৃষ্টিতে পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন, অধ্যাপকের আসন পাইলেন—প্রাচীন কীট-দষ্ট পুঁথির পাতা উল্টাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন কবিগণের কাব্য-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, ইতিহাসের পরিচয় দিয়া ধন্য হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি-পরীক্ষার জন্যও বাঙ্গলা সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি সঙ্কলিত হইল। বাঙ্গলা ধন্য হইল—বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পাইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন এবং জগত্তারিণী-পদক প্রাপ্তির গৌরবাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহারই গুণগ্রাহিতার জন্য সম্মানিত হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহারই যত্ন ও উৎসাহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কত প্রাচীন সাহিত্য-গ্রন্থ সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

স্যার আশুতোষের মহানুভবতা ও স্নেহ আমি বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিলাম, যে বার বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন উপলক্ষ্যে তিনি ঢাকায় আগমন করেন। সে সময়ে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ, হিতৈষী বন্ধু ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম্, এ, মহাশয়ের অনুরোধক্রমে আমি "বঙ্গ সাহিত্যের ক্রম বিকাশ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। স্যার আশুতোষের সভাপতিত্বে আমি সেই প্রবন্ধ ঢাকা নর্থব্রুক হলের প্রাঙ্গণে পাঠ করিয়াছিলাম, সহরের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তিই তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমার প্রবন্ধটী একটু দীর্ঘ হইয়াছিল, অথচ স্যার আশুতোষের সেদিন সন্ধ্যায় আরও কয়েকটি স্থানে যাইবার কথা ছিল, প্রবন্ধটি যখন অর্দ্ধেক পড়িয়াছি, তখন ঢাকা কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক আমাকে বলিলেন—"প্রবন্ধটি তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলুন, ওঁর অনেক কাজ আছে।" আমি স্যার আশুতোষের দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম তাঁহার মুখে এক অপূর্ব্ব হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তুমি কারু কথা শুনো না, পড়ে যাও।" আর কেহ একটী কথা বলিলেন না। আমি মহা উৎসাহে, মহা গৌরবের সহিত প্রবন্ধটি পড়িয়া শেষ করিলাম। উপসংহারে তিনি আমার ন্যায় অভাজনকে যেরূপ ভাষায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সেরূপ উৎসাহ আমি জীবনে কাহারও নিকট কোন দিন পাই নাই। সেদিন তিনি জলদমন্দ্রে বলিয়াছিলেন—"বন্ধুগণ! আমি বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ আসনে স্থান দিব, যদি তা' না পারি, তাহা হইলে আর কোন দিন পদ্মাপারে আসিয়া আপনাদিগকে মুখ দেখাইব না।" হায়! মহাত্মা, তুমি তোমার পণ রক্ষা করিয়াও ত আর পদ্মা-পারে আসিলে না! তুমি আবার আসিবে বলিয়াছিলে, কই আর তো আসিলে না!

শিক্ষা—শিক্ষা—শিক্ষাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র! কেমন করিয়া আমাদের দেশের সর্ব্বত্র জ্ঞান-বিস্তার হয়, সুদূর পল্লীর নিভৃত কুটীরের দীন কৃষকও শিক্ষা লাভ করে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা। সৌভাগ্য-ক্রমে আমি তাঁহার একটু পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহাকে ঐ সময়ে ঢাকার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের উদ্যান-বাটীতে অভিনন্দিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, বাগানের একদিকে আমি নীরবে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে কাহার স্নেহস্পর্শে আমি চমকিয়া উঠিলাম! ফিরিয়া চাহিয়া দেখি স্যার আশুতোষ। তিনি আমার কাঁধে হাত-খানা দিয়া স্বর্গীয় চন্দ্রকুমার দত্তকে দেখাইয়া বলিলেন— "ইনি কে হে?"

আমি বলিলাম—"জগন্নাথ কলেজের সেক্রেটারী চন্দ্রকুমারবাবু।"

"বটে"! এই কথা বলিয়াই আমার কাঁধে হাতখানা রাখিয়া চন্দ্রকুমারবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কেমন আছেন চন্দ্রকুমারবাবু! কলেজের খবর কি?"

চন্দ্রকুমারবাবু বলিলেন—"আপনি পাশটা একটু কমিয়ে না দিলে যে আর পারি না! কলেজে স্থান নেই, তবু ছেলেদের ভর্ত্তি করতেই হবে—কি ব্যবস্থা করা যায় বলুনত? পাশ না কমালে ত আর রক্ষা নেই।"

পলকমধ্যে স্যার আশুতোষের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন—"দশটা কলেজ করুন না! আমি চাই দেশে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ুক, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেনি, বাঙ্গালা দেশে যেন কেউ না থাকে, আমাদের দেশের ঘরে-ঘরে, পল্লীতে-পল্লীতে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে।" চন্দ্রকুমারবাবু নীরব রহিলেন। * * * *

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এ দুইটী শ্রেষ্ঠ জাতির মিলনের কথা আজ সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারত-জননীর এই দুই বাহু মিলন দ্বারা পূর্ণ শক্তি লাভ করিয়া জাতীয় জীবনে প্রাণ সঞ্চার করে এ প্রচেষ্টা চলিতেছে। আশুতোষের সূক্ষ্ম দৃষ্টি সেদিকেও বহু পূর্ব্ব হইতেই নিবদ্ধ ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পাদপীঠে দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্যচ্ছটায় করতালির উন্মাদনায় তিনি কোনদিন ব্যাকুল হন নাই, অথচ তিনি নীরবে এই মিলনের মহাপবিত্র তীর্থ সংগঠন করিতেছিলেন জ্ঞানের পবিত্র মন্দির-দ্বারে।

সাহিত্য দ্বারাই রাজনীতির সৃষ্টি হয়। রাজনীতির মিলন চিরদিনই সাহিত্যের দ্বারা প্রত্যেক দেশেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বহু মুসলমানও বৈষ্ণব কবি ছিলেন। তাঁহারা বিরহিণী রাধার বিরহ-সঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনার ভিতর দিয়া মিলনের যে অহ্বান-বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে সে যুগে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরে আপনার জন হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম্মের মধ্যে নিরত রহিয়াও ভেদ-বুদ্ধিকে দূরে রাখিয়া শান্তিতে বাস করিতেন। মুসলমান কবিগণ যেমন পণ্ডিতদিগকে হিন্দুর আদরণীয় গ্রন্থ মহাভারতাদি-অনুবাদে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, রাজপুরুষেরাও তেমনি অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। হিন্দুগণও সে যুগে পার্সী-সাহিত্য আলোচনা করিয়া উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিতেন। মিলনের বীণা এই দুই সাহিত্যের মধ্য দিয়াই রাজনৈতিক ভেদ-বুদ্ধি, কলহ ও অশান্তি দূর করিয়াছিল। আশুতোষও সেই ভাবে মিলনের পুণ্যতীর্থ গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই মহৎ উদ্দেশ্য বুকে লইয়াই তিনি বিগত কয়েকবৎসর যাবৎ সুপণ্ডিত মুসলমান মৌলভী নিয়োগ করিয়া উর্দ্দু, আরবী ও পার্সী সাহিত্যের ধর্ম্ম, বাণিজ্য, রাজনীতি ও উপাখ্যান-গ্রন্থসমূহের অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই দুই জাতি পরস্পরের জাতীয়তা, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি জ্ঞাত হইলে ভেদবুদ্ধি আপনা হইতেই দূর হইবে, নচেৎ আমরা প্রতিবেশী হইয়াও যে কেহ কাহাকেও জানি না। তাইত এত অশান্তি ও কলহ। এইরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—"আপনি এত অর্থ কিরূপে সংগ্রহ করিবেন?" আশুতোষ হাসিয়া বলিয়াছিলেন "সে ভার আমায় দিতে পারেন। আমি ভিক্ষা করে হউক, ধার করে হউক, চুরি করে হউক, যে ভাবেই হউক টাকার যোগাড় করব।" প্রশ্নকারী নীরব রহিলেন।

গুণীর আদর তাঁহার ন্যায় কেহই করিতে জানিতেন কি না জানি না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন, যাঁহারা আপনাদের চেষ্টা ও উদ্যোগে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কেহ যদি তাঁহাদের নিয়োগ-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতেন,—"ইঁহারা ত কোন পরীক্ষায় পাশ করেন নি?", স্যার আশুতোষ হাসিয়া বলিতেন—"এঁরা নিজেরাই নিজেদের ডিগ্রী নিয়েছেন—এখন এঁদের অপরকে

দেওয়ার শক্তিও আছে।" কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা তাঁহার উদার হৃদয়-মন্দিরে স্থান পাইত না।

বাঙ্গালী কবি গাহিয়াছেন "মায়ের-দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।" এ বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন আশুতোষ। জীবনে তিনি সভা-সমিতি, রাজ-দরবার সর্ব্বত্রই ধুতি-চাদর পরিয়াই উপস্থিত হইতেন। বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন-উপলক্ষে তাঁহাকে এই ঢাকা নগরীতে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, একদল সাহেব ও সাহেবী-পোষাক-পরা দেশীয় ব্যক্তির মধ্যে ধুতি-চাদর-পরা স্যার আশুতোষের বিরাট্ দেহ হিমালয়ের মতই উচ্চ শির এবং স্বতন্ত্র ও উন্নত বলিয়া মনে হইত।

তাঁহার অধ্যয়নানুরাগ, গ্রন্থ-প্রীতি এ সকল কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। স্যার আশুতোষের ন্যায় বিরাট্ পুরুষ কবে কোন্ যুগে আবার এই হতভাগ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই বলিতে পারেন। সত্যসত্যই—

"বিরাট ভুবন মাঝে আজি
জ্বলে তব বিরাট্ সুকৃতি।
অন্তরের অণুতে অণুতে
জাগে তব অতুলন প্রীতি!
যা' ছিল কল্যাণকর শুভ
তাহাতেই ছিলে তুমি ধ্রুব;
গৌরব-আসনে তব চির প্রতিষ্ঠিতি।
স্বদেশ তোমাতে ধন্য, ধন্য তব স্মৃতি।"

ভারতের সমগ্র জাতির সাধনাকে এক ভাবে গ্রথিত করিয়া তুলিবার ন্যায় মহৎ কামনা তাঁহার ছিল বলিয়াই তিনি সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত পার্থক্য বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন। যে অনাবিল স্নেহধারা প্রিয় পরিজনের কল্যাণের জন্য গোপন বক্ষে নিয়ত প্রবহমান ছিল, তাহাই জাহ্নবীর বিশাল জলধারার ন্যায় বিস্তৃত হইয়া সমগ্র জগদ্বাসীকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। তাই আশুতোষ ভারতবাসী সকলেরই প্রিয় জন ছিলেন। তাঁহার গৃহদ্বার সকলের জন্যই অবারিত ছিল, যথাসাধ্য সকলকেই তিনি সমানভাবে সাহায্য করিতেন; যাহার জন্য হয়ত কিছুই করিতে পারিতেন না, তাহাকেও হাসি-মুখে বিদায় দিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে একদিকে যেমন দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি সমুদয় বিদ্যারই সমাবেশ করিয়াছিলেন, তেমনি ললিতকলা-সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। চিত্রবিদ্যার সম্বন্ধেও কতবার বক্তৃতা দেওয়াইয়াছেন। বিলাতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় সঙ্গীত-বিদ্যাও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল। কিন্তু সে বাসনা তিনি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

শব্দ-সূচী

অ

আ

ই

উ

এ

ও

ক

ফ

য

র

ল

হ

OPINIONS ON

"BRIHAT BANGA"

(GREATER BENGAL)

By

Rai Bahadur Dr. Dinesh Chandra Sen, D. Lit.

Complete in about 1400 pages of Royal 8vo size

in two volumes

PUBLISHED BY

THE CALCUTTA UNIVERSITY

With 352 illustrations.

Price Rs. 12/-

The Amrita Bazar Patrika (24th May, 1936)

(Written by Mr. Hirendra Nath Datta, M. A., P. R. S., one of the foremost scholars and educationists of Bengal)

Rai Bahadur Dr. Dinesh Chandra Sen has laid on the Bengalee-reading public a heavy debt of gratitude by publishing this monumental history of Greater Bengal (*Brihat Banga*) in two volumes, covering 1400 pages of 8vo size. It traces the history of Bengal from pre-historic times to the battle of Plassey which made the East Indian Company, the master of Bengal with the immediate sequal of that battle. The book is embellished with 354 illustrations. Among these many are new and original including portraits of Gupta kings, specimens of artistic works prepared by Bengalee women, paintings of Mashkaris and Patuas, reproductions of indigenous art exhibited in mats and muslins,—of various artistic poses of men and women, *Sankirtan*-scenes of the 17th century, carvings on wood and stone, portraits of Vaishnava saints from the time of the Chaitanya Deva to comparatively recent times, of the poet Ramprasad Sen and his wife, of Mohonlal and Jaynarayan Ghosal and many other men of historic fame such as Dipankara, Mahabira, Rupa and Sanatana etc. Most of these had to be collected by the author himself at great trouble and expense, and we note with pleasure that the Maharajah of Tiperrah has made substantial contribution to reduce the burden of debt which the author had to undergo in this connection. But it is a matter of some regret that a substantial part of his unique collections should have passed out of Bengal proper to the royal palace of Agartala.

The book is divided into 17 chapters, each chapter being subdivided into sections, with a supplementary chapter dealing with provincial histories and has an introduction covering 53 pages in which the salient conclusions of the book are re-capitulated with interesting details. We may give two illustrations namely the prowess of the ancient and mediaeval Bengalees—all based on authentic records—how the Gangaradi warriors faced the world-conqueror Alexander the Great and compelled him to retrace his steps—how in the 1st century B. C. the Roman poet Virgil wrote about them—'On the doors will I represent in gold and ivory the battle of the Gangaride and the arms of our victorious quirinius—how in the 12th Century the historian Kalhana spoke of the marvellous valour of the Bengalee forlorn hope, a mere handful, who set out to avenage the assassination of their king;—how the little army with which Clive did such wonders at Plassey was raised chiefly from Bengal and how Walter Hamilton later recorded—'At an early period of our military history in India they (the Bengalis) almost entirely formed several of our battalions and distinguished themselves as brave and active soldiers.' As may be expected, the Bengali people in those days were not the dumb, driven cattle into which they have now degenerated but revolted when they were oppressed by their kings and made and unmaid monarchs. The author has brought to light several instances of this in Tipperah, and among the Pala Kings and even in Assam, so late as 1780 A. D.

It should be noted that the book is not merely a chronicle of kings and potentates, statesmen and generals and wars and warriors but lays particular stress on social evolutiions and literary, religious and artistic movements in the different periods of Bengol's national life. There are special chapters which deal in detail with the rise and decline of the great Buddhist univer

sities at Nalanda, Vikramasila and Odantapur, of the tols of Nadia, of the New School of Logic, with the history of Tantriks and Tantrikism, with the lives of prominent Buddhist, Jaina and Vaishnava leaders, the growth, development and excellence of Dacca muslins and Shell and other industries, and various other features of the cultural and economic life of the people.

It is interesting to note that the author in the course of his researches and to secure materials for his history, has not only gone to the orthodox sources. such as, historical and semi-historical works, inscriptions, coins, copper plates. *karikas* etc. but has laid under contribution. 'Palli-gathas', some of which he himself was instrumental in bringing to light some years ago. This is a new departure and has yielded a rich and fruitful harvest—though we must say, in some places the author has given them more importance than is their due, from the view-point of history.

The result is a detailed and and complete account of Bengal and Bengalees from remote times, set forth in an interesing and eminently readable manner. To illustrate what we mean, let us put the table of contents of one of the 17 chapters taken at random. Let us take Chapter V. The followiug is a list ot its contents :—

Bengalees—the true heirs of Magadhan culture—Greek influence on Hindus and vice-versa—The Mauryas after Asoka—causces of the downfal of the Mauryas, curtailment of Brahmanical authority, forbidding of aminal sacrifices, uniformity of punishment, weakness of Asoka's decendants—Decline of Kshatriyas—The Agnikuls The Sunga Dynasty—its history—The Kanva and Andhra dynasties—The Raghus—The Dynasty of the Pauravas—Siva vs. Buddha—Similarity in ideals between Buddhism and Saivaism—The new gift of the Saivas—Three great

virtues—Saivism as a harbinger of the Vaishnava message of love.

Let us select three incidents, also at random, from different sections of the book so as to bring home to the reader the author's treatment of the topics included in the book We refer to the accouuts of the great Buddhist teacher Atisha Depankara, the Bengalee hero Pratapaditya who stood up against the might of Akbar himself, and the battle of Plassey, a toy-battle in proportions but with momentous concequences for India and the British Empire. In each case new or little known facts are brought to light adding colour and freshness of details. The reader will also find the rise, decline and fall of the Pala Empire full of interest, as well as the beginnings of Vaishnavism in Bengal and its efflorescе in the time of Sri Chaitanya and the introduction of Kulinisim by the Sena rulers of Bengal.

Altogether we commend the book to the scholarly student as well as to the general reader. The work shows much industry and pains-taking reseach and wide reading and discrimination The author has apologised in accents of humility for what he calls his first attempt in the domain of history. This apology seems uncalled for, because, we see in the book the ripe result of a life-time of literary activities. We do not suggest that the book has no blemeshes or that with regard to controversial topics the author's conclusions are invariably correct. As we all know, none can say the final word in a book on history because as new facts are brought to light year by year, old and even well-established conclusions have to be revised, or at least have to undergo readjustments. We may however, take leave to make three suggestions for the consideration of the author. The first is that there ought to be a full bibliography of the books, inscriptions etc. made use of in compiling this

history. Next the word-index of 64 pages should be broken up into two—after the latest European fashion, namely, an index to proper names and a subject-index, and thirdly there ought to be more copious foot-notes, indicating the sources and authorities on which the author's conclusions are based—in many places relieving the text of these details.

The Advance (14th June, 1936)

'Brihat Vanga' (in Bengali) in two volumes, by Rai Bahadur Dr. Dinesh Chandra Sen, D. Litt. Published by Calcutta University. Price Rs. 12-

A progressive people must have a historian to provide them with a correct knowledge of the different phases through which their culture and civilization passed in the successive epochs of their existence, of the origin and growth of their political, social and economic institutions, of the secret springs of their collective action; for without such accurate guidance from the past it becomes impossible to solve their present problems, or to find out channels of an all-round national expression most suited to their intrinsic genius and abilities. The researches of several generations of scholars in India and abroad have made it abundantly clear that this country occupied a significant place in the ancient and mediaeval history of the world, and that the culture and institutions brought into being and developed here centuries ago were of a highly advanced and intricate character

with their potentialities not yet exhausted. But the materials on which their studies were based had to be collected from diverse sources, and these had to be sifted scientifically before any conclusion could be drawn ; this process of historical reconstruction has not yet come to an end, and hence it is often held by hyper-critical scholars that the time for writing a connected history of this country is still to be waited for. Lack of materials or the hypothetical character of our knowledge in respect of some problems should not, however, deter us from attempting a stock-taking of the progress already achieved in historical research. There was a real demand among the educated public of Bengal for a comprehensive history of the province, and this has been ably met by Dr. Dinesh Chandra Sen's recent publication, Brihat Vanga (A History of Greater Bengal in Bengali) which gives a vivid portrait of Bengal drawn on a broad canvass of historical phenomena which, touching the yet indistinct fringes of Vedic and Mohenjo-daro life, and comprehending the dim expressions of pre-historic culture and art, cover in their sweep and range almost every manifestation of national will and genius till the middle of the 18th century. It is a book in which Bengal will expect to discover her hidden soul.

The idea of producing a complete history of the Bengalee race by collaboration among Indian and European specialists took a preliminary shape at Government House nearly two decades ago, when Lord Ronaldshay's (now Marquess of Zetland) Secretary, Mr. Gourlay invited the co-operation of Dr. Dinesh Chandra Sen in preparing some of the literary chapters of the work under contemplation. Unfortunately, the scheme did not materialise, but Dr. Sen who had been associated with it since its inception stuck to it with a consistent resolution and made up his mind to write the entire history himself. The work that has just been published

contains the results of patient and phenomenal studies extending over many years ; and the pioneer historian of Bengali literature now appears before the public as the pioneer historian of the Bengali people with his old reputation not only fully sustained but also heightened in his latter role. The facility and ease with which he has carried out his plan must have come to him in a manner which only a veteran scholar can aspire to command. It must be admitted, however, that it would have been impossible for the author to have conceived and executed his work on such a portentious scale in the absence of a large body of material which has already accumulated through the labours of other writers and scholars. Dr. Sen himself had been an explorer and interpreter of valuable treasures of Bengali literature for nearly forty years before be set himself to the task of taking this comprehensive survey.

Dr. Sen's 'Brihat Vanga' is complete in two volumes of 1215 pages royal 8vo size, including a carefully prepared word-index, a list of illustrations with a table of contents and an introduction covering nearly fifty pages. The first volume contains fifteen chapters divided into several sections, bringing the account to the end of Hindu rule, and the subsequent history till the Battle of Plassey is treated of in the second volume which is, again, divided into 18 chapters with many sections. The last chapter in this volume is the longest in the whole work, a considerable part of which is devoted to local and provincial history, such as the accounts of Tipperah, Cooch Behar, Cachar, Sylhet, Manipore, Midnapore, Vishnupur, Pragyotishpur, Sundarban (the history of this region was compiled for the author by Mr. Kalidas Datta), etc. The author is definitely of opinion that, culturally speaking, Bengal denotes a far wider region than is officially recognised under the present British Administration, justifying him in giving the title 'Brihat

Vanga' to this work which claims to deal with the history of the Bengali people. Bengal which in this extended sense participated in the development of what the author describes as Magadhan culture subsequently became its sole custodian when the political organizations of Magadha (ancient Bihar) decayed. To this heritage Bengal made rich original contributions and under its banner attempted with signal succes large conquests, not merely confined to her immediate neighbourhood but even spreading far beyond the geographical limits of India. The author has not only emphasised the essential contacts between the currents of Indian culture and the movements which originated and flourished in Bengal, but has also attempted to indicate what he regards to be the special features of Bengal's genius, contributing towards the enrichment of Indian civilization as a whole. In giving a chronological narrative of this history, Dr. Sen exploits almost every source of evidence that may be imagined: he collects his data from the Vedic literature, the epics and the Puranas, the Buddhist and the Jaina literature; he examines the relics of Mohenjo-daro and Harappa, the prehistoric antiquities of Singanpur and other places; he reads with great avidity the English translations of Greek, Latin, Chinese and Tibetan writers on Indian history; with equal enthusiasm he gathers his materials from different branches of archaeology, from hundreds of inscriptions, numerous coins, temples and other buildings; he constantly draws upon the vernacular literature, accounts of Moslem historians, of European travellers, Sanskrit and Prakrit works of different periods, innumerable legends, and stories and ballads, and also little known historical chronicles compiled in Bengali. He does not in fact reject any thing but includes all that can be found, giving each some degree of recognition in the narrative that he has provided for his readers. The material collected is enormous in bulk and proportions and

the history that he has built up embraces practically every phase of our national life, political, religious, economic, literary, artistic, etc. He speaks of the rise and fall of dynasties, their conquests, triumphs and defeats, the origin and development of universities and other centres of learning, the saints and scholars of Bengal, organizers and leaders of social and cultural movements, her arts and crafts and industries, folklore, sports and dance, her navy and architecture, religious transformations and upheavals, intellectual subtleties, domestic life and ideals, love, romance, racial assimilation, local feuds, patronage to arts and letters and various other subjects too numerous to mention.

That which has considerably enhanced the value of the work is its wealth of illustrations : there are more than three hundred of them scattered in the two volumes. Among these there are scenes depicting the victory of Vijaya over the Yaksha Kalasena and his coronation in Ceylon, portraits of Rahula, son of Buddha, Sariputra, Maudalyayana, and Atisa Dipankar, of Alexander, the Great, Puru, Asoka, Kaniska, Sasanka and many other rulers, pictures of various deities, Buddhist and Brahmanical, of animals (stone, terracotta and wooden figures), of chariots, muslins, jewellery, alpana, embroidered mattresses and cloths, painted book-covers and various other specimens of indigenous art illustrating scenes and episodes from Bengal's domestic life. They were collected from various sources, and it can be said without contradiction that perhaps there is hardly any other book on Indian history which presents such an excellent and representative compilation from the point of view of art. Dr. Sen has also made use of his own private collection, which to judge from some of the illustrations given, must be of unique excellence and rare value. As he says in his Introduction, this has already been transferred to Tipperah to form the nucleus of a museum to be set up by its present enlightened chief.

It will not be out of place to add here a few words about the method followed by the author in the general presentation of his theme. The one thing that will strike every reader is his fascinating style; it makes the dead bones of history spring into life. Here history has been given such an interesting literary garb that the book can easily take a front rank among the classics of modern Bengali. And what about the facts which the author has couched in his inimitable style? Most of them are taken from authentic sources, which the author acknowledges in a general way in his introduction or in the body of the book. Where the author gives such facts, he cannot be singled out for criticism. Where, however, he supplies new facts, those that he has himself discovered as a result of his personal studies, or by utilising sources with which others may not be familiar, further research alone will prove the soundness or otherwise of his conclusions. Nowhere he claims finality in a dogmatic manner. In all fairness he demands that the same rigid scientific test should be applied to inscriptions, which are often full of exaggerations as much as to traditions. He has found it necessary to record legends and traditions also, for there may be some historical truth in them and if steps are not taken now to preserve them, they may be entirely lost afterwards. Nothing can be said against the sobriety of this view if it is not carried to an absurd length, if legends are not pitted against evidence that has been definitely established. Dr. Sen has the critical awareness of a modern historian inasmuch as he appreciates the standpoint that subtle forces operate in producing great events and phenomena in national life and developing or changing national character and outlook. He shows that India's contact with diverse races was on the whole good for her, that it was certainly a glorious epoch when Bengalees were a sea-faring people and had opportunities of contact with and assimilation of foreign cultures. If

he criticises any particular institution, it is wholly on historical grounds as he finds them after a searching analysis, and as in treating of orthodoxy, Kulinism or decadent Buddhism he does not forget to give the other side of the picture. He shows how one event leads to another, how one system of thought, or cult slowly and imperceptibly merges into another, how national activity arrested in one direction seeks an altogether novel outlet and may ultimately find it. He has a historian's sense of the clash and intermingling of ideas and ideals, the strong and weak points of conservatism and orthodoxy, the spirit of revolt that seeks its satisfaction in bold speculations and experiments. If with the advent of foreign hordes in the 13th century, the Hindu lost their political power and their social and religious life faced a great and persistent onslaught, they brought into being on one hand an invincible social organisation uncontrolled by State and on the other a free and untrammelled spiritual force that manifested itself in new creative forms. If for want of support and encouragement and in view of iconoclastic activity, sculptural and allied art decayed and died, it did not mean the end of art in Bengal. Its technique and traditions were preserved to a certain extent by the womenfolk of Bengal and her illiterate artisans and craftsmen. Thus history as interpreted by Dr. Sen is a study in the continuity of things, in the action and inter-action of forces which must be analysed with insight and imagination. In the reconstruction of Chaitanya's life, he has for the time being put aside his personal devotion to treatises of a predominantly theological bias, and has shown all his skill in using his apparatus of historical research and discrimination in achieving his task. It is remarkable to notice that no other scholar before him has shown with such overwhelming evidence how much Bengal owes to women and the so-called lower classes of her society in the evolution and preservation of her distinctive culture. It will

not be enough to say that Dr. Sen has done his work just as any other scholarly writer may have done it. There are chapters in his book where a mere scholar would have found it difficult to vie with him in the abi[l]ility to envisage crises and transitions in our national life and to portray them in a clear, forceful and convincing style. Dr. Sen writing this monumental history after retirement from service retains the freshness of outlook, the sensitiveness and vigour of perceptions, which one generally associates with youth. In a book that has been planned on such a vast scale as Dr. Sen's 'Brihat Vanga', giving such infinite details of our national history it is but natural to come across theories or conclusions on which there are likely to be differences of opinion among scholars. The reviewer himself has some times found himself in disagreement with the author but this is not the place to enumerate controversial topics. The only suggestion that he may be permitted to offer here is that the inclusion of some good maps in a future edition of the book would be greatly appreciated. On the foundations which Dr. Sen has laid, further systematic studies of Bengal's ethnology and jurisprudence would be considerably facilitated. It was not for men of the cold intellectual type to have produced the kind of history which the present author has done. The extraordinary degree of sympathy which be possesses in addition to wide reading and erudition has given him an insight and understanding with which very few of our scholars are endowed. The value of such a work assuredly does not depend on what opinion others may entertain about this or that point of history, agreeing with or differing from the author, nor is its importance diminished by the fact of some slight mistakes having probably crept into it. The work as a whole will be judged stupendous and magnificent; there are again chapters in it, for example, those dealing with the universities of Nalanda, Odantapuri, Mithila and Navadwip, with

Atisa Dipankara and other saintly scholars, with Muslin and similar industries, with political and chronological history, and last not least with Art in all its various expressions, which are simply superb and call for special mention, as the materials brought together in these portions are accessible only to specialists, and their treatment is also most original. It is needless to refer in this connexion to sections devoted to literary classifications, for in this field he is known to be an authority. The book is full of precious suggestions as to new and unsuspected avenues of research in various directions, which should attract any number of young scholars in this province. Dr. Sen's 'Brihat Vanga' is a book of permanent value and interest; it will prove indispensable to scholars and specialists as well as to general readers; it will survive all carping criticisms and is destined to live through generation. The author in an incidental remark in his Introduction compares Bengal in her present decline to a crematorium but if a new nation is born out of the ashes of the old, of which there were hopeful portents on every side, not a small measure of credit will belong to Dr. Dinesh Chandra Sen for having devoted all his life and energy to bringing about that happy consummation and being one of its path-finders on its journey towards Recovery and Progress.

The University of Calcutta must be congratulated for having published a work of such far-reaching importance. The price which is Rs. 12 per copy should be considered very cheap in view of the printing and get-up which leave nothing to be desired. It is a book that ought to be on the shelf of every cultured and scholarly Bengalee, a book that deserves the widest publicity.

The Forward (9th Sept., 1935)

BRIHAT BANGA (Greater Bengal)—By Dr. Dinesh Chandra Sen. Published by the Calcutta University. pp. 1400.

Dr. Sen's contribution in the field of Bengali literature and towards the development of Bengali language, will remain ever brilliant in the national history of Bengal. His contributions and researches are so well-known in the province, nay in India that hardly he needs any introduction to the intelligensia of the eountry. His present book which is a big volume is a unique presentation to the people, who love. to read the glorious chapters of Bengal's contributions towards cultural development of India.

The long preface of the book gives an elaborate survey of its contents and also deals with many points not included in the text. It traces the history of Greater Bengal from the pre-historic period of the Epics and closes with an account of the days of the Battle of Plassey. The illustrations which number 352 are mostly original. The figures of many of the Gupta kings enlarged from the originals found in their coins, the artistic designs and specimens of fine works of Bengali women wrought with extreme elegance, the paintings of 'Maskaris' and 'Patuas,' indigenous art illustrated in beautifui mats and designs of Muslin,—in the conception of various poses of men and women, 'Sankirtan'-scenes of 17th Century and a large variety of carvings on wood and stone of various ages, above all the figures, mostly true to life of Vaisnava apostles from the time of Chaitanya down to comparatively modern times, the likeness of our saintly poet Ramprosad Sen and of his wife Ja ada Devi—of Mohanlal and Raja Nrishinga Dev and Jaynarain Ghosal and other great men sueh as Dipankur, Mahabir, Rup and Sanatan are included in the pictorial illustrations of the book. The political history forms thse background of the book. The main

stress is laid on social evolutions, literary, religious and artistic accounts of our history. It treats of the rise and decline of the Buddhist monastaries of Nalanda, Vikramshila, Uddantapur, of the tols of Nadia, of the flourishing days of Dacca-Muslin and Shell-industry, of the new school of logic in Bengal, of the Tantriks and Tantrikism, lives of great Buddhist, Jain and Vaishnava apostles and various other topics. The book will be of immense help to the students who want to know the glorious chapters of their country's past.

THE ANANDA BAZAR PATRIKA

The most popular and the most widely circulated of all Indian and Anglo-Indian papers of India devotes its leader of March 18, 1936 to the review of the book. It says :—

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—বাঙ্গালী জাতির কোন ইতিহাস লিখিত হয় নাই, অথচ তাহারা একটা সুপ্রাচীন সভ্যজাতি—তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তি-চিহ্ন এখনও চারিদিকে বিদ্যমান। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও একবার সক্ষোভে বলিয়াছিলেন,—বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি, সে নিজের ইতিহাস জানে না। তারপর বহুদিন অতীত হইয়াছে, কয়েকজন অক্লান্তকর্ম্মী বাঙ্গালী ঐতিহাসিক বাঙ্গলার খণ্ড খণ্ড ইতিহাস লিখিয়াছেন,—বাঙ্গলার কয়েকটী জেলার ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গুপ্ত, পাল ও সেন যুগের গৌরবময় কাহিনীরও কিছু কিছু পরিচয় আমরা পাইয়াছি কিন্তু বাঙ্গলার সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ একখানি প্রামাণ্য ইতিহাস এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হয় নাই, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। প্রতিভাশালী ঐতিহাসিক, মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কর্ত্তা স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলার একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ; একখানি আংশিক ইতিহাস তিনি রচনাও করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

স্বল্পায়ু ও ভগ্ন-স্বাস্থ্য তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে প্রবল বাধা হইয়াছিল। বঙ্গলার সম্পূর্ণ ইতিহাস তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই ; যে সব ঐতিহাসিক উপাদান তিনি বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও যথাযোগ্য-রূপে ব্যবহার করিবার সময় তিনি পান নাই।

আর এক কথা। একাল পর্য্যন্ত বিদেশী বা স্বদেশী যাঁহারাই বাঙ্গলার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল রাজ-রাজড়াদের কাহিনী, বড় বড় বংশের উত্থান বা পতন, যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কাহিনীই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস তাঁহারা খুব কমই সঙ্কলন করিয়াছেন,—অথচ বাঙ্গালী এক সুপ্রাচীন সভ্য জাতি, তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতি অন্ততঃ তিন হাজার বৎসরেরও প্রাচীন ; তাহার সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম্ম, দর্শন, শিল্প-কলা, ভাস্কর্য্য জগতে কোন প্রাচীন জাতি অপেক্ষাই কম গৌরব-ময় নহে। বাঙ্গালী জাতি কেবল বাহুবলে প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নাই, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য এক সময়ে সমগ্র ভারতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাঙ্গালী জাতির এই সব কীর্ত্তির গৌরব-গাথার ইতিহাস কই? এই বিংশ শতাব্দীতে একথা আজ ব্যাখ্যা করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যে জাতি তাহার প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ করিতে পারে না, বিশ্বমানব-সভ্যতায় তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বা আশাপ্রদ নহে।

এই সমস্ত কারণে সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক লিখিত "বৃহৎ বঙ্গ" নামক গ্রন্থখানি পাইয়া আমরা অতীব আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। দীনেশবাবুর বয়স এখন ৭০ বৎসর, বার্দ্ধক্য তাঁহার দেহ আক্রমণ করিয়াছে, তৎসত্ত্বেও তিনি যে কয়েক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে বার শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী-জাতির এরূপ একখানি বিরাট্ ইতিহাস প্রণয়ন করিতে পারিয়াছেন, ইহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়—তরুণ ও যুবক ঐতিহাসিকদের পক্ষে আদর্শস্থল। প্রথম যৌবনে দীনেশবাবু দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার ফলে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস" রচনা করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে তাহার অতীত গৌরবের সন্ধান দিয়াছিলেন। তারপর অনেকেই দীনেশবাবুর পথ অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার

পাণ্ডিত্য ও সাধনার গৌরব তাহাতে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহার শেষ বয়সে রচিত এই "বৃহৎ বঙ্গ"ও আত্ম-বিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে তাহার লুপ্তপ্রায় ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিবে, জাতি-হিসাবে তাহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে সহায়তা করিবে।

এই বার-শতাধিক পৃষ্ঠায় দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট্ গ্রন্থের পরিচয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে। ইহাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাতে কেবলমাত্র রাজ-রাজড়াদের কাহিনী, অথবা যুদ্ধের সাল-তারিখ লইয়া আলোচনা হয় নাই। সুপ্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালী জাতির কীর্ত্তি-কলাপ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। তাহার ক্ষাত্রবীর্য্য ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য, ব্যবসা-বানিজ্য, রাষ্ট্র কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, কিরূপে যুগে যুগে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আর্য্য-সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতি কিভাবে বাঙ্গলার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বাঙ্গালী সেই সমস্ত প্রভাবের মধ্য হইতে কি ভাবে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতে তাহা বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে, এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। "এই পুস্তকে মগধের সঙ্গে—তথা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের সঙ্গে বাঙ্গলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে বিশেষ করিয়া মগধে যে সকল রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল, এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় তাহার অনেকগুলি চলিয়া আসিতেছে। আর্য্যসভ্যতা ও দেশীয় আচার ও রীতির ধারাবাহিকত্ব বাঙ্গালীরা যে পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ।" দীনেশবাবু আর্য-সভ্যতার তথা বঙ্গীয় সভ্যতার এই ধারার সন্ধান তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে দিয়াছেন।

অনেক আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশ্বাস, বাঙ্গালীর বিশেষ কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে সর্ব্বভারতে তাহার কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠা ছিল না। এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত, তাহা "বৃহৎ বঙ্গ" পড়িলেই প্রতিপন্ন হইবে; ষোড়শ শতাব্দী মহাপ্রভুর যুগ, বাঙ্গলার 'রেনেসাঁস্' বা পুনরভ্যুদয়ের যুগ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে গুপ্ত, পাল ও সেন-যুগে বাঙ্গালী রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে, দর্শনে,

শিল্পকলায় যে সব গৌরবময় অধ্যায় রচনা করিয়াছিল, আধুনিক শিক্ষিতেরা এই গ্রন্থে তাহার সন্ধান পাইবেন। ইহার ফলে তাঁহাদের Inferiority complex বা আত্মদৈন্য কিয়ৎপরিমাণেও যদি হ্রাস হয়, তাহা হইলেই আমরা সুখী হইব, দীনেশবাবুর শ্রমও সার্থক হইবে।

দীনেশবাবু সবিনয়ে বলিয়াছেন যে, তিনি পণ্ডিত নহেন; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই, তিনি জনসাধারণের জন্যই ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়,—"এই পুস্তক ঐতিহাসিকগণের জন্য লিখিত হয় নাই। বঙ্গের জনসাধারণের মনে স্বদেশ-প্রীতি জাগ্রত করাই আমার অন্যতম লক্ষ্য। নীরস ও শুষ্ক গবেষণায় তাহারা আকৃষ্ট হইবে না। এজন্য যদি রস-সঞ্চারের অভিপ্রায়ে ভাষায় মাঝে মাঝে কিছু রং ফলাইতে আমি চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহাতে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" দীনেশবাবুর এই বিনয় সত্ত্বেও আমরা বলিতেছি, তাঁহার গ্রন্থে পাণ্ডিত্য ও গবেষণার অভাব নাই,—যে কোন প্রতিভাশালী ঐতিহাসিকের পক্ষে এরূপ গ্রন্থ গৌরবের বস্তু। দেশবাসীর মনে তিনি যে স্বদেশ-প্রেম জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার চেয়ে বড় লক্ষ্য ঐতিহাসিকের পক্ষেও আর কিছু হইতে পারে না। দীনেশবাবুর অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।

কেবল দেশবাসী জনসাধারণ নয়, দেশের শিক্ষিত সমাজ, কৃতবিদ্য ঐতিহাসিকগণ এবং সহৃদয় বিদ্যোৎসাহী, ধনী ব্যক্তিদের মনোযোগ আমরা এই বিরাট্ গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি। এই প্রবীণ সাহিত্যিক ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও অক্লান্ত সাধনায় জাতির যে কীর্ত্তি-মন্দির রচনা করিয়াছেন, সকলের সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহে তাহা সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করুক, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ একখানি বহুমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধিতে যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। বাঙ্গলা সাহিত্যে এই গ্রন্থ দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের" মতই অক্ষয় কীর্ত্তিরূপে বিরাজ করিবে। * (আনন্দবাজার পত্রিকা—সম্পাদকীয় স্তম্ভ ৫ই চৈত্র, ১৩৪২)

---

* বৃহৎ বঙ্গ—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট্, কবিশেখর-প্রণীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Acharya Sir Prafulla Chandra Roy

I have already looked through your "বৃহৎবঙ্গ". Needless to ıy it is such a mater-piece as could have been expected from ıe pen of the historian of the Bengali Literature, It gives a ivid picture of the manners, customs and social usages of ur ancestors and the admirable array of pictures and protraits nd wood-work of which you have given faithful reproductions ıave enhanced the value of the work.

Mr. Syamaprasad Mookerjee, M. A. B. L., M. L. C., Bar-at-law, Vice-chancellor of the Calcutta University says :—

Rai Bahadur Dr. Dineshchandra Sen needs no introduction ɔ the educated public of Bengal and indeed to Indologists all ɔver the world. Nearly twenty five years ago the University ɔf Calcutta published his great work, the History of Bengali Language and Literature, which was readily acclaimed as a production of first-rate scholarly importance. Among his subsequent contributions which uniformily kept alive his reputation as a sound and inspiring scholar, his works on the ballad literature of this province have revealed a hitherto unexplored region ɔf Bengali literary genius and elicited enthusiastic admiration ɔf Estern and Western Scholars.

His recent work in Bengali, the Brihat Banga, which has ust been published by Calcutta University, gives a comprehensive history of this provinec from the earliest times to the Battle ɔf Plassey, embodying the fruits of his strenuous and unremitting research conducted notwithstanding advancing age nd physical

ailments for a period of about a dozen years. Alike in its scheme and execution the work is a stupendous venture. It rouses national pride; it fills one's heart with determination to regain for Bengal her past glory and achievements. No aspect of Bengal's history and culture has Dr. Sen overlooked. He discusses with chatacteristic force and vividness its politics, its arts and crafts, its religion and philosophy, its learning add scholarship its commercial and civilising enterprises, and last but not the least the inner aspirations of its soul. In a book of snch magnitude as Dr. Sen's. it is but inevitable that there are points on which opinion may well differ. But this will not diminish the intrinsic value of a truely masterly performance. It is a work that will stimulate others to follow in his line. It is work that will live in history, a work that will shine as a lasting montment to the fame already achieved by Dr. Dineshchandra Sen.

Dr. S. N. Das Gupta, M. A. PHD. Principal, Sanskrit College, Calcutta., says :—(the 10th Sept., 1936).

Rai Bahdur Dineshchandra Sen, the author of the "History of Bengali Literature," "Bangla Sahitya-Pari-Chaya" and numerous other works, has immolaliced himself. His name will live as long as the Bengali-peaking people will live and move about on the face of this planet. He has recently published an encyclopeadic work called "Brihat Vanga" in two volumes of over 1200 pages. He is nearly seventy years of age and the very bulk of the book shows what an ammount af indefatiguable energy *he possesses. His Zeal, industry and devotion to work are most* unsnrpassed and ought to stimulate his younager country-men

›r all times to come. I do not feel myself competent to pass a ·ifical judgment upon the merits of his work which is so extenve in scope. It may be that there will be many differences of pinion and couscientious objections to the various statements ıat he has made on various subjects of a controversial nature. f there are any errors they will be refuted by competent scholars nd in that case also we shall be grateful to him for giviug us the ccosion of many learned criticisms which will increase our knowedge on many obscure points of Indian History and Culture. Ay attention, howexer, is not directed to pickiug holes in this great vork as I am too much overcome by the magnitude of it. From he mythical period of the conqust of Ceylone to fairly modern imes he has gone forth with the easy flow of a river and one can ind in it all elements of the History of Bengal and its culture n all possible departments, floating together towards one great end, the conciousness of the greatness of Bengal. The style is smooth, easy and charming and all those who leave themselves unresistingly to its current of thought will be rewarded by a patriotic consciousncss of our great country. The consciousness of the great achievements of a country is bound to have stimulating effect particularly in these days of scepticism. The work incorporate within it not only many stern facts of history but also many tales, legends and traditions which lend a charm of romance to this great work. We are also gratful to him for this wonderful collection oi rare pictures whieh he has printed in his work at a considarable personal sacrifice. They would serve to illustrate to. us the height that we achieved in pictorial art in mediaeval times. I eongratulate Dr. Sen on the producfion of his work and the reader who will have the good fortune to read it.

Bharat Barsha (ভারতবর্ষ), the Leading Bengali Journal—Jaistha, 1343 B.S.

Written by Dr. Romesh Chandra Mozumder M.A. PHD. P. R. S, Head of the Department of History, Dacca-University and Provost, Dacca Jaganath Hall.

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেসচন্দ্র সেন বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। বঙ্গভাষা সাহিত্যের রচনার পথ প্রদর্শন করিয়া তিনি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। বঙ্গভষা ও সাহিত্য-সম্বন্ধে তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন ও বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে তিনি এই একটি মাত্র বিষয়ে যাহা করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহা পরম শ্লাঘার বিষয় বলিয়া তাহা গণ্য হইত। তিনি যদি বৃদ্ধ বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর লইয়া সাহিত্য চর্চ্চায় বিরত হইতেন—তাহা হইলেও এক জীবনের পক্ষে তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন—একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইত।

কিন্তু তাঁহার জ্ঞান পিপাসাও যেরূপ প্রবল, তাঁহার অধ্যবসায়ও তেমনি অদম্য। শেষ বয়সে বিশ্রামলাভ করিবার প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি যে দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। সম্প্রতি ‘বৃহৎবঙ্গ’ নামক তাঁহার এক অতি বৃহৎ গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পত্র-সংখ্যা বার শতেরও অধিক ইহাতে বঙ্গদেশের—তথা পূর্ব্ব ভারতের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক, শিল্প ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। এক কথায় বাঙ্গলাদেশের সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহার প্রায় সমস্তই দীনেশবাবু এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন একজন লেখকের পক্ষে এই কাজ যে কত দুঃসাধ্য, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন। এই গ্রন্থে ভুল ত্রুটি অনেক আছে সত্য, কিন্তু ইহা মূল্যবান্ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, লোক-সাহিত্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সাধারণের অজ্ঞাত কত তথ্য যে গ্রন্থকার সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায়

না। ভবিষ্যতে যাঁহারা বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহারা এই গ্রন্থে এমন অনেক প্রয়োজনীয় মাল-মসলা পাইবেন, যাহা অন্যত্র দুর্লভ।

"বৃহৎবঙ্গ" বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস নহে—সুতরাং এই মাপকাঠিতে ইহার বিচার করিলে গ্রন্থকারের প্রতি অন্যায় করা হইবে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"ঐতিহাসিক কিংবদন্তী বা উপগল্প, তাহার যে মূল্যই থাকুক না কেন, তাহা আমি বাদ দিই নাই...এই পুস্তকের ভাষা হয় ঠিক বিজ্ঞান-সঙ্গত, ওজন-করা, নির্লিপ্ত ঐতিহাসিকের ভাষা হয় নাই। আজ বঙ্গের শ্মশানের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী লেখক যদি মাঝে মাঝে অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকেন, কিংবা কিছু বিচলিত হইয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন—তবে আশা করি তিনি ঐতিহাসিকগণের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইবেন না। বিশেষতঃ এই পুস্তক শুধু ঐতিহাসিকগণের জন্য লিখিত হয় নাই, বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি জাগ্রত করা আমার অন্যতম লক্ষ্য। নীরস ও শুষ্ক গবেষণায় তাহারা আকৃষ্ট হইবে না—এজন্য যদি রস-সঞ্চারের অভিপ্রায়ে ভাষার মাঝে মাঝে কিছু রং ফলাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহাতে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" (পৃঃ ১৮৶০)

"বৃহৎবঙ্গের" সমালোচনা করিতে অথবা ইহার প্রকৃত স্বরূপ ও মূল্য কি বুঝিতে হইলে উদ্ধৃত কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হইবে। সুদীর্ঘ জীবনের অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের ফলে গ্রন্থকার বঙ্গদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা-সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া পাঠককে উপহার দিয়াছেন। প্রতিপদে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কষ্টিপাথরে মূল্য যাচাই করিয়া অথবা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা সত্য মিথ্যার নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি অগ্রসর হন নাই। সুতরাং তাঁহার কোন্ কোন্ মত অগ্রাহ্য হইবে—কোন্ কোন্ মত গ্রাহ্য হইবে—তাহার বিচারের ভার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের হস্তেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "আমার এই পুস্তক ভাবী ঐতিহাসিকগণের পক্ষে একখানি পাদপীঠরূপে গণ্য হইলে ধন্য হইব।"

গ্রন্থরচনার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। অতঃপর এই গ্রন্থে যে সমুদয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা

করিব। প্রথমতঃ রাজনৈতিক ইতিহাস। সুদূর প্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ইতিহাস এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গ্রন্থকার মগধের রাজবংশের বর্ণনা করিয়াছেন—যেমন মৌর্য্য, সুঙ্গ, কান্ব, গুপ্ত-বংশ প্রভৃতি। ইহার কৈফিয়ৎস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন "বঙ্গদেশের শিক্ষা-দীক্ষার মূল-প্রস্রবণ মগধ কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত ছিল; মগধের উচ্চশিক্ষা, মগধের শিল্পকলা সমস্তই উত্তরকালে পূর্ব্বদিক আশ্রয় করিয়া গৌড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, মগধকে বাদ দিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করা চলে না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে মগধকে বাদ দেন নাই" (১৯পৃঃ)। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন "পূর্ব্বভারতের সভ্যতা বিশেষ করিয়া মগধের শিক্ষা-দীক্ষার আমরা বাঙ্গালীরাই উত্তরাধিকারী হইয়াছি" (১৭৪পৃঃ)। আমরা এ বিষয়ে গ্রন্থকার বা রাখালবাবুর সাহিত একমত হইতে পারি না। গ্রন্থকারের যুক্তি যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে 'বৃহৎবঙ্গ' নামক গ্রন্থে মগধের ইতিহাস না লিখিয়া 'বৃহৎ মগধ' নামক গ্রন্থে বাঙ্গালার ইতিহাস লেখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত মগধের রাজবংশের আলোচনা করিয়া তৎপর গ্রন্থকার বাঙ্গালার রাজবংশের বিবরণ দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যুগের ধর্ম্মমত, সামাজিক রীতিনীতি, শিল্পকলা বিদ্যাচর্চ্চা প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন, গ্রন্থকার নিজেই ভূমিকায় আলোচ্য বিষয়ের যে একটি তালিকা দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই পুস্তকে সিংহল ও বঙ্গভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি; জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছি; নব্য ন্যায় ও স্মৃতির মত জটিল ও একান্ত দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজের অসামর্থ্য বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। বৌদ্ধবিহার, নবদ্বীপের টোল বাঙ্গালার গণিত, মস্‌লিন ও রেশমের ব্যবসায়, কৃষিতত্ত্ব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, তন্ত্রশাস্ত্র, সহজিয়া, মস্করীদের চিত্র, শঙ্খব্যবসায়, কৌলিন্য ও শিল্পসম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা, দীপঙ্কর, জয়দেব, মহাপ্রভু চৈতন্য ও তাঁহার বহুসংখ্যক পার্শ্বদগণের জীবনী এবং নানা প্রাদেশিক ইতিহাস লইয়া আমি চর্চ্চা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।" (১৸৶০ পৃঃ)

এই সুদীর্ঘ তালিকা হইতেই পাঠকবর্গ গ্রন্থের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন।

'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ অংশ বাঙ্গালার চিত্রশিল্প ও কারু-শিল্পের বিবরণ ও তদ্বিষয়ক বহুসংখ্যক ছবি। এগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সাধারণতঃ দুষ্প্রাপ্য। এ সমুদয়ের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালার সভ্যতার ইতিহাসের একটি বিস্মৃত, লুপ্ত প্রায় অধ্যায় উদ্ধার করিয়াছেন। ৩৮ক, ২৩৯ক, এবং ৪১৮ক-চ প্রভৃতি সংখ্যক ছবিগুলি বাঙ্গালার শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। এই সমুদয় মাল-মসলা ধীরে ধীরে সংগ্রহ হইলেই তবে বাঙ্গালার শিল্পের ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হইবে। এ বিষয়ে গ্রন্থকার একপ্রকার প্রথম পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছেন বলা যাইতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ "Indian Shipping" এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থের লেখক ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জি, এম, এ; পি-এচ, ডি; পি, আর, এস, (Dr. Radha-kumud Mukherji M. A., Ph. D., P. R. S., Head of the Department of History, Lucknow University) :—

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার জন্য রায়বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পরিশ্রম সুবিদিত। তাঁহার ফলের জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। সম্প্রতি এই বৃদ্ধ বয়সে এবং স্বাস্থ্যাভাব সত্ত্বেও "বৃহৎবঙ্গ" নামক তিনি দুইখণ্ডে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার অক্লান্ত দেশ-সেবার কথাই মনে হইল। বাঙ্গালীর সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, সকল বিষয়ের নানা তথ্য এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছিদ্রান্বেষী সমালোচক এই বিপুল গ্রন্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু তাহা দ্বারা যাহা সমগ্র বা বৃহৎ তাহার কোনরূপ খর্ব্বতা হয় না। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়া যেমন তিনি এক দিকে পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন, এই গ্রন্থে বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাসের আর এক বিপুল ক্ষেত্রে তিনি আর এক বিস্তৃত পথ অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ইতিহাস-রচনার প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য ও উপকরণ আহৃত হইয়াছে। এই মহান্ পুস্তকে একটি চিত্তাকর্ষক অঙ্গ—

প্রাচীন কুটীর-শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক অনেকগুলি চিত্র। চিত্রগুলি সুন্দর-রূপে অঙ্কিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। লেখকের ভাব ও ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই যে পরিণতি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তকটি ইতিহাস-সম্বন্ধীয় হইলেও সাহিত্য-হিসাবে উচ্চ স্থান পাইবে।

এই পুস্তক পড়িয়া আমার অনেক পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত হইয়া গেল। সে প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা, যখন দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র ইংরাজী সংস্করণ লইয়া শ্রদ্ধেয়া ভগ্নী নিবেদিতা আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে দীনেশ-বাবুর সহিত কত না আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। আর সেই আলোচনায় আমিও তখন ছাত্র-হিসাবে মধ্যে মধ্যে যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে শ্লাঘান্বিত মনে করিতাম।

JAMINIKANTA SEN,

The well-known art-critic and author of "Antarjatic Rupattantra (Cosmic Beauty) Art-o-Ahitagni (Creative Beauty) Advocate, Calcutta High Court, President, Calcutta Literary Conference—Fine Art & Foik Literature and of All India Art Conference, Lucknow (1926) and Honourary Lecturer, Bishwa Bharati, Bolepur :—

Mr. Dineshchandra Sen, the famous historian of the Bengali Literature has added another feather to his cap. His new work Brihat Banga is a consummate production replete with interesting facts about Greater Bengal. No similar work has been published during recent years. The amount of labour, bestowed on these big volumes bespeaks a gigantic devotion on the part of the author. A writer over 70 years of age must receive the congratulation of the entire country on the fruition of this mighty literary enterprise. He has left no stone

nturned in presenting his cause through grim epochs of history ı which Bengal played her luminous part. A great lover of is mother country Mr. Sen unfurls new achievements, hither-ɔ unsuspected, and creates a halo round the romantic history f which his countrymen should be justly proud. This book is ivided into 18 chapters and has 354 illustrations of which ı4 are in colour. Thus nothing has been left out to add to he embelishment of this work. Social, literary and artistic vealth of this country has received his particular care. Bengal's ıncient Universities, Schools of Philosophy and religious accounts ncluding the activities of Tantrikism and Vaishnavism, received ıis earnest care. He begins from the Buddhistic age and con-:ludes with the latest aspects of Bengal's dramatic history in which the Pala and Sena kings played a heroic part. The treatment of the Mahomedan rule is also highly interesting. He has not recounted merely the dry bones of history, but his penetrating style and vista have enabled him to enliven them with flesh and blood. The age of Asoka, of early Andhra kings, the Gupta and Maurya epochs have received from his pen a new lease of life and the entire book is almost a living panorama of the ages gone by. The Pala empire, the Chandra dynasty, Daipankara's message to Asia, Santa Rakshita's personality and a hundred other topics touching the gift of Bengal to Asia have received from his pen a vigourous treatment. He has not neglected to deal with the artistic culture of each age but discussed it with a wealth of illustrations, not easily found elsewhere. One wonders how he could contain such vast materials within the compass of a single book! The treatment of Bengal's social system is another interesting feature in the whole book. The subjects, treated in the book, are so diverse and many-sided that a host of scholars should follow him up and treat different aspects of them in independent and more searching

way. There is none who could inspire them more than this hoary literatuer who with his indefatiguable energy has opened their door in no uncertain way. It is not possible within the compass of a limited review to refer to Mr. Sen's achievements in this book. It would be enough to remark that his performance is really wonderful. Let not idle criticisers detract the essential merits of this pioneer book. Other writers might follow him and try to do further justice to the numerous topics discussed which would never be adequately done either by a single man or in a single generation. Facts tabulated, and adjusted invite wider appeals to lovers of one's country and young research-scholars follow up and make a new beginning for a line of work led by the torch of Mr. Sen. We heartily congratulate Mr. Sen on his great work and think that the coming generation would realise that the passing one has left no mean legacy for them and that great workers with boundless enthusiasm had already come forward to show the way for a deeper study and realisation of Bengal's history in the years to come.

প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

(Mr. Nagendranath Vasu, Prachya-Vidya-Maharnava, Editor of the famous Bengali Encyclopaedia, the Vishwakosha) :—

আপনার মহাগ্রন্থ "বৃহৎবঙ্গ" দুই খণ্ড পাইয়া আশাতীত আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই বৃদ্ধবয়সে আপনি যে অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তাহা বঙ্গভাষায় চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া থাকিবে। প্রায় চল্লিশবর্ষ পূর্ব্বে আপনার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে, আপনার

পর আমার যে এক অসাধারণ আকর্ষণ আসিয়াছিল, তাহা দিন দিন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া আমাকে আপনার একান্ত অনুরাগী করিয়াছে,—এই সুদীর্ঘকাল আপনার সহিত সংশ্রবে থাকার দরুণ সেই অনুরাগ আপনার গৌরবের সহিত আমাকেও গৌরবান্বিত ও উৎসাহিত করিয়াছে। আপনার উত্তরোত্তর প্রতিভার বিকাশ আপনাকে ধন্য ও সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। বঙ্গবাণীর নিকট আপনার মহাদান চির-সমুজ্জ্বল ও মহিমামণ্ডিত থাকিবে।

আপনি বঙ্গবাণীর প্রকৃত বরপুত্র, আপনার প্রতি গ্রন্থে স্বদেশ-প্রেম এবং বাঙ্গলার অক্ষয় গৌরব উজ্জ্বল ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে। এ কারণ আপনার গ্রন্থ এত মধুর, এত সুললিত এবং এত চিত্তাকর্ষক,—যখনই পাঠ করি, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যাই। আমার এই দীর্ঘ রোগ-শোকের মধ্যেও যখনই আপনার গ্রন্থ পাঠ করি, এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। অবশ্য একথাও বলিতেছি, আপনার এই মহাগ্রন্থে যে সকল স্বাধীন মত আলোচনা করিয়াছেন, সকল বিষয় আমার মতের সহিত মিল না হইলেও আপনার এই অসাধারণ কার্য্যের জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের জন্য অভিনন্দন করিতেছি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
(বিশ্বকোষ-সম্পাদক)

Shamsul Ulama Dr. M. Hidayat Husain, late Principal Calcutta Madrasah, (Royal Asiatic Society of Bengal, 1st Sept. 1936).

Dr. Dineshchandra Sen's great work "Brihat Banga" is a stupendous achievement of which the whole of the Bengali people including Hindus and Muslims should be proud. He is pioneer in the field and has unfolded treasures of information regarding the political, social, religious and cultural aspects of the history of Bengal, which throw very valuable light on its

many obscure corners. The chapters on art with a rich reproduction of a series of Bengali paintings are the most attractive, interesting and valuable of all. It is a work which not only shows a gigantic spade-work, but, for the unique beauty of the literary style, will be regarded as a permanent contribution to the Bengali Literature. The, author has admirably shown a freshness of thought and keen historical insight worthy of a savant, and I confidently recommend the book to the Bengali reading public.

ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জী এম্, এ ; পি-এচ্, ডি,

(Dr. Radhakamal Mukherjee, M.A., Ph. D., Head of the Department of Economics and Sociology, Lucknow University) :—

শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের "বৃহৎ বঙ্গ" বাঙালী জাতির গৌরব বস্তু। বাঙালার রাষ্ট্রিক ইতিহাস ও কৃষ্টির ক্রমবিকাশের ধারা ঋজু ও সহজ গতি নহে। বঙ্কিম ও অন্ধকার পথে তাহা হারাইয়া যায়, কখনও বা যুদ্ধের কোলাহল ও বিজয়ীর দর্প পথ রোধ করে। যুগের পর যুগ ধরিয়া বাঙালী জীবনের ও কৃষ্টির ধারা উদ্ঘাটন করিয়া, ধর্ম্ম, শিল্প ও সাহিত্যের পর্য্যায়ে বাঙালীর বিশিষ্টতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ফুটাইয়া তুলিয়া দীনেশবাবু বাঙালীকে এক অমূল্য দান দিয়াছেন। এরূপ ইতিহাস শুধু যে নূতন গবেষককে বাঙালীর পুরাতন সমাজ ও সভ্যতার নানা সমস্যা সমাধান করিতে ব্যাপৃত রাখিবে তাহা নহে, বাঙলার মনোরম রূপটিকে নিখুঁত ফুটাইয়া জাতির ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ, প্রসারিত করিবে।

"বৃহৎ বঙ্গ" জনসাধারণের ইতিহাস, বাঙালীর চিন্তা, শিল্প ও সাধনের ইতিহাস। বহু বাঙলার ইতিহাস অপেক্ষা ইহার মর্য্যাদা ও সার্থকতা অনেক বেশী। লেখকের অসাধারণ পরিশ্রম, বিচারবুদ্ধি ও বিরাট সৃষ্টিকল্পতা গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙলাদেশ আজ ধ্বংসোন্মুখ ; যে

দ্বীপথে যুগে যুগে বিজয়-বাহিনী ও শিল্প-সম্ভার দিকে দিকে যাইত। সে দ্বীগুলি আজ ক্ষীণ কঙ্কাল-সার। বাঙালী জাতিও আজ শৌর্য্য-বীর্য্যহীন। সৃষ্টির ইতিহাসের এই বিপদ ও অনিশ্চয়তার দিনে বাঙালীর রাজা-মহারাজা ও জমিদারের নহে, বাঙালীর নিম্নশ্রেণীর ও সমাজের শিল্পলেখা, ধর্ম্মানুশীলন ও রাষ্ট্রিক সঙ্ঘবোধের ইতিহাস বাঙালীকে প্রাণ দিবে।

. "বৃহৎ বঙ্গ" এরূপ একটি ইতিহাস যে, যে ইতিহাস গড়ে, পুরাতনের সহিত ভবিষ্যতের মিলনসেতু হইয়া জাতিকে নূতন প্রেরণা দেয়।

ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি, এম, এ; পি-এচ, ডি, (Dr. Probodhchandra Bagchi M. A., Ph. D., Lecturer in History, Calcutta University :—

আপনার বিরাট্ "বৃহৎবঙ্গ" পাঠ করিলাম। আপনি বুঝিয়াছেন যে, কোন জাতির ইতিহাস লিখিতে হইলে শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, সে জাতির ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, এক কথায় সমস্ত সভ্যতার ক্রমবিকাশ আলোচনা না করিলে সে ইতিহাস নিখুঁত হয় না। সে ইতিহাসের পিছনে থাকা চাই— একটি সু-সংবদ্ধ পরিকল্পনা। সে পরিকল্পনা আপনার আছে এবং সারা জীবনের সাধনার দ্বারা বাঙ্গালী সভ্যতার বহুমুখী ধারার খোঁজ ও আপনি পাইয়াছেন। আপনার রচনা-ভঙ্গী সাবলীল এবং সেই জন্য তাহা চিত্তাকর্ষক। এই সব কারণে বাঙ্গালী জাতির একখানি পূর্ণাবয়ব ইতিহাস-রচনার প্রচেষ্টা যে আপনার অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

Nawab Khan Bahadur Masharruf Hosain, Ex-Minister, Bengal Council (in charge of Education) :—

I have read with great pleasure "Brihat Banga" by Dr. Dineshchandra Sen. It covers about 1400 pages of royal octavo

size and contains 352 illustrations. It deals with political, social, religious and cultural exposition of people of Bengal from the very early age down to the advent of British in Bengal. I know the author from my early boyhood and I can say from what I have known of him and his work that the attempt he has made to bring light where there was darkness has borne good result and the outcome—the volumes he has written is a right picture of events in Bengal. Although on some minor points there may be difference of opinion, I must congratulate the author for the noble attempt he made to further the cause of education in this country especially in the historical exposition of events in Bengal. I wish the book will be widely circulated and will find place in every Library of India.

The Navashakti (নবশক্তি—৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৩), the popular weekly journal of Calcutta, writes in its editorial column (on the 24th July. 1936.

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন স্মৃতির ধারাবাহিকতা আশ্রয় করিয়াই চলে। স্মৃতির ধারাবাহিকতা না থাকিলে জীবন অর্থহীন, কোন মূল্য তাহার নাই, কোনও সার্থকতাও নাই। উন্মাদের জীবন, তাহার স্মৃতির সূত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন বলিয়াই ভয়ঙ্কর ও বেদনাময়।

জাতির স্মৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ইতিহাস। মানুষ একলা কিংবা পরিবারবদ্ধ হইয়াও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, নিষ্ফল হইয়া থাকিতে পারে। আফ্রিকার ঘন অরণ্যে, উত্তর মেরুর নিরবচ্ছিন্ন তুষারের মাঝে যুগযুগান্তর কত জাতি এমনি নিষ্ফলভাবে জীবন কাটাইয়া আসিয়াছে। যে বন্ধন মানুষের সমষ্টিকে জাতিতে পরিণত করে, যে যোগসূত্র অতীতের সহিত ভবিষ্যৎকে যুক্ত করিয়া জাতিকে তাহার নিজস্ব পথের সন্ধান ও প্রেরণা দেয়, তাহার অভাবে মানুষ পশুর স্তরেই পড়িয়া থাকে। পশুর ব্যষ্টি-স্মৃতি অস্পষ্টভাবে আছে;

জন্ত সমষ্টিগত সচেতন স্মৃতি নাই। সংস্কারের পথে জীবনযাত্রা তাই তাহার বাঁধা, সে জীবন-যাত্রায় ছেদ পড়িবার পর ভাবী-কালের জন্য কোন উদ্বৃত্ত রাখিয়া যায় না,—অভিজ্ঞতার স্মৃতির উত্তরাধিকারের দ্বারা সে ভবিষ্যৎকে সমৃদ্ধ করিয়া যায় না।

জাতিকে নিজেকে চিনিয়া বড় হইতে হইলে ইতিহাসের পশ্চাৎ-পট তাহার স্মৃতিতে থাকা একান্ত আবশ্যক। ইতিহাসের মধ্যেই নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভবিষ্যৎকে রচনা করিবার উদ্দীপনা-মন্ত্র আমরা লাভ করি।

বাঙ্গালী সত্যই আত্মবিস্মৃত জাতি। এক ভৌগোলিক সীমার দ্বারা যাহারা বেষ্টিত, নিজেদের সত্যকার পরিচয় ডুবিয়া গেলে তাহারা জাতীয়তার মূল-শক্তির উৎস হারাইয়া ফেলে। ভৌগোলিক সীমার বন্ধন বাহ্যিক ঐক্যের আভাস দেয় মাত্র—অন্তরের ঐক্য দেয় জাতির ইতিহাস।

বাঙ্গালীর এই ঐতিহাসিক স্মৃতি একেবারে বুঝি বিলুপ্ত হইয়া গেছে বলিলেই হয়। নদীমাতৃক এই কোমল মাটির দেশে অতীতের পদ-চিহ্ন সহজেই লুপ্ত হইয়া যায়। বিবিধ বন্যা-প্লাবিত দেশের বহুদূর বালির ভিতর হইতে সে চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। এখানকার ইতিহাসের ধারাও দেশের নদীগুলির মতই চঞ্চল, বহুমুখী, বেগবান্। বার বার সে পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন পথ ভাঙিয়া তৈয়ার করিয়াছে। প্রাচীনের ভগ্ন স্তূপ নূতনের ভিত্তিতলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

এই ইতিহাসকে সযত্নে উদ্ধার করিবার জন্য অক্লান্ত কর্ম্মী, অসাধারণ একজন সাধকের প্রয়োজন ছিল। শুধু পণ্ডিত নয়, দেশের ধূলিকণা যাঁহার কাছে পবিত্র, যাঁহার হৃদয় সমস্ত বিপুল, বিচিত্র কাহিনীতে আপনা হইতে অপূর্ব্বভাবে সাড়া দিয়া উঠে, তেমন একজন দরদীই এ কার্য্যের ভার লইবার যোগ্য।

সেই যোগ্য ব্যক্তিই সম্প্রতি এ ভার লইয়া আমাদের ধন্য করিয়াছেন বলিতে পারি। বাঙ্গলার সাহিত্যের ইতিহাসকে যিনি একদিন অসাধারণ প্রতিভা ও অসামান্য অধ্যবসায়ের দ্বারা বিস্মৃতির তমসা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনায় তিনিই বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা ও ভগ্ন স্বাস্থ্য উপেক্ষা করিয়া কল্পনাতীত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎবঙ্গ' নিছক তথ্য-বিলাসী পণ্ডিতের শুষ্ক, নীরস গ্রন্থ নয়, বাঙ্গালীর এই জীবন্ত ইতিহাস সমস্ত হৃদয়ের দরদ দিয়া লেখা। জাতির বিরাট্, বিচিত্র কাহিনীর উপযুক্ত প্রকাশ-ভঙ্গীই আমরা ইহাতে পাই। যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজা-বাদসাহের কাহিনী নয়, সমগ্র জাতির জীবন—ইতিহাসের সকল দিক্ ইহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত।

নিছক্ পণ্ডিতের হাতে ইহার চেয়ে নির্ভুল ইতিহাস রচিত হইতে পারিত কি না, আমরা জানি না, কিন্তু এমন সরস ও জীবন্ত কখনই নয়। এ গ্রন্থ পাঠাগারের তাকে ধূলিমলিন অবস্থায় বিস্ময় জাগ্রত যে করিবে না, এ টুকু জোর করিয়া বলা যায়। এ গ্রন্থ বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান পাইবার সমস্ত যোগ্যতাই লইয়া আসিয়াছে।

এই আত্মবিস্মৃত জাতির আজ নবযুগ গড়িয়া তোলার জন্য এমনি ইতিহাসেরই প্রয়োজন ছিল। তথ্যের কঙ্কাল নয়, সজীব সতেজ ধারা, জাতীয় জীবনের শুষ্ক সঙ্কীর্ণ প্রবাহ যাহা হইতে নূতন শক্তি সংগ্রহ করিয়া সার্থক হইবে।

ছোট বড় অনেক বাহ্যিক ঘটনা আমাদের কাছে স্মরণীয় হইয়া থাকে, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম বিশদ ও সুসংলগ্নভাবে রচিত হওয়ার ঘটনা কোন দিক দিয়া কিছুর তুলনায় কম্ মূল্যবান্ নয়। ভাবী কালের ঐতিহাসিকের পথ-নির্দ্দেশের প্রেরণাস্বরূপ এ শুভক্ষণ চিরদিন আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল থাকা উচিত।

Private Secretary to His Highness, Sir Manikya Bahadur of Tippera :—

*** I am desired to inform you that His Highness read your book "Brihat Banga", recently published, with much interest and finds in the same valuable informations relating to the History of this part of the country, which will surely help the public in gleaning things of the past.

Chief Secretary to his Highness, Sir Manikya Bahadur of Tippera :—

** I have gone through many chapters of your beautiful book in the meantime and am rather convinced that any student of Art and Culture will find "Brihat Banga" immensely delightful and instructive. Learned at the same time lucid discourses as regards the origin, evolution and expression of Art, Culture and Religion associated with the glories of Greater Bengal have been put forward admirably by your master-mind The chapter dealing with the history of Tripura has equally been interesting. I am sure, the stupendous labour undertaken to prepare the volumes shall be compensated by the appreciation of students and masters of history. **

The Bangaluxmi, the leading Bengali monthly journal of the ladies (বঙ্গলক্ষ্মী—ভাদ্র, ১৩৪৩) says in its issue of August, 1936.

বাঙ্গলার সংস্কৃতি ও সাধনা অতি প্রাচীনকাল হইতে এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে সারা ভারতে ও সুদূর প্রতীচ্যে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ নানা ঐতিহাসিক তথ্য ও নিদর্শনের সহিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সুবৃহৎ পুস্তক "বৃহৎ বঙ্গ" তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হীরানন্দ শাস্ত্রীর গৃহীত গোয়ালিয়ার-প্রশস্তির পাঠে "বৃহৎ বঙ্গান্" কথাটী হইতে "বৃহৎ বঙ্গ" নাম গৃহীত হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস বাঙ্গালীর বিশেষ কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই, হয়ত বা তার কৃষ্টির অভাবই অন্যতম কারণ। বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি, তাই নিজের কৃষ্টি ও সাধনার কথা জানে না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে সর্ব্ব ভারতে

তাহার কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠা ছিল না বলিয়া অনেকের ভুল ধারণা। মহাপ্রভুর যুগ বাঙ্গলার পূর্ণ অভ্যুদয়ের যুগ সন্দেহ নাই। তাহার বহু শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে গুপ্ত, পাল ও সেন যুগে বাঙ্গালী রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পকলায়, যে সব গৌরবময় অধ্যায় রচনা করিয়াছেন তাহারই সন্ধান দীনেশবাবু তাঁহার বিস্তৃত গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন।

"বৃহৎ বঙ্গ" পুস্তকখানি অতি বৃহৎ, ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সর্ব্বসমেত প্রায় চৌদ্দশত পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে অক্‌টেভো সাইজে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল পুস্তকখানি ১২১৫ পৃষ্ঠার। গ্রন্থকর্ত্তা প্রায় এক শত পঁচিশ পৃষ্ঠার ভূমিকাটিতে অতি সারগর্ভ সুচিন্তিত ভাবে বাঙ্গলার সংস্কৃতির ও সাধনায় উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার শব্দ-সূচীটি ৬৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী; এই পুস্তকে ৩৫২ খানা সুপ্রাচীন কলার নিদর্শন—মৌলিক চিত্র সঙ্কলিত আছে, তাহার মধ্যে প্রায় দেড়শতখানি রঞ্জিত চিত্র। দীনেশবাবু এই সব চিত্রের অধিকাংশ তাঁহার নিজের সংগৃহীত চিত্র, মূর্ত্তি, কাঁথা পুঁথি আদি হইতে প্রতিলিপি করিয়াছেন, সেগুলির সমস্তই মূল্যবান ও মৌলিক। দীনেশবাবু তাঁহার মূল্যবান বাঙ্গালীর নিজস্ব সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহগুলি ত্রিপুরার রাজ-দরবারের ভাণ্ডারে প্রদান করিয়াছেন।

"বৃহৎ বঙ্গে" প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে হয়ত মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে বিপুল পরিশ্রম করিয়া বৃদ্ধ বয়সে এই প্রকার অত্যাবশ্যক পুস্তকখানি লিখিয়া বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত উপকার করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তাহাতে গৌরবান্বিত। দীনেশ বাবু কেবল মাত্র রাজা রাজড়ার কাহিনী, অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের সাল, তারিখ দিয়া পৃষ্ঠা পূরণ করেন নাই। সুপ্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালী জাতির কীর্ত্তি-কলাপ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর ক্ষাত্রবীর্য্য, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্র কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, কিরূপ যুগে যুগে তাহার বিকাশ ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—আর্য্য-সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতি কিভাবে বাঙ্গলায় তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—কিভাবেই বা

বাঙ্গালী সেই সব সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতির প্রসার ও উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কি ভাবেই বা বাহিরে নানা কৃষ্টির প্রভাবেও নিজের সাধনার ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চিরকাল রক্ষা করিয়াছে, আর কি ভাবে বিশ্বমানবের ও সমগ্র ভারতে তাহার সংস্কৃতি বিস্তার করিয়া দিয়াছিল, তাহারই পরিচয় এই বিশাল গ্রন্থে আছে। বাঙ্গলা আর্য্য-সভ্যতা ও দেশীয় আচার ও রীতির ধারাবাহিকত্ব যে পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে তাহা ভারতে অন্যত্র দুর্লভ। তাহারই সত্যতা-প্রমাণের জন্য দীনেশ বাবু নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ, তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ লিপি, প্রস্তর-মূর্ত্তির গঠন ও বহু প্রকার প্রমাণিত পুঁথি-পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন।

এ পুস্তকের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া অল্প স্থানের মধ্যে অসম্ভব। এই পুস্তক মুদ্রিত হওয়া অবধি বিদ্বৎজন-সমাজে বহু সমাদরে আদৃত হইতেছে। বর্ত্তমান ভারত সচিব মার্কুইস্ অব জেটল্যাণ্ড (লর্ড রোনাল্ডসে) দীনেশ বাবুকে চিত্র সংগ্রহ ও মুদ্রনের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন "আপনার প্রতি আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ সামান্য অর্থ পাঠাইলাম।" পুস্তক সম্বন্ধে বলিয়াছেন "It must be a matter of great satisfaction to you to think that the labour of ten years is now coming to fruition, and I offer you my best wishes for its success. I am sure that it will receive warm welcome from the people of Bengal."

এই পুস্তকখানি মুদ্রিত করিতে প্রায় ১০,০০০৲ দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু ইহার মূল্য মাত্র ১২৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

"বৃহৎ বঙ্গ" পুস্তকখানির অষ্টাদশ অধ্যায়ে গ্রন্থকর্ত্তা প্রাগৈতিহাসিক সময় হইতে পলাশীর যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সভ্যতার শৌর্য্য-বীর্য্যের, সংস্কৃতির, সাধনার ও বিশিষ্টতার ক্রমবিকাশ ও প্রসার নানা প্রমাণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে ভারতের বৈদিক ও বৌদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস ও বাহিরের সহিত বাঙ্গলার যোগ বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে মৌর্য্য ও গুপ্ত-সময়ের নানা শিল্প ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির বিষয়, অষ্টম অধ্যায়ে

মাৎস্য ন্যায়, ও পাল বংশের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে বাঙ্গলার গৌরব, তাহার গৌড়ীয় সভ্যতার ও জ্ঞানের উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। জয়সেন বিশ্বাসের 'বৈদ্যকুল পঞ্জিকা', চায়ু সেনের ইতিহাস, ক্ষেমেন্দ্র, ইন্দ্রদত্ত ভট্টঘাতি, রাজমালা, কেদার মিশ্র দর্ভপাণী আদি কবি গুণিগণের সাধনার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাব ও ধ্বংস ও দীপঙ্করের খ্যাতি বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে গৌড়ীয় সাহিত্যের অভ্যুদয় ও জয়দেবের কাব্য-প্রতিভার বর্ণনা আছে। দশম অধ্যায়ে তিব্বতের ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রতীচ্য দেশসমূহে বাঙ্গালীর প্রভাব বিস্তারের কথা বর্ণিত আছে। বাঙ্গালী কৃষ্টির বর্ত্তিকাবাহক দীপঙ্কর, যক্ষ, শান্ত রক্ষিত, পদ্ম-নাভ, কমল শীলা আদি বৌদ্ধ প্রচারকদের কৃতিত্ব প্রকাশ হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ে সহজিয়া সাহিত্য ও সমাজে তান্ত্রিক ভৈরবী সাধনার, নেড়ানেড়ীর অবাধ বিবাহ-পদ্ধতির সম্যক্ বর্ণনা আছে। একাদশ অধ্যায় বাঙ্গলার নিজস্ব গৌরব সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, শিল্প সাধনার সম্যক্ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। নাগসেন, মণীন্দ্র চন্দ্র, গোমিন আদি মনীষীগণের সময় হইতে নবদ্বীপে বিদ্যা-চর্চ্চা, নব্য ন্যায়ের খ্যাতি-প্রতিপত্তি পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর গৌরব ও অবদান বর্ণিত হইয়াছে। কাণা শিরোমণি, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কথা এবং দুর্ঘাতাবৃত্তি, আর্য্যা-সপ্তসতি হরিভক্তিবিলাশ আদি জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থের পরিচয়, কল্লুক ভট্টের বিবরণ, নানা গীতি কথার সন্ধান এই অধ্যায়েই দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ অধ্যায়ে বাঙ্গলার শিল্প-সাধনার উন্নতি ও পরিচয় গ্রন্থকার অতি সুনিপুণভাবে প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গ-রমণীদের কলা-বিদ্যা, তাহাদের সৌন্দর্য্যপ্রীতি, নৃত্য-প্রিয়তা, কাঁথা বুনন ও আলপনার কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ৪৩০ ও ৪৩৩ খ পৃষ্ঠার নানা রঙ্গের বিচিত্র চিত্র তাহার প্রমাণ। ৪১৮গ পৃষ্ঠায় মা ও স্ত্রৈণ পুত্রের নিদর্শন অতি মনোরম। ৪১৯গ চিত্রে বঙ্গরমণীদের তখনকার নৃত্যভঙ্গিমায় গমন-পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব চিত্র-পরিচয় পরবর্ত্তী সংখ্যায় বিশদভাবে চিত্রানুলিপি প্রদান করিয়া প্রকাশিত হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সেন রাজাদের শক্তি ও বাঙ্গালী সমাজের সম্পূর্ণ সংস্কারের বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বল্লাল সেনের প্রতিপত্তি

শেষ বাঙ্গালী হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনের প্রজাপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে প্রথম মুসলমান আক্রমণের ইতিহাস আরম্ভ হয়।

চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও যোড়শ অধ্যায়ে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়, বৈষ্ণব শাস্ত্র, বৈষ্ণব সাহিত্য, পদাবলী ও নানা বৈষ্ণব সাধকের পরিচয়, বাঙ্গালী তদানিন্তন সমাজের কথা, মুসলমান রাজ্য-শাসনের বর্ণনা, বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। পরের অধ্যায়গুলিতে মুসলমান-রাজ্যের অবসান, ইংরাজদের আগমন ও তদানিন্তন বাংলার সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্ম-বিষয়ে নানা তথ্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। অতিরিক্ত অধ্যায়ে বাঙ্গলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাসও বর্ণিত হইয়াছে।

'বৃহৎ-বঙ্গ" বাঙ্গলার ঐতিহাসিকগণের বিশেষ উপযোগী, বাংলার কৃষ্টি ও সাধনার সম্যক্ পরিচয়গ্রন্থ। বাঙ্গলা সাহিত্যের ও বাঙ্গালী জাতির ইহা এক অপূর্ব্ব ও অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

Mr. Jogendranath Gupta, author of the famous "History of Bikrampur and Editor of the "ShishuBharati," the popular Bengali Encyclopaedia for juvenile readers, writes in the leading Bengali weekly journal Desh (দেশ, ১৯শে বৈশাখ, ১৩৪৩) in its issue of May 2, 1936 :—

বাঙ্গালায় একখানা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত বিরচিত হয় নাই ইহা একান্ত পরিতাপের বিষয়। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত দুইখণ্ড বাঙ্গলার ইতিহাস প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় আর এই বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কেহ অগ্রসর হ'ন নাই। সেই কবে ষ্টুয়ার্ট, মার্শম্যান্, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাও কতকটা অনুবাদ মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' বাঙ্গলীদিগকে বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু 'আত্মবিস্মৃত' বাঙ্গালী জাতি, তেমনভাবে আর অগ্রসর হইল কৈ?

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা সাহিত্যে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার একটা যুগ আসিয়াছিল। সেই শুভ সুযোগে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ ইতিহাসউদ্ধারে ব্রতী হন। তাহারই ফলে আমরা সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাসিম, গৌড়রাজলেখমালা, মুর্শিদাবাদ-কাহিনী প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। ইহার পর গত ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলা ও পরগণার কয়েকখানি সুলিখিত ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগ—বিজ্ঞানের যুগ। এই বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক আলোচনার দিনে বাঙ্গলার বহু কৃতী সন্তান ঐতিহাসিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহারি ফলে আজ আমরা বৃহত্তর ভারতের কথা শুনিতেছি, মহেঞ্জোদারোর লুপ্ত ইতিহাস বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের কৃতিত্বে জানিতে পারিতেছি,—পাহাড়পুরের প্রাচীন বৈভব আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এবং “বৃহৎ বঙ্গের”* ন্যায় একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থে বাঙ্গলার ইতিহাস ও সামাজিক জীবনের কথা জানিতে পারিয়াছি।

ইতিহাস শুধু তারিখ দ্বারাই বিবেচিত হয় না বা লিখিত হইলে চলে না। ইতিহাসের প্রাণ নিহিত রহিয়াছে ঘটনাবিন্যাসে, তথ্যসংগ্রহে, চিত্র-শিল্প, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির এবং রূপকথা, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, পুঁথিপত্র ও জনগণের বিবিধ জীবনের গতি ও সজীবতার মধ্যে। কত মহাজন, কত পুণ্যতপা বাঙ্গালী পুরুষ ও নারী ধর্ম্ম, সাহিত্যের মধ্যে, মঠ ও মন্দির রচনায়, পল্লী-সঙ্গীত ও ছড়া-পাঁচালী এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহাদের যুগের অনেকখানি ইতিহাসের মালমসলা রাখিয়া গিয়াছেন—সে সমুদয়ের সুনিয়ন্ত্রিত আলোচনার দ্বারা তাহাকে সজীব করিয়া তোলাই হইতেছে ইতিহাসের কাজ। প্রত্যেক দেশেই তাহাই হয়। বাঙ্গলায় অনেক বৃহৎ পল্লীর লুপ্তপ্রায় সরোবর-তটের ভগ্ন পাষাণ-সোপান বা ইষ্টক-সোপান বা তীরের তরু-লতা সমাচ্ছন্ন জীর্ণমন্দিরে গ্রথিত দুইপংক্তি সংস্কৃত বা বাঙ্গলা শ্লোক এখন অমূল্য তথ্য প্রকাশ

* রায়বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি-এ, ডি-লিট্ প্রণীত। দুই খণ্ডে, ১৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি খণ্ড ৬৲ টাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

করে, যাহা একখানা গ্রন্থের শত শত পৃষ্ঠা পড়িয়াও উদ্ধার করা যায় না। বিরাট্ বঙ্গদেশের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিতেছে মাত্র, তাহাকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করিবার সময় এখনও অনেক দূরে। বাঙ্গলার ইতিহাস—অধিকাংশ স্থলেই পল্লীর ইতিহাস। মাটির নীচে কত কি লুপ্তরত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে কে তাহার সন্ধান জানে? এইরূপ ক্ষেত্রে যিনি যে দিক দিয়া যে ভাবে বাঙ্গলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাহায্য করিবেন, তিনি বংশপরম্পরা ধন্যবাদার্হ হইবেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বৃহৎ বঙ্গ" বাঙ্গলা সাহিত্যে এক অভিনব দান। বৃদ্ধ দীনেশচন্দ্র এই সপ্ততিবর্ষ বয়সে-রোগজীর্ণ দেহে—কেমন করিয়া দিনের পর দিন অক্লান্ত শ্রমে এই বিরাট্ গ্রন্থ রচনা করিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। এই গ্রন্থ আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ হয়ত বলিবেন—ইহা বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে লিখিত হয় নাই। কেহ হয়ত বলিবেন, ইহাতে উচ্ছ্বাসের মাত্রা একটু বেশী, আরও কত কি! সে সব কথা যদি আমরা মানিয়াও লই, তবু মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিব, দীনেশবাবুর এই বিরাট্ দান বাঙ্গলা সাহিত্যকে নানা দিক দিয়াই সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করিয়াছে।

অধ্যায়ের পর অধ্যায় আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে গেলে এক বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিতে হয়, [illegible] বলিয়াই এখানে এই পুস্তকের [illegible] করিলাম:—

১

সম্বন্ধে [illegible]

গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা এই দেশকে বর্জ্জিত করেন এবং তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন কারণে এদেশে পদার্পণের নিষেধবিধি প্রচার করেন। এইজন্য উত্তরকালে কনোজ প্রভৃতি দেশ হইতে বেদবিদ্যা প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণ আনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

৪। এদেশের সমাজে যুগে যুগে কৌলিন্যের সংস্কার হইয়াছে। শুধু সেনদের সময়ে নহে, গোপালও এইভাবে এই দেশীয় সমাজের কৌলিন্য সংস্কার করিয়াছিলেন।

৫। লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের কথাটা একান্ত ভ্রান্ত মত। যে কারণে এই কথাটা প্রচারিত হইয়াছিল এবং মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের নবদ্বীপজয়ের কথাটা পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহার প্রকৃত ইতিহাস।

৬। সাভারের শিলালিপি-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এবং পূর্ব্ববঙ্গের বৌদ্ধাধিকারের একটী প্রধান শাখার আবিষ্কার।

৭। বৈষ্ণব অধ্যায়ে মাথুর গানের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, গৌরচন্দ্রিকা প্রভৃতির আলোচনা।

৮। নবদ্বীপের টোলের উৎপত্তি ও বিকাশ-সম্বন্ধে বিস্তারিত ঐতিহাসিক আলোচনা।

[illegible] ও অপরাপর বৌদ্ধ ও জৈন মহাপুরুষদের জীবনী।

[illegible]বিশ্লেষণ। ঢাকার মস্‌লিন ও বঙ্গের

[illegible]াস,-ত্রিপুরা,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার

মৌলভি ডাঃ এনামুল হক (Moulovi Dr. Enamul Haq M. A. (Gold-medalist), Ph. D., B. T., Research Scholar, Calcutta University) :—

রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আধুনিকতম গ্রন্থ "বৃহৎ বঙ্গ"খানি সম্প্রতি পাঠ করিবার পরম সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। পূর্ণ ১৪০০ পৃষ্ঠায় দুইখণ্ডে এই গ্রন্থখানি সমাপ্ত, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহার প্রকাশক। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকের তুলনায়, ইহার মূল্য অন্যূন তিন গুণ অধিক হওয়া উচিত ছিল, তথাপি বিশ্ববিদ্যালয় ইহার মূল্য মাত্র ১২৲ বার টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়ায় বাঙ্গালী পাঠকের অনেকেই ইহা ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে পারিবেন।

এই বিরাট্ গ্রন্থখানি বাঙ্গলা ভাষা-ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পলাশীর যুদ্ধের অবসান পর্য্যন্ত, এই সুদীর্ঘ সময়ের বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস, শিল্প, সমাজ, রাষ্ট্র, কলা, ভাস্কর্য্য, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের [illegible] বিরাট্ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। প্রায় [illegible]

যে দুর্দ্দম প্রেরণা, অস[illegible]

সাহিত্য"-হা[illegible]

সত্তর[illegible]

সা[illegible]

তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ডক্‌টর সেন আজ বৃদ্ধ, কিন্তু এই বয়সে তাঁহার কর্ম্ম-শক্তির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সুদীর্ঘ বহু বৎসর জ্ঞান-তপস্যায় ধ্যানী যোগীর মত তিনি তাঁহার এই সুবৃহৎ পুস্তকের পাতার পর পাতা লিখিয়া গিয়াছেন। শিবরাত্রির ঘৃত-প্রদীপের মত তাঁহার এই অসীম উদ্যম দিনের পর দিন সমান আলোক প্রদান করিয়াছে। এই পুস্তকের লিখন-কালে তাঁহার গৃহে বহু দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। একটি পৌত্রীকে মৃত্যু আসিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে, তিনি নিজেও একবার কঠিন রোগের হাত হইতে কোন রকমে রক্ষা পাইয়াছেন; এত সব দুঃসময়ের মধ্যেও এই বৃদ্ধ তপস্বীর ধ্যান-ভঙ্গ হয় নাই।

এই বৃহৎ পুস্তকে ডক্‌টর সেন বাঙ্গলা দেশের প্রথম হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত নানা সামাজিক অবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গলার সমাজ-জীবনের এমন সুন্দর ইতিহাস আর কেহ লিখেন নাই। এদেশের ইতিহাস লিখিতে গিয়া কোন কোন হিন্দু লেখক মুসলমান বাদসাহদের প্রতি সুবিচার করেন নাই। ডক্‌টর সেনের মন আকাশের মত বড়,—তাই তাঁহার পুস্তকে কোথাও মুসলমানের প্রতি অবিচারের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এত ...হৎ পুস্তক যে একেবারে নির্ভুল হইয়াছে এমন কথা ডক্‌টর সেনও হয়ত ...ই পুস্তক বাঙ্গলা সাহিত্যের যে একটি অপূর্ব্ব সম্পদ ...ন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

Shani-barer Chitti (শনিবারের চিঠি)

... প্রফেসর আর্ণল্ড জে টয়েনবীর বিখ্যাত পুস্তক 'এ ষ্টাডি অফ্ হিষ্ট্রি' পড়িতেছি... এমন সময় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'বৃহৎবঙ্গ' হাতে পড়িল। এই ... ঘটনা-সমাবেশ সম্পূর্ণ দৈবকৃত, তবু ইহার মধ্যে ... কোন একটা নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হইল. কারণ সকল দিক হইতেই গ্রন্থদুইখানি পরস্পরের উপমান ও উপমেয়।

প্রথমত দুইখানি পুস্তকেই দুইটি আত্মপ্রত্যয়শীল জাতির দুইজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষক ও ইতিহাস-কার সারা জীবনের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াচেন। প্রফেসর টয়েনবী অবশ্য বয়সে সেন মহাশয়ের পুত্রস্থানীয়। তবু তিনি অস্তমান দিনেশের মতই আয়ুর স্বল্পতা ও শাস্ত্রের অকূল বিস্তার অনুভব করিয়াচেন। * * * * * *

'বৃহৎবঙ্গ' ও 'ষ্টাডি অফ্ হিষ্ট্রির' দ্বিতীয় সাদৃশ্য ইহাদের কোনটিই সাধারণ ইতিহাস নয়। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষায়তনে অগণিত গ্রন্থকীট পুরাতন শিলালিপি, পুস্তক ও দলিলপত্র ঘাঁটিয়া তথ্যের উপর তথ্য সাজাইয়া অন্ধমোহে জ্ঞানের যে বল্মীকস্তূপ ... তুলিতেছে, দুইখানি পুস্তকই তাহার প্রতিবাদ। দীনে... 'পুস্তকখানি আমি নানারূপ গুরুত্ব... রূপ বিভিন্ন মতের ঘর্ষি...

* * এই ...

তাঁহার এবং দীনেশবাবুর উভয়ের গ্রন্থই শুধু পাঠকের পক্ষেই নয়, রচয়িতার পক্ষেও দেশকাল পাত্র ও ঘটনার জটিল ব্যূহের ভিতর দিয়া পথ আবিষ্কারের চেষ্টা।

পুস্তক দুইখানির তৃতীয় সমান লক্ষণ বাহ্যিক। দুইখানিতেই দুইটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ছাপ রহিয়াছে। 'ষ্টাডি অব্ হিষ্ট্রি' ইংলণ্ডের রয়াল ইনষ্টিটিউট অব ইণ্টার ন্যাশন্যাল এফেয়ার্স-এর পোষকতায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'বৃহৎবঙ্গ' প্রকাশিত হইয়াছে কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক। বাঙালীর জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্থান, ইংরেজের জীবনে হয়ত সে স্থান রয়াল ইনষ্টিউট অব্ ইণ্টারন্যাসন্যাল এফেয়ার্সের নয়, অক্সফোর্ডের। তবু ইংরাজী ভাষা-ভাষীর নিকট 'ষ্টাডি অফ্ হিষ্ট্রি যে সম্মান ও সমাদর পাইয়াছে, তাহাতে তাহাকে, 'বৃহৎবঙ্গ যেমন বাঙালীর, তেমনই ইংরেজজাতির ঐতিহাসিক চিন্তার প্রতীক বলিয়া গণ্য করিলে অন্যায় হইবে না।

এই পুস্তকে-প্রকাশের কিছু পূর্ব্বে Marquis of Zetland আমাকে লিখিয়াছিলেন :—(31.8.35.)

"I have read with much interest your letter of the 7th in which ... tell me of the impending publication of your work ... be a matter of great satisfaction to you ... is now coming to frui- ... es. I am sure ... Bengal.

তাঁহার এবং দীনেশবাবুর উভয়ের গ্রন্থই শুধু পাঠকের পক্ষেই নয়, রচয়িতার পক্ষেও দেশকাল পাত্র ও ঘটনার জটিল ব্যূহের ভিতর দিয়া পথ আবিষ্কারের চেষ্টা।

পুস্তক দুইখানির তৃতীয় সমান লক্ষণ বাহ্যিক। দুইখানিতেই দুইটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ছাপ রহিয়াছে। 'ষ্টাডি অব্ হিষ্ট্রি' ইংলণ্ডের রয়াল ইনষ্টিটিউট অব ইণ্টার ন্যাশন্যাল এফেয়ার্স-এর পোষকতায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'বৃহৎবঙ্গ' প্রকাশিত হইয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক। বাঙালীর জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্থান, ইংরেজের জীবনে হয়ত সে স্থান রয়াল ইনষ্টিউট অব্ ইণ্টারন্যাসন্যাল এফেয়ার্সের নয়, অক্সফোর্ডের। তবু ইংরাজী ভাষা-ভাষীর নিকট 'ষ্টাডি অফ্ হিষ্ট্রি যে সম্মান ও সমাদর পাইয়াছে, তাহাতে তাহাকে, 'বৃহৎবঙ্গ যেমন বাঙালীর, তেমনই ইংরেজজাতির ঐতিহাসিক চিন্তার প্রতীক বলিয়া গণ্য করিলে অন্যায় হইবে না।

এই পুস্তক-প্রকাশের কিছু পূর্ব্বে Marquis of Zetland আমাকে লিখিয়াছিলেন :—(31.8.35.)

"I have read with much interest your letter of the 7th in [illegible] tell me of the impending publication of your work [illegible] be a matter of great satisfaction to you [illegible] is now coming to frui- [illegible] ss. I am sure [illegible] Bengal.

কর্ম্মভার পীড়িত স্বল্পাবসর অসুস্থ আমার পক্ষে এতবড় বহী পড়িয়া
সুকঠিন। তাহার পর, ইহাতে বঙ্গের ইতিহাস, সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য
স্থাপত্য, ধর্ম্মমত প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ ও আলোচনা আছে। এতং
বিষয়ে অধিকার থাকা দূরে থাকুক, ইহার কোন একটি বিষয়েরও আমার যা
জ্ঞান নাই। তবে, ইহা ঠিক বটে যে, কোন কোন বিষয়ে হয়ত সাম
কিছু বলিতে পারি। কিন্তু ভাল করিয়া না পড়িয়া ত মন্তব্য প্রক
করা যায় না।

কিন্তু গ্রন্থখানির পাতা উল্টাইয়া এবং দুই এক জায়গায় পড়ি
নে হইল, ইহা খুব কৌতুহলোদ্দীপক এবং ইহাতে জানিবার, ভাবিবা
ম্মতিও অসম্মতি জানাইবার বিস্তর কথা আছে। ছবি আছে ইহাতে
নশতের উপর, তাহার কয়েকটি রঙিন। সেগুলি সবই যে উচ্চ অঙ্গে
হা নহে। কিন্তু তাহা হইতে বাঙ্গলার সাবেক শিল্প সম্বন্ধে এবং সামাজিক
চায় অনুষ্ঠান নৈতিক অবস্থা ও পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হয়
াতে অনেকের জীবন চরিত ও অনেক গল্প আছে।

ঐতিহাসিকেরা এই বহীটিকে ইতিহাস বলিবেন কিনা তাহা তাঁহারাই
তে পারেন। কিন্তু ইহাতে ইতিহাসের উপাদান অনেক সংগৃহীত হইয়াছে
উপাদানের সন্ধানও অনেক পাওয়া যায়।”

এই রকম

পুস্তক সম্বন্ধে